প্রথম প্রকাশ
১৯৬০

প্রকাশক
অশিমা বিশ্বাস
গাঙচিল , ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

আমাদের সংসারে কনিষ্ঠতম সংযোজন
যে মানবক— দুই যুগের কলি-সন্ধি-ঘটানো
সেই ঋষভের জন্য ভালবাসা-সহ—

সূচি

কলিযুগ

কৌরব-পাণ্ডব-বংশের একমাত্র সন্তান-বীজ পরীক্ষিৎ-মহারাজ তখন সবে রাজা হয়েছেন। পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানিকে শেষ গতি লাভ করেছেন এবং ভগবত্তার স্বরূপে চিহ্নিত কৃষ্ণও তখন লীলা সংবরণ করেছেন। পাণ্ডবদের 'পরিক্ষীণ' রাজবংশের অপরিণত বংশধর হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষিৎ যে খুব খারাপ শাসন চালাচ্ছিলেন, তা নয়। বিশেষত তাঁর পিতৃ-পিতামহকুলের গৌরব তাঁর মনে সদা জাগ্রত থাকায় অন্যায়-অধর্ম প্রশমনের ব্যাপারে পরীক্ষিতের চেষ্টা ছিল যথেষ্ট। যাই হোক, তাঁর শাসন যখন চলছে, সেই সময় হঠাৎই পরীক্ষিতের কাছে এক অপ্রিয় বার্তা এসে পৌঁছল। বার্তাবহ্ জানাল— তাঁর রাজ্যে 'কলি' প্রবেশ করেছে— কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্তিতে।

পরীক্ষিৎ রাজা বলে কথা— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— এই চতুর্যুগের স্বরূপ তিনি জানেন। তিনি জানেন যে, চলমান মানব-

সভ্যতার পথ বড় পঙ্কিল, সময় বাহিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যায়, অধর্ম, অমানবিকতা আরও বেশি-বেশি গ্রাস করে এই পৃথিবীকে। কিন্তু তবু এই সময়ে, তিনি কেবল রাজা হয়েছেন, আর যুগাধম কলি এখনই এসে প্রবেশ করল তাঁর রাজ্যে। পরীক্ষিৎ এমনভাবেই প্রস্তুত হলেন যেন মহাশত্রুর নিপাত ঘটাতে হবে। আসলে সেই সময়ে পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয় করতেও বেরিয়ে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর কাছে খবর এসেছে, অতএব আর দেরি না করে তিনি যুদ্ধরথে উঠে পড়লেন কলি-দমনের অভিপ্রায়ে। পরীক্ষিতের রথের কালো ঘোড়া রথ ছুটিয়ে নিয়ে চলল, তাঁর হাতে ধনুর্বাণ, মনে দৃঢ় সংকল্প— কলিকে তিনি ভয়ংকর শাস্তি দেবেন— শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে।

পরীক্ষিতের তখনও তেমন মনোবুদ্ধির পরিণতি ঘটেনি। তিনি বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, যুগক্ষয়ের করাল মূর্তিকে অত সহজে চেনা যায় না, সে রূপ ধারণ করে আসে না— সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে যুগসম্বদ্ধ অন্যায়-অধর্মের মধ্যেই যুগক্ষয় পরিণতি লাভ করতে থাকে। পরীক্ষিৎও, কলিকে সেই রূপকেই দেখতে পেলেন। কালো ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে চলতে-চলতে হঠাৎই পরীক্ষিতের চোখের সামনে এক অদ্ভুত অঘটন ঘটে গেল। তিনি দেখতে পেলেন— একটি লোক, সে রাজার পোশাক পড়ে আছে, সে-পোশাকে সোনার বর্ণ ঝলমল করছে, তার হাতে একটি চাবুক— দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনম্। লোকটি যে জাতিতে শূদ্র, সেটা তেমন বুঝতে পারেননি পরীক্ষিৎ। হয়তো সে যেমন কাজ করছিল সেই নিরিখেই তাঁর অমন ধারণা হয়েছিল।

পরীক্ষিৎ দেখলেন— রাজবেশী পুরুষের সামনে একটি বৃষ দাঁড়িয়ে আছে, তার তিনটে পা-ই ভাঙা। রাজবেশী তাকে চাবুক দিয়ে মারছে। পরীক্ষিৎ আরও দেখলেন— সেই বৃষের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটি গাভী, তার শরীর জীর্ণ মলিন, সে তৃণমুষ্টি চাইছে খাবার জন্য, আর রাজবেশী তাকে মাঝে-মাঝেই লাথি মারছে— গাঞ্চ ধর্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাম্। বৃষটি সাদা রঙের, মুনিঋষিদের সত্ত্ববৃত্তির মতো সে শুভ্র। এমন বৃষটির তিনটি পা ভেঙে গেছে শুধু তাই নয়, রাজবেশী লোকটির দণ্ডতাড়নের ভয়ে সে মূত্র ত্যাগ করে ফেলছে মাঝে-মাঝেই গাভীটির অবস্থাও তথৈবচ, বাছুরকে না দেখলে যেমন মা গাভী কাঁদে, তেমনই কাঁদছে সে রাজবেশীর পদতাড়নায়।

যজ্ঞভাবিত ব্রহ্মাবর্তে বৃষ এবং গাভীর এমন অপমান-তাড়না দেখে পরীক্ষিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ধনুকে শরযোজনা করে প্রহরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই তিনি

সেই সোনার পোশাক-পরা লোকটিকে বললেন— কে হে তুমি, বদমাশ কোথাকার! নাটুকে নটের মতো রাজার বেশ পরেছ বটে, কিন্তু তোমার কাজকর্ম তো একেবারে চণ্ডালের মতো— নরদেবো'সি বেশেন নটবৎ কর্মণা-অদ্বিজঃ। তুমি কী ভেবেছ? আমার রাজ্যে আমার আশ্রয়ে যারা শরণাগত হয়ে আছে, শুধু তুমি বলবান বলেই সেই দুর্বল প্রাণীকে এমন করে তাড়না করবে? সেটা হবে না। তুমি মনে কোরো না— আজ আমার পিতামহ অর্জুন অথবা লোকশ্রুত কৃষ্ণ এই ধরাধামে নেই বলে এমন নিরপরাধ প্রাণীকে তুমি শাস্তি দিতে পারো। তোমাকে আমি মেরেই ফেলব।

পরীক্ষিৎ রাজবেশীকে ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ রেখে এবারে সেই বৃষ এবং গাভীটির দিকে নজর দিলেন। বৃষটিকে সাধারণ কোনও ষাঁড় মনে হল না তাঁর। পরীক্ষিৎ তাঁর সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং অভয় দিয়ে বললেন— বলো, তোমার এই দশা কে করেছে, তোমার তিনটি পা ভেঙে দিয়ে আমার পাণ্ডব-পিতামহদের কীর্তি নষ্ট করেছে কে? বল তুমি, কে— আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পার্থানাং কীর্তিদূষণম্?

পুরাণে বর্ণিত এই অসাধারণ কথোপকথন— যা শেষ হতে এখনও বাকি আছে— এ-কথোপকথনের মধ্যে একটি অসাধারণ রূপক আছে। রূপকে বিবৃত বৃষ হলেন ধর্মের স্বরূপ। বস্তুত অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম বা জ্ঞান বৃষের স্বরূপে চিহ্নিত। যাঁরা দেবদেব মহাদেবকে বৃষবাহন বলে জানেন, তারা যেন ওই বৃষটিকে সাক্ষাৎ ষণ্ড না ভাবেন। কারণ মহাদেবের কাছে জ্ঞান বা ধর্মের শিক্ষা চাইতে হয়— জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ— সেই জন্যই তিনি বৃষবাহন। ধর্মকে তাই বৃষের চেহারায় কল্পনা করতে কোনও অসুবিধে নেই। এক একটি যুগের শেষে এই চতুষ্পদী প্রাণীর এক একটি পা ভেঙে দিতে পুরাণকারদের বাধেনি। সত্যযুগে ধর্ম একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ, ষাঁড়ের চার পা-ও ঠিকঠাক। কিন্তু সত্যযুগ গিয়ে যেই ত্রেতা এল, অমনি ষাঁড়ের একখানি পা ভেঙে গেল, ধর্ম হল ত্রিপাদ। দ্বাপর যুগে পেছনের দু-পায়ে ভর করে ধর্মের ষাঁড় কোনও রকমে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু কলিকাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার তিনখানা পা-ই ভেঙে গেল। এ অবস্থায় সমস্ত চাপ নিয়ে একখানা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর, তবু ঠিক এই অবস্থাতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বালকবীর পরীক্ষিতের। তিনি দেখলেন— কে একটা লোক, রাজা-রাজা চেহারা বটে, সে ধর্মের ষাঁড়কে একটা ঠ্যাঙা দিয়ে প্রায় মারে আর কি! তাড়নার ভয়ে

ষাঁড়টি ঠক-ঠক করে কাঁপছে এবং প্রস্রাব করে ফেলেছে— ভয়াৎ মূত্রয়ন্নিব। পরীক্ষিৎ বললেন, খুব সাবধান। অন্যদিকে গাভীটি হলেন জননী বসুন্ধরার স্বরূপ এবং এই স্বরূপও কোনও অপরিচিত রূপক নয়। ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ থেকেই পৃথিবী-জননীকে গো-রূপে কল্পনা করা হয়। মহারাজ পৃথু, যাঁর নামে এই পৃথিবীর নাম পৃথ্বী, তিনি, নাকি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন, সেই তিনিই পদতাড়িতা হচ্ছিলেন পরীক্ষিতের সামনে। পৃথিবীর রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ তাই যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়েছেন রাজবেশী অন্যায়কারী মানুষটির ওপর।

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে বৃষরূপী ধর্ম স্পষ্ট করে নিজের পরিচয় না দিলেও নিজের বুদ্ধি-ভাবনায় তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন এবং গাভীটিকেও চিনতে পারলেন বসুন্ধরা বলে। পরীক্ষিৎ পৌঁছবার আগেই ধর্মরূপী বৃষ এবং গোরূপা বসুন্ধরার সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা দুজনেই দুজনকে পরস্পর দুঃখ নিবেদন করছিলেন— যুগক্ষয়ে ত্রিপাদভগ্ন ধর্ম এবং মলিনা কৃশা বসুন্ধরা যুগপাবনাবতার কৃষ্ণের কথা স্মরণ করে দুঃখ করেছিলেন। বলছিলেন— কৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধর্ম এবং ধরা— কেউই তাঁদের ক্রমবর্ধমান বিপর্যয়টুকু বুঝতেই পারেননি— শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলংকৃতাঙ্গী। কিন্তু সে সুখ এখন গেছে, এখন তাঁরা মার খাচ্ছেন রাজবেশী পুরুষের হাতে।

ধর্ম এবং পৃথিবীকে চিনে ফেলার পর রাজবেশী পুরুষটিকেও পরীক্ষিৎ কলি বলে চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ-গাভী-মিথুনকে অভয় দান করে তিনি খড়্গ নিয়ে ছুটলেন কলিকে হত্যা করতে— নিশিতমাদদে খড়্গং কলয়ে ধর্মহেতবে। কলি যেই দেখল— রাজা তাকে মারতে আসছেন, ওমনি সে আপন রাজবেশ ত্যাগ করে পরীক্ষিৎ-মহারাজের পায়ে পড়ল— তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্‌ভয়বিহ্বলঃ। আর এইভাবে শরণাগত হলে পাণ্ডব-বংশের জাতকেরা তাদের গায়ে হাত তোলেন না। পরীক্ষিৎ তাকে মারলেন না বটে, কিন্তু খুব কড়া গলায় বললেন— তুমি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। একবার তুমি এখানে আস্তানা গাড়লে যত অন্যায়-অধর্ম সব এখানে এসে ঢুকবে। তুমি ভেবেছটা কী? এই পুণ্যা সরস্বতী নদীর পূর্বতীরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, এই বহুশ্রুত ব্রহ্মাবর্ত-প্রদেশে যাজ্ঞিক বৈদিকেরা বিভিন্ন যজ্ঞ বিস্তার করে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করেন— ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈঃ/যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞ-বিতানবিজ্ঞাঃ— আর তুমি কিনা সেইখানে এসে ঢুকেছ

বেরোও এখান থেকে। জেনে রেখো— ধর্ম এবং সত্য ছাড়া এই জায়গায় কারও স্থান হবে না।

পরীক্ষিতের কথা শুনে কলি খুব ভয়বিহ্বল একটা ভাব করল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দমে গেল না কিংবা হালও ছাড়ল না। বলল— আপনার এই উদ্যত খড়্গের সামনে আমি থাকব কেমন করে? তার চেয়ে বরং আপনিই একটা জায়গা বলে দিন যেখানে আমি সুস্থিরভাবে বাস করতে পারি। পরীক্ষিৎ ভাবলেন— কতকগুলো খারাপ জায়গা তো এমনিই চিরকাল আছে, যেখানে অন্যায়-অধর্ম পূর্বচিহ্নিত, অতএব সেইখানেই কলি থাকুক। এই ভেবেই তিনি বললেন— ঠিক আছে, যেখানে জুয়াখেলা হয়, যেখানে মদ্যপানের আসর, যেখানে মাত্রাহীন স্ত্রী-সম্ভোগ এবং যেখানে অকারণ পশুবধ— এই চার জায়গায় থাকো তুমি। আর কোথাও নয়। অন্যায়-অধর্মের মূলাধার কলি অত্যন্ত পাটোয়ারি-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। সে ভাবল— অধর্মের এই স্থানগুলি তো চিরকালীন, এই অধর্ম তো সব যুগে, এমনকী সত্যযুগেও এ-গুলির নামত উপস্থিতি ছিল। কাজেই পরীক্ষিৎ আর নতুন কী দিলেন! মহাভারতে স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আপন স্ত্রী দ্রৌপদীকে পণ রেখে যে-অন্যায়ে মেতে ছিলেন, তাতে— দ্যূত, পান— এগুলি নিতান্ত পুরাতন অধর্মের জায়গা। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণপর্বে স্বয়ং বিকর্ণ পর্যন্ত অধর্মের স্থান চিহ্নিত করার সময় ওই চারটি জায়গাই বলেছিলেন— মৃগয়াং পানমক্ষাংশ্চ গ্রাম্যে চৈবাতিরক্ততাম্— অর্থাৎ সেই মৃগয়া, পান, দ্যূতক্রীড়া এবং স্ত্রীলোকে অত্যাসক্তি। কাজেই কলির মন ভরল না।

হয়তো আরও একটা ভাবনা ছিল কলির। সে ভাবল— যে-ঘটনা ঘটে গেল এবং পরীক্ষিৎ যেমন রাজশাসন জারি করলেন তাতে জুয়াখেলা মদ্যপান— এ-সব দুর্ব্যসনে মেতে উঠতে লোকে ভয় পাবে। বরঞ্চ যেটা দরকার, সেটা হল— লোকের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া, এবং এই সব অন্যায়ের জন্য রসদও চাই কিছু। অতএব কলি বায়না ধরলেন পরীক্ষিতের কাছে— শরণাগতের প্রতি এ আপনার কেমন কৃপণতা, প্রভু! এ-সব তো আমার আগেই ছিল। পরীক্ষিৎ বিগলিত হয়ে বললেন— ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে অর্থশক্তির জায়গাটাও দিলাম, তা না হলে লোকে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপানাদি করবে কী করে! আর দিলাম— ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার— মিথ্যা, মদ্যপানজনিত মত্ততা, স্ত্রীসঙ্গ-এর অনুষঙ্গ কাম, অকারণ প্রাণীবধের উপযুক্ত গর্ব, হিংসা এবং একটা ফাউ— অকারণ শত্রুতা— ততো'নৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।

প্রবলাবেগে আগত কলির আসন্ন প্রয়াস খানিকটা স্তব্ধ করে পরীক্ষিৎ নাকি ধর্মের ভাঙা পা তিনটিও ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং উপযুক্ত স্থিতাবস্থার আশ্বাস দিয়েছিলেন জননী বসুন্ধরাকেও— প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্ধয়ৎ।

দুই

পৌরাণিক এই কাহিনিটুকু হয়তো না বললেও চলত। এমনও করা যেত— পণ্ডিত-সুজনদের প্রথামতো পুরাণের একটা 'রেফারেনস' দিয়ে আমরা পরের প্রসঙ্গে যেতে পারতাম। কিন্তু এমনটি যে করলাম না, তার একটা বড় কারণ হল— এই রূপক-কাহিনির মধ্যে কলিযুগ ধারণার প্রধান উপাদানগুলি লুকিয়ে আছে। এই উপাদানের প্রধান হলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ যাঁর সঙ্গে কলিযুগের পিঠোপিঠি পরম্পরা-সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয়ত, সেই-যে রাজবেশী কলিকে পরীক্ষিৎ বলেছিলেন— তোমাকে দেখতে রাজবেশী বটে, তবে নাট্যকে নটেদের মতো রাজবেশে সেজেছ, নইলে তোমার কাজকর্ম অনেকটাই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ব্যক্তির মতো, বলা উচিত, শূদ্রদের মতো— নটবৎ কর্মণা অদ্বিজঃ— এই কথাটার মধ্যেও একটা ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ পূর্বে যে একটা সংস্কার ছিল যে ক্ষত্রিয়-জাতির মানুষেরাই শুধু রাজকর্ম করবেন, তা নয়; মহারাজ পরীক্ষিতের সময়েই শূদ্র-জনজাতি রাজকার্মের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরা রাজাও হচ্ছিলেন। পরীক্ষিৎ নিজেও কলিবধে উদযুক্ত হবার আগে ভগবতী পৃথিবীর উদ্দেশে বলেছিলেন— আহা! আজ এই পৃথিবীর কী অবস্থা হয়েছে। কৃষ্ণ যতদিন এই ধরাধামে ছিলেন ততদিন কোনও অমঙ্গল ঘটেনি, কিন্তু আজ তিনি লীলা-সংবরণ করার ফলে পৃথিবী আজ বিমনা হয়ে ভাবতে বসেছে যে,— হায়! এর পর থেকে রাজার বেশধারী ব্রহ্মণ্যাচারহীন শূদ্ররা এই পৃথিবী ভোগ করবে— অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি।

এই কথা থেকে বোঝা যায়— ধরাধাম থেকে কৃষ্ণের চলে যাওয়াটা একটা যুগাবসানের ইঙ্গিত দেয় এবং শূদ্র-রাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাও ঐতিহাসিক দিক থেকে একটা অন্য যুগের উপস্থিতি, অথবা বলা উচিত— একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করে। তৃতীয়ত, পরীক্ষিৎ যে ধর্মের তিনটি পা আবার সুস্থিত করে দিলেন— এর মধ্যে একটা পৌরাণিক অতিশয়োক্তি আছে। যুগহ্রাসের ফলে মানুষের মধ্যে যে আচার এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটছিল— সেটাকে

আধুনিকতার প্রসার বলব নাকি জানি না, তবে চিরন্তনী দৃষ্টিতে হয়তো পুরাতন আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্মের উচ্ছেদ ঘটছিল, পরীক্ষিৎ হয়তো রাজশক্তি প্রয়োগ করে সেই সনাতনী ভাবনা আবারও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মের ত্রিপাদ-প্রতিসন্ধান হয়তো এই চেষ্টার সূচক।

চতুর্থত, অধর্মের চিরন্তন চারটি স্থান লাভ করার পরে পুনর্বার যাচমান কলিকে যে আরও পাঁচটি স্থান দিলেন পরীক্ষিৎ সেগুলিও মানুষের কোনও অর্বাচীন বৃত্তি নয় এবং প্রথম চারটি অধর্মস্থানের সঙ্গে সেগুলি অবিযুক্তও নয়। বরঞ্চ বলব— ওই পুনর্দত্ত বস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটা বিশিষ্ট, সেটা হল— সুবর্ণ, পুরাণ যাকে বলেছে জাতরূপ— পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। টীকাকারেরা অর্থ করেছেন— জাতরূপং সুবর্ণাদিকম্— অর্থাৎ সোনা-রুপো ইত্যাদি। অধর্মের ইন্ধন হিসেবে অর্থ-সম্পত্তির জায়গাটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ— এই তথ্যটা যে এখানে খুব জরুরি, এটা বোঝানোর জন্য আমি খুব বিব্রত নই, কেন না ধর্মকার্যে, বিশেষত বৈদিক যজ্ঞাদিকর্মেও অর্থের ইন্ধন যথেষ্টই প্রয়োজন ছিল। কাজেই সেই দিক থেকে নয়, কলির সঙ্গে সুবর্ণ-রজতাদির যোগের ঘটনাটা আমাদের কাছে অতি-বিশিষ্ট এই কারণে যে, ঐতিহাসিকতার খাতিরেই বলতে পারি অতি-প্রাচীন কালে- - যে প্রাচীনত্বকে আমরা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে পারি— সেই কালে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহার চালু ছিল না, এমনকী সোনা-রুপো তখনও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল না।

অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উৎপাদনের প্রাচুর্য— এ-দুটি যদি নিয়মিত ব্যবসায়িক লেনদেন তথা অন্তঃরাষ্ট্রীয় পারস্পরিকতা তৈরি করে, মুদ্রার প্রচলন ত্বরান্বিত করে, তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঋগবেদের আমলেও আমাদের দেশে যথাযথ মুদ্রামান তৈরি হয়নি। 'কৃষ্ণল', 'শতমান' অথবা 'নিষ্ক'— এই ঋগবৈদিক শব্দগুলি যদিও মুদ্রানামের স্মরণ ঘটায়, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যেহেতু এক হাজার থেকে ছ-শো খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সোনা-রুপো-তামা কোনও ধাতুরই কোনও চিহ্নিত মুদ্রা খুঁজে পাননি, অতএব তাঁরা মনে করেন যে, ভারতবর্ষে সভ্যতা তখনও এমন স্তরে পৌঁছয়নি যাতে করে তেমন কোনও উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক বিস্তার কল্পনা করা যায় এবং সেই কল্পনার সমগোত্রীয় মুদ্রা-বিনিময়ের কথা ভাবা যায়। আমরা যে চন্দ্র-সূর্য অথবা হাতি-ঘোড়ামার্কা 'পাঞ্চ-মার্কড কয়েন'-এর সন্ধান পাই,

সেগুলোও কোনও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির পরিচায়ক মুদ্রা নয়, সেগুলো নেহাতই বেসরকারি উদ্যোগে সৃষ্ট এবং আপন ব্যবসায়িক সুবিধার্থে তৈরি করা এলোমেলো ধাতবখণ্ড— কিন্তু সেগুলিও খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগের নয় বলেই প্রাচীন মুদ্রা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

তবে একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায়— চাক্ষুষভাবে কোনও মুদ্রার সন্ধান হয়তো এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে আমরা পাইনি; কিন্তু সাহিত্যের শব্দগুলোও তো একেবারে ভিত্তিহীন নয়; বিশেষত 'নিষ্ক' শব্দটি, যা পরেও মুদ্রামান হিসেবে চিহ্নিত, অন্তত এই শব্দটির জন্যও আমাদের দু-বার ভেবে দেখার কারণ আছে। আরও একটা কথা। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণেই জানি যে, খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার থেকে ছ-শো শতকের মধ্যেই কৌশাম্বী (এলাহাবাদের কাছে), কাশী অথবা মগধের মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে নগরায়ণ ঘটে গিয়েছিল। আর এটা তো সাধারণ কথা যে প্রান্তিক ভূমিক্ষেত্রগুলিতে উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্য না মিললে সার্থক নগরায়ণ ঘটে না এবং নগরায়ণ যদি ঘটে থাকে সেখানে গ্রাম এবং নগরে ব্যবসায়িক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহারও খানিকটা কল্পনা করে নিতেই হয়।

আমরা মুদ্রা-ব্যবহারের উদ্ভব নিয়ে এত কথা বলছি এই জন্য যে, আমাদের বিশেষ ধারণা— মুদ্রা-ব্যবহারের সঙ্গে কলিযুগের একটা বিশেষ যোগ আছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ যে বিনম্র যাচমান কলিকে 'জাতরূপ' অর্থাৎ সুবর্ণ-রজতের স্থানাধিকারটুকু ছেড়ে দিলেন— পৌরাণিকের এই রূপক-ব্যবহারের মধ্যে এক ধরনের ঘৃণা এবং বিস্ময় একসঙ্গে কাজ করছে। ঘৃণা এইজন্য যে, জুয়া, মদ্যপান, অবাধ স্ত্রী-সঙ্গ অথবা খুব 'অ্যাবস্ট্রাক্টলি' ভাবলে কাম, মদ (গর্ব), রজোগুণের আধিক্য এবং অকারণ বৈরিতার মধ্যে মুদ্রামান-সম্পন্ন সহজ এবং গতিশীল অর্থ-ব্যবহারের একটা প্রক্রিয়া পৌরাণিকরা লক্ষ করেছেন এবং ব্যাপারগুলি সহজ হয়ে গেছে বলেই তা কলির নতুন অধিকারের মধ্যে এসেছে। আর বিস্ময় এইজন্য যে, গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে নগরায়ণের রূপান্তর এবং নাগরিক সভ্যতায় উদ্বৃত্ত অর্থের যথা-তথা অপব্যবহার, বিশেষত পুরাতন অধর্ম স্থানগুলির সহজ উপযোগ— যা মুদ্রা-বিনিময়ে সহজতর হয়ে উঠেছিল— এই ঘৃণামিশ্রিত চমৎকারই পৌরাণিককে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে যে, সব গেল, ভালর সময় শেষ, এখন কলিকাল এসে গেছে।

মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের পিতা-পিতামহরাও একই কথা বলতেন। বলতেন— ঘোর কলি। যে-ঘরে অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে, সেখানে যেমন কলির প্রসঙ্গ আসত, তেমনই কাজের লোক মুখঝামটা দিয়ে যদি মনিবকে দুটো কথা শুনিয়ে কাজ ছেড়ে দিত, তাতেও কলির প্রসঙ্গ আসত। ছেলে যদি বাপের মুখের ওপর তর্ক করত, তাতে যেমন কলির উচ্চারণ শোনা যেত, তেমনই আমার বউদির বান্ধবী যেদিন 'স্লিভলেস ব্লাউজ' পরে আমার পিতাঠাকুরকে 'কাকু' বলে নমস্কার করেছিলেন, সেদিন তিনি আপন স্নিগ্ধতাবশত স্পষ্ট করে কিছু না বললেও পরে তত্ত্বগতভাবে 'কলির' জায়গায় 'কাল' শব্দটি ব্যবহার করে বলেছিলেন— কালের গতি এমন তো হবেই, পরিবর্তন তো আরও হতে থাকবে যা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠবে।

এই যে হা-হুতাশ, এই যে পরিবর্তনের স্রোতটাকে সহ্য করতে না পারা, প্রাচীনতা থেকে অর্বাচীন ব্যবহারের মধ্যে এই যে বিবর্তন— এরই মধ্যে আসলে কলিকালের খণ্ড-চরিত্রটুকু ধরা আছে। তবে হ্যাঁ, এটা শুধুই 'জেনাবেশন গ্যাপ' বা শুধুমাত্র প্রাচীন ধাবণাব বিবর্তিত পরিবর্তন বলে পার পাওয়া যাবে না। কেন না প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেও দেখা যাবে যে, আচার-ব্যবহার এবং পুরাতন ধারণার পরিবর্তনের মধ্যে কলিকালেব আরোপ ঘটছে বহুকাল থেকে। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পৌরাণিকেরা যখন কলিধর্মের বর্ণনা করছেন— যা অনেকটাই সামাজিক আচার, বিচার এবং ব্যবহারের পরিবর্তন সূচনা করছে, তেমনই, একই সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র পরিবর্তন, অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন এবং এমনকী বিশ্বাস পরিবর্তনের কথাও নির্দিষ্ট করে বলছে। এ কথা মানতে হবে যে, পুরাণগুলি সব এককালে এবং একই দেশে রচিত হয়নি। এতে আরও বেশি সুবিধে হয় এইজন্যে যে, এক একটি পুরাণে তার সমসাময়িক এবং দেশজ-ভাবনার পরিবর্তনের কথাও কলিধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। অতএব পৌরাণিকেরা যে প্রত্যেকে প্রায় প্রথাগতভাবে সক্ষোভে কলিযুগের অধঃপতন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সেটার মধ্যে ধর্মের অবক্ষয় ব্যাপারটা যত প্রণিধানযোগ্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সেটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল। এক কথায়, সেটা অতি প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের আরম্ভ সূচনা করে।

কলিধর্ম বর্ণনার সবচেয়ে প্রাচীন দলিলটি পাওয়া যাবে মহাভারতে। যদিও, তারও আগে, এই শব্দটার মধ্যে যে একটা নিন্দনীয় অর্থ ছিল এবং সেই অর্থই যে পরবর্তী কালে পৌরাণিক কলি ধর্মে প্রসারিত হয়েছে, তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। একটা বড় মাপের সময় হিসেবে যুগ কথাটা আমরা অন্তত ঋগ্‌বেদে পাইনি। তবে হ্যাঁ, 'ভবিষ্যতে বড় খারাপ সময় আসছে'— এই হা-হুতাশি কথাবার্তা, যেমনটি আমরা বুড়োরা বলে থাকি, সেই অর্থে যুগ কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে। সভ্যতার প্রাগ্‌ভাবনায় যম-যমী সংবাদে, যমী যে 'ইনসেস্‌চুয়াস্ অ্যাটেম্প্ট' নিয়েছিলেন, যেখানে যম তাঁকে শান্ত করেও এমন আশঙ্কা করে বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে বড় খারাপ সময় আসছে, যখন বোনেরা ঠিক আর বোনেদের ব্যবহারটুকু করবে না— আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র যাময়ঃ কৃণবন্নজামি। ঋগ্‌বেদের যুগধারণা এইটুকুই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-কলির কথা তাঁরা বলেননি। যুগ বলতে ওঁরা জানতেন— পুরাকাল, বর্তমান কাল আর ভবিষ্যৎ। লক্ষ-কোটি বৎসর-ব্যাপী চতুর্যুগের ধারণা ঋগ্‌বৈদিকের ছিল না। অথর্ববেদের মধ্যে অন্তত হাজার হাজার বছর ধরে একটি যুগের কল্পনা এসেছে বটে, এমনি চতুর্যুগের একটা অস্পষ্ট ধারণাও কাজ করছে আথর্বণিকের মনে— শতং তে স্যুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ— কিন্তু সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির নামত কোনও স্পষ্ট ধারণা অথর্ববেদেও নেই। তবে হ্যাঁ, কৃত (মানে সত্যযুগ) এবং কলি শব্দটা অথর্ববেদে শোনা যাচ্ছে, তবে এই দুটি শব্দই পাশার দান হিসেবে ব্যবহৃত হত। 'কৃত'-শব্দটা ঋগ্‌বেদেই ছিল এবং পাশাখেলায় সেটা সবচেয়ে ভাল দান হিসেবে গণ্য হত, অথর্ববেদে তার সঙ্গে কলি-শব্দও এসেছে এবং সেটা পাশাখেলার সবচেয়ে খারাপ দান।

পাশাখেলায় কলি-দান ভাল না খারাপ, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সামান্য মতভেদ আছে। যদি বা তা ভাল দানও হয় তবুও তা ঘৃণ্য জুয়াখেলার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই অর্থে কলির মধ্যে খারাপের যন্ত্রণাটুকু রয়েই গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার যে, একটি অতিব্যাপ্ত যুগ হিসেবে শুধু কলি কেন, সত্য (কৃত), ত্রেতা, দ্বাপর কোনওটাই কিন্তু কাল হিসেবে সদর্থক হয়ে ওঠেনি ঋগ্‌বেদ থেকে অথর্ববেদের কাল পর্যন্ত। এমনকী বেদের অব্যবহিত তথা পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি— যেগুলি তত্ত্বগতভাবে বেদই অথবা বেদের সমগোত্রীয়, সেখানেও কিন্তু একটা কালসমষ্টি হিসেবে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলির উল্লেখ নেই।

কিন্তু অতি প্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা অসাধারণ একটা মন্ত্র শুনতে পাচ্ছি, যেখানে চতুর্যুগের নামগুলি তো আছেই, অপিচ সেই শ্লোকের মধ্যে এই ধারণাটুকু প্রথম পাওয়া যায় যে, যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি— এই চতুর্যুগের মধ্যে পর পর এক ক্রমিক অবক্ষয়ের ব্যঞ্জনা আছে। ঐতরেয়-শ্লোকের ভাষা থেকে এটা যদিও স্পষ্ট নয় যে, চতুর্যুগের নামত উল্লেখ আদৌ কোনও কাল-সমষ্টি বোঝাচ্ছে অথবা বোঝাচ্ছে না, কিন্তু কলি থেকে কৃত (সত্য) পর্যন্ত ক্রমিক গুণগত উত্তরণ অথবা উলটো দিক থেকে ধরলে যে ক্রমিক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটছে, তাতে মনে হয় সত্য থেকে কলির মধ্যে আমরা যে যুগক্ষয়ের ভাবনাটুকু পরবর্তীকালে ভেবেছি, তার একটা অস্পষ্ট উচ্চারণ এই ঐতরেয়-শ্লোকের মধ্যে আছে।

ঐতরেয়-এর গাথা-শ্লোক বলছে— যে কেবলই উদ্যোগহীনভাবে শুয়ে আছে, সেটাই কলি, যে শয্যালস্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করছে, সে হল দ্বাপর, যে সত্যিই উঠে দাঁড়াল, সে হল ত্রেতা, আর উঠে দাঁড়িয়ে যে নিরলসভাবে চলছে সে হচ্ছে কৃত— উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্। সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর থেকে চরম বোধদায়ক কোনও শ্লোক যে সেই প্রাচীনকালে উচ্চারিত হয়নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। সমৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য যে বিরামহীন উদ্যোগ লাগে কৃতযুগ তারই প্রতীক আর কলি হল অলস অবসাদগ্রস্ত এক চিরন্তনী মায়ানিদ্রা যা অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই গাথা-শ্লোকের মধ্যে অন্যতর যদি কোনও গূঢ়ার্থ থাকে, তবে তা পরে বিচার করব, এখন এইটুকু দিয়েই শুরু করতে চাই যে, কলি এখানে স্পষ্টত যুগ বা কালসমষ্টি হিসেবে নির্ধারিত নয় বটে, এমনকী পরবর্তীকালের মহাভারত এবং কিছু পুরাণও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট বিশেষার্থে কৃত-ত্রেতা-কলির ব্যবহার করেছে, কিন্তু সে একেবারেই বিশেষ অর্থ। বরঞ্চ বলা উচিত— কলি-শব্দটার মধ্যে যে-অবক্ষয় এবং অন্যায়ের সূচনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যেও সূত্রিত থেকে গেছে, সেই অবক্ষয়ের চেতনাটাই বেশি করে পৌরাণিকদের মনে কাজ করেছে— আমরা যদিও সেই অবক্ষয়ের মধ্যেই সভ্যতার গতিপরিবর্তনের ইঙ্গিত পেয়েছি, সে-পরিবর্তন ভালো না মন্দ— সেটা অন্যতর বিচার, কিন্তু সেটা প্রাচীন থেকে মধ্য অথবা মধ্য থেকে আধুনিক যুগের আরম্ভ সূচনা করে।

তিন

মহাভারত এবং পুরাণগুলি কলিকালে যে-সব অন্যায়-অধর্ম ঘটবে বলে বলেছেন, তার একটা বিবরণ নিবদ্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আধুনিক ঐতিহাসিকদের সমাজ-চেতনার অংশটুকুও এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। কলিকালের বৈশিষ্ট্য দেখাবার সময় মহাভারত এবং পুরাণগুলি যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে, তার মধ্যে বেশ কিছু তথ্য আছে, যেগুলি তৎকালীন বিশ্বাসের কথা। ভাবটা এই যেন— ভীষণ অন্যায় এবং অধর্মময় কলিকালে কতকগুলি অদ্ভুত জিনিস ঘটবে। সমস্ত পুরাণ, এমনকী মহাভারতেও এগুলি এক ধরনের 'স্টক্' ভবিষ্যদ্‌বাণী— যেমন কলিকাল উপস্থিত হলে গোরুগুলির দুধ কমে যাবে, অর্থাৎ পেলে-পুষে গোরু বড় করলাম, কিন্তু সে দুধ দেবে কম— অল্পক্ষীরাস্তথা গাবো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। এটা মহাভারতের শ্লোক, কিন্তু এই বিশ্বাসের কথাটাই বিষ্ণুপুরাণ ঘুরিয়ে বলেছে— কলিকালে ধানগুলো সব আকারে ছোট হয়ে আসবে, আর গোরু দুধ দেবে ছাগীর মতো— অণুপ্রায়াণি ধান্যানি, অজাপ্রায়ং তথা পয়ঃ। কথাটা প্রায় একই শব্দে ভাগবত পুরাণও বলেছে— ছোট্ট ছোট্ট ধান আর ছাগীর মতো গোরুর দুধ দেওয়া। আমাদের পরিবর্তনশীল সমাজে এই দুর্ভাবনা নিছকই ধর্মের আতঙ্কজাত। এই বিশ্বাসের কথাটুকু ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে আতঙ্কটুকু বোঝা যায়। পশুপালনধর্মী আর্যরা তথাকথিত অনার্যদের কাছ থেকে কৃষিকর্ম শিখে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এখানে সেই আতঙ্কটুকুই প্রকাশ পেয়েছে যখন কৃষিকর্ম বা গো-প্রজননকর্মের দুষ্প্রয়োগে ধান ছোট হয়েছে অথবা গোরুর দুধ কমেছে।

এমনিতর আতঙ্কের মধ্যে যা কিছু প্রাচীনেরা চোখে দেখে ভয় পেয়েছেন, প্রকৃতির যে কোনও বিপর্যয় তাঁদের বিপর্যস্ত করেছে, সেগুলি সব তাঁরা চাপিয়ে দিয়েছেন কলিকালের মাথায়। যেমন ধরুন, কলিকালের আকাশে মেঘ ডাকবে প্রচুর কিন্তু তাতে বৃষ্টির জল থাকবে কম, বিদ্যুৎ চমকাবে বেশি, প্রচুর কষ্ট করে বহু বীজ পুঁতে চাষ করা হলেও শস্য হবে কম। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ছয় ঋতুর নানান বিপরিবর্তন, ফল-ফুলের অভাব, পত্র-পুষ্পহীন শুষ্ক-রুক্ষ বৃক্ষসম্পদ, খাদ্যশস্যের অভাব, অতিরিক্ত রোগব্যাধি— এগুলি সবই সেই আরোপিত আতঙ্কজ কলিধর্ম, যা প্রাচীন পুরুষেরা দেখেছেন বা যে-সব বিপর্যয় থেকে তাঁরা কষ্ট পেয়েছেন। আসলে এ-সব একেবারে সাধারণ

ভবিষ্যদ্‌বাণী, কিন্তু এই সামান্য বর্ণনার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাচীন পুরাণ যখন বলবে— কলিকালের দুর্ভিক্ষ, রাজকর আর ব্যাধি-পীড়ায় জর্জরিত হয়ে মানুষ সেই সব দেশে গিয়ে বাস করতে থাকবে, যেখানে খাবার-দাবার অধম প্রকৃতির এবং সেখানকার মানুষেরা 'গবেধুক' ধানের চাল খায়— গবেধুক-কদন্নাদ্যান্ দেশান্ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ— তখন বুঝতে হবে— আর্যরা উত্তর-ভারতের ব্রহ্মাবর্তের গণ্ডি ছেড়ে এইসময়ে দক্ষিণ-ভারতে ঢুকে পড়েছেন, যেখানে খাদ্য চালের গুণমান ভাল নয়। অর্থাৎ বাংলায় যাকে গড়গড়া দে-ধান বলে সেই জাতীয় বড়-বড় গড়গড়া চালের ভাত হয় সেখানে। এই ভাত তাঁরা খেতে পছন্দ করেননি বলেই কলিকালের কপালে সেই ভাত জুটেছে।

সাধারণ এই সব প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবর্তন ছাড়াও আর একটা কথা খুব শোনা যাবে এবং সেটা হল— মানুষ সত্যযুগে অনেক লম্বা ছিল, কলিকালে সব বেঁটে হয় যাবে। লম্বা হওয়া অথবা বেঁটে হয়ে যাওয়াটা কালের গতির ওপর কতটা নির্ভর করে, এটা তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করা খুব কঠিন, কিন্তু এটা যে ভয়ংকর একটা বিশ্বাস, সেটা খুব ভালো করে পাওয়া যাবে দুটি ঘটনার মধ্যে। প্রথম ঘটনা— কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের বিবাহে। বলরাম-পত্নী রেবতীর পিতা রৈবত ককুদ্মী পূর্বকালে মেয়ের উপযুক্ত পাত্র খোঁজার জন্য ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে গন্ধর্বরা গান গাইছিল। গানের সুরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রৈবত-ককুদ্মীর চতুর্যুগ কেটে গেল। পৃথিবীতে নেমে এসে তিনি দেখলেন— মানুষগুলো সব কেমন বেঁটে হয়ে গেছে, তাদের তেজ-বীর্য-শক্তি আর আগের মতো নেই— দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষান্ অশেষান্/অল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্যান্। ঠিক একইরকম কথা আছে মুচুকুন্দ রাজার মুখে। তিনি ত্রেতাযুগ থেকে ঘুমিয়ে উঠে নিজের নেত্রবহ্নিতে কালযবনকে সংহার করার পর দেখলেন— বেঁটেখাটো মানুষে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেছে, আগের মতো আর কিছু নেই।

'কালযবন' কথাটা শুনেই তো সাহেব-গবেষকরা এর মধ্যে বহুতর কূটতত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। হিল্‌টেবেইটল নামে এক প্রসিদ্ধ গবেষক তো বলে দিয়েছেন— কৃষ্ণের সঙ্গে কালযবনের সংগ্রাম আসলে 'a confrontation of cosmologies'.

আমরা এত বড় কথা বলি না। আমরা বুঝি— সভ্যতার মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। কৃষি, কর্মান্ত, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র— সর্বত্র এমন একটা

পরিবর্তন আছড়ে পড়েছিল সেই পূর্বকালে যাতে স্থবির-বৃদ্ধ রৈবত-ককুদ্মী অথবা ত্রেতা-যুগ থেকে ঘুমিয়ে থাকা মুচুকুন্দ হঠাৎ এই তরুণী পৃথিবীকে দেখে আমাদের বৃদ্ধকুলের মতোই বলে ফেলেছিলেন— কোনও কিছু আর আগের মতো নেই— সেই উৎসাহ, সেই শক্তি, যা আমাদের কালে ছিল, সে-সব এখন কোথায়! একই কথা মহাভারতের কলিধর্ম-বর্ণনাতেও— মানুষের আয়ু অল্প, শক্তি অল্প, শরীর হ্রস্ব এবং তাদের উৎসাহ-উদ্যোগ-প্রাণশক্তিও অল্প— অল্পসারা অল্পদেহাশ্চ... স্বল্পবীর্যপরাক্রমাঃ। আসলে এ হল সেই স্থবির বৃদ্ধ পুরাকাল-পুরুষ, যে সব সময় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পুরুষের শক্তি, প্রাণ এবং প্রেমে সন্দেহ করেছে—

পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই;— বিজ্ঞানেব ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়; মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়, তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়।
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি!

মহাভারতের ক্রান্তদর্শী কবি বরং যে-কথাটা জননী সত্যবতীকে বলেছিলেন— সুখের সময় চলে গেছে, মা— অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ— সামনে বড় খারাপ সময় আসছে। পৃথিবী তার যৌবন হারিয়েছে আমাদের কাছে— শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠদিবসাঃ... পৃথিবী গতযৌবনা— আমাদের ধারণা— স্থবিরজনের কাছে এই পাপিষ্ঠ ভবিষ্যদ্‌-ভাবনাই কলিকালের মানুষের ওপর বর্তেছে— তার প্রাণশক্তি কম, আয়ু কম, শক্তি কম— এত সব অভিশাপ।

এই সাধারণ দুর্ভাবনাগুলি বাদ দিলে আর যত আরোপ এবং অধ্যাক্ষেপ আছে কলিকালের ওপর, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, নৈতিক এমনকী বৈশিক পরিবর্তনও ঘটছে— প্রাচীনযুগের অবসানে এবং প্রাচীনের তুলনায় ইতিহাস নতুন যুগে প্রবেশ করছে। নতুন যুগ অথবা মধ্যযুগ কথাটা খুব অস্পষ্ট। আরও স্পষ্ট করতে হলে আগে জানা দরকার, এই নতুন যুগটা অর্থাৎ কলিযুগটা পড়ছে কখন? সেটা স্পষ্ট হলে রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের সময়টাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমরা প্রথমে যে-উপাখ্যান দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পাণ্ডব-পিতামহদের নাতি পরীক্ষিৎ যখন সিংহাসনে বসেছেন, তখনই কলির প্রবেশ ঘটছে। কিন্তু এ-বিষয়েও পৌরাণিক পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। পণ্ডিতদের একাংশ, পৌরাণিকদের মত মেনে বলেছেন— ভগবান কৃষ্ণ যেদিন ধরাধাম ছেড়ে চলে গেলেন, ঠিক সেইদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ— যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি। প্রতিপন্নং কলিযুগং...॥ অন্য পণ্ডিতেরা আবার বলেছেন যে, মহাভারতের সেই ভয়ংকর যুদ্ধ থেকেই কলিযুগেরই প্রবৃত্তি ঘটেছে, কারণ ওই যুদ্ধটাই হয়েছিল কলি আর দ্বাপরের সন্ধিলগ্নে— অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং...। যুগপুরাণ মন্তব্য করেছে— মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী যেদিন শরীর এলিয়ে নুয়ে পড়লেন মরণের কোলে, সেদিন থেকে কলিযুগের শুরু। এই সব তথ্যের ওপরে আছে আর্যভট্ট এবং বরাহমিহিরের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বদের অঙ্ক-গণনা।

আমরা যা বুঝি— একেবারে সঠিক করে কলিযুগের আরম্ভকাল নির্ণয় করা খুব কঠিন। কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০১২ শতকে কলিযুগ আরম্ভ, কারও মতে খ্রিস্টজন্মের ২৫০০ বছর আগে এবং কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব উনিশ শতকে কলিযুগের আরম্ভ। ঐতিহাসিকেরা বেশির ভাগই বিভিন্ন পুরাণের সেই ঐতিহাসিক উক্তি মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ পাণ্ডব-বংশধর পরীক্ষিৎ এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মহাপদ্ম নন্দ— এই দুই জনের সময়ের ফারাক হল ১৫০০ বছর— জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্। তার মানে যে কোনও একটা বৃহৎ বিপর্যয়ই যদি কলির আরম্ভ সূচনা করে থাকে— সে মহাভারতের যুদ্ধই হোক, কৃষ্ণের লীলা-সংবরণ-কালই হোক অথবা দ্রৌপদীর পতন— তা কোনওভাবেই খ্রিস্টপূর্ব উনিশ শতকের খুব আগে যাবে না, বড় জোর খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর। সময়টা এইভাবে যদি মোটামুটি স্থির করে নেওয়া যায় এবং তার পরে মহাভারত এবং পুরাণগুলির সময়কাল ভেবে নিয়ে সেখানে বলা কলিধর্মের বিচার করা যায়, তা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে আমরা ইতিহাসের দৃষ্টিতে যে-সময়টাকে প্রাচীন যুগ বলছি, পুরাণগুলি সেই যুগারম্ভের ওপরেই কলিধর্ম চাপিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমেই যদি রাষ্ট্র এবং রাজা-রাজড়ার কথায় আসি, তা হলে মহাভারতের কথাই আগে বলতে হয়। মহাভারত বলছে— কলিযুগে বহু জায়গাতেই ম্লেচ্ছদের রাজা হতে দেখা যাবে— বহবো ম্লেচ্ছরাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ।

মহাভারতকার এই ম্লেচ্ছ রাজাদের জাতিনাম কীর্তন করেছেন— এঁরা নাকি আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর এবং আভীর। লক্ষণীয় বিষয় হল— মহাভারত কলিযুগের রাজা হিসেবে যে জাতি-নামগুলি করেছেন, এইসব জনজাতি বা গোষ্ঠী মহাভারতের আমলেই ছিল, বড়জোর বলা যেতে পারে, আর্য ভূখণ্ডের হৃদয়ভূমি ব্রহ্মাবর্ত থেকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত যার ভৌগোলিক অবস্থান, সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বিপর্যয়ের পর পরীক্ষিৎ রাজা হয়েও পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রভাব তেমন বিস্তার করতে পারেননি। ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত দেশগুলিতে— সেটা দক্ষিণ-দেশেই হোক অথবা পশ্চিমে, অথবা সুদূর উত্তর-পশ্চিমে— যে-সব জনগোষ্ঠী ছিল তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ছিল।

আন্ধ্র জন-জাতির কথাই ধরা যাক। এরা মহাভারতে নতুন কোনও জনগোষ্ঠী নয় যে কলিযুগে আলাদা করে তাদের জন্মাতে হবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যা নাকি খোদ বেদগ্রন্থের অব্যবহিত পরে লেখা এবং মহাভারতের চাইতে যা নাকি অনেক আগে লেখা, সেখানে পর্যন্ত দস্যুভাবে আন্ধ্রদের উল্লেখ আছে। মহাভারত অন্যত্র এই জনজাতিকে দক্ষিণদেশের অসভ্য অনাচারী বর্বর জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ করেছে এবং ওই আন্ধ্রদের সগোত্রীয় দক্ষিণদেশী অন্য জনজাতিরা হল— পুলিন্দ, শবর, গুহ, চুচুক, মদ্রক। তথাকথিত আর্যভূমির বাইরে বিন্ধ্যপর্বতের আশপাশে পুলিন্দদের বাস ছিল। মধ্যম পাণ্ডব ভীম পুলিন্দদের দিগ্‌বিজয়ের সময় হারিয়ে দিলেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বসতিস্থান পুলিন্দনগরের খবর পাচ্ছি আমরা। সবচেয়ে বড় কথা— সেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুলিন্দ জন-জাতিরও উল্লেখ পাচ্ছি এবং তারা মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীতে স্থানও করে নিয়েছিল, ঠিক যেমন আন্ধ্র-জনজাতিও ছিল দুর্যোধনের অনুকূলেই। অতএব এরা আর নতুন করে কলিযুগের উপদ্রব হবে কী করে?

এরা ছাড়াও কলিযুগের রাজাদের মধ্যে যে-সব যবন, শক, বাহ্লিক, কাম্বোজদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অনেকেরই বসতি ছিল বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। এখনকার আফগানিস্তান, ইরান-পাকিস্তানের সীমান্তদেশ, উত্তর-পশ্চিমের পাঞ্জাব অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়া এবং গ্রিস-এর নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসা শক-হুন-যবনদের প্রতিপত্তির কথাও কিছু কম নেই মহাভারতে। এই উপজাতীয় গোষ্ঠীর নায়কেরা অনেকেই মহাভারতের বিরাট যুদ্ধের সময় কৌরব-পক্ষে দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। 'মার্সেনারি'

সৈন্য বলতে যা বোঝায়— তেমনটা এই সব উপজাতীয় গোষ্ঠীর কাছে খুব সহজলভ্য ছিল। মহাভারতের প্রধান পুরুষদের শাসন-অধিকার চলবার সময় তাঁদের দাপটে ভারতবর্ষের প্রত্যন্তদেশীয় উপজাতিগুলি স্বাভাবিক কারণেই প্রশমিত এবং দমিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষিৎ এবং তাঁর ছেলে জনমেজয়ের স্বর্গারোহণের পর সরস্বতী-নদীর তীর থেকে গঙ্গাতীরবর্তী যে-ভূমিখণ্ড প্রসিদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবের অধিকারে ছিল, তার একতা নষ্ট হয়ে যায়। উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথেব ছোট্ট-ছোট্ট সামন্ত রাজারা— যাঁদের অনেক সময়েই অনার্য-সংস্কৃতিব প্রতিভূ মনে করা হয়, তাঁদের পরস্পর-বিশ্লিষ্ট উত্থান ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে।

আমরা জানি— বিম্বিসার-অশোকের দেশে রাজনৈতিক একতার একটা সূত্র তৈবি হয়েছিল অবশ্যই— যা পরে সুপ্রসিদ্ধ নন্দ রাজাদের আমলে এবং বিশেষত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে অনেকটাই দৃঢ় হয়ে ওঠে, যদিও সেই একতা গড়ে উঠেছিল প্রধানত পূর্বাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ম্যাসিডনের রাজপুত্র আলেকজান্ডারের সময়ে উত্তর-ভাবতে আমরা যে-রাজনৈতিক খণ্ডতা দেখেছি, এই খণ্ড বাজনীতি চলছিল বহুদিন ধরে এবং দক্ষিণাপথে আন্ধ্র তথা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যে প্রতাপ-প্রভাব বেড়েছিল, তাও ইতিহাসের প্রমাণেই স্বীকৃত। মহাভারতে কলিধর্ম-বর্ণনায় ম্লেচ্ছরাজা বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হয়তো চিরন্তন-ঘৃণাকলুষিত জাতি-নাম, কিন্তু তাঁরা যে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই জায়গাতেই প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে-কথা মহাভারতেই অন্যত্র আছে। শক্তিশালী এবং প্রসিদ্ধ রাজাদেব আমলে প্রত্যন্তদেশীয় এই-সব জনগোষ্ঠী যে দমিত এবং প্রশমিত ছিল সে-কথা বেশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে লেখা হয়েছে 'সর্বভূতোৎপত্তি'-কথনের প্রসঙ্গে।

যে-কোনও ক্ষুদ্র রাজশক্তিও একদিনে বেড়ে ওঠে না, সেটাই স্বাভাবিক এবং সে-কথা মাথায় রেখেই মহাভারত বলেছে— ত্রেতাযুগ থেকেই এই-সব প্রত্যন্ত ম্লেচ্ছরাজারা শক্তিসঞ্চয় করছিল— ত্রেতা প্রভৃতি বর্ধন্তে তে জনা ভরতর্ষভ। 'তে জনা' মানে সেই সব রাজারা। তাঁরা কারা? তার মধ্যে দক্ষিণাপথজন্মা আন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক এবং মদ্রকেরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন উত্তরাপথের অনার্যনামাঙ্কিত জনগোষ্ঠী— যৌন-কম্বোজ-গান্ধারাঃ কিরাতা বর্বরৈঃ সহ। লক্ষণীয়, যে-গান্ধারে ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী জন্মেছিলেন, সেই গান্ধারও ম্লেচ্ছ-বর্বরদের সঙ্গে একত্রে কীর্তিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির প্রাচীন ইতিহাসচর্চার প্রমাণে বলা যায় যে, ৭৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত গান্ধারে যে ভাব-ভাবনা কাজ করেছে, তা ব্রাহ্মণ্য-ভাবধারার বিরোধী ছিল এবং ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি পুক্কুসাতি নামে যে রাজা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাগধ নৃপতি বিম্বিসারের চিঠি চালাচালি হয়েছিল বটে একবার, কিন্তু তিনি অবন্তীরাজ্যের রাজা প্রদ্যোতকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

তৎকালীন গান্ধার রাজ্যের মধ্যে আমাদের কাশ্মীর উপত্যকা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তার মধ্যে তক্ষশিলা নগরীও ছিল অন্যতম জনপদ। কাম্বোজ ছিল একেবারেই লাগোয়া জনপদ। পাণ্ডব-বংশধর পারীক্ষিত জনমেজয়, তক্ষশিলা-আসন্দীবন্তী নগরীতে তাঁর ভদ্রাসন স্থাপন করেছিলেন— মহাভারতে তার প্রমাণ আছে এবং ওই যে পুক্কুসাতির কথা বললাম, তিনি বিম্বিসারের সমসাময়িক হলেও 'পাণ্ডব' নামে কোনও পাণ্ডব-ধুরন্ধর তখনও পাঞ্জাব-কাশ্মীর অঞ্চলে শক্তিমান ছিলেন এবং পুক্কুসাতি সেই পাণ্ডবের কাছে যে নিজের রাজ্যেই পরাভূত হয়েছিলেন— সে কথা বলেছেন টলেমি। হয়তো তখনও রাজা জনমেজয়ের বংশবীজ কিছু ছিল পাঞ্জাব-কাশ্মীরের ভূখণ্ডে, কিন্তু সে-সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষেই পারস্য নৃপতি দারায়ুসের উত্থান ঘটে গান্ধারে এবং তাঁর বহিস্তান শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর আগেও গান্ধার ভারতবর্ষীয় আর্যগোষ্ঠীর অধিকার অতিক্রম করেছিল।

গান্ধারের কথা এইজন্য বেশি করে বললাম যাতে ইতিহাসের প্রমাণটা বোঝা যায়। যাতে বোঝা যায়— মহাভারতে কলিকালের নৃপতি বলতে যাঁদের বোঝানো হয়েছে, তাঁরা কেউ ইতিহাস-বহির্ভূত নন। উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথের আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির নাম করে মহাভারত বলেছে— এই সমস্ত পাপী লোকেরাই— সত্যযুগে যাদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না— তারাই কলিযুগে চড়ে বেড়াবে পৃথিবীর সব জায়গায়— এতে পাপকৃতস্তাত চরন্তি পৃথিবীমিমাম্। লক্ষণীয় ব্যাপার হল— মহাভারতের কবি শাসক-দলের কথায় আন্ধ্র-পুলিন্দ, গান্ধার-কাম্বোজীয়দের শাসক হিসেবে উত্থানের কথা বললেও শূদ্রদের রাজকীয় শাসন এবং প্রতিপত্তির কথা তেমন করে বলেননি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-- এই বর্ণ-ব্যবস্থায় একটা প্রতিকূল বিপরিবর্তনের কথা মহাভারতের কলিধর্মে বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু শূদ্ররা রাজ্যশাসন করছেন, এ-কথা স্পষ্ট করে বলছে না মহাভারত।

ভাষায় এই ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝি— মহাভারতের অন্তর্গত কলিধর্ম যখন লেখা হয়েছে, তখনও হয়তো ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে কোনও শূদ্র রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়নি, তখনও হয়তো বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজবংশের তেমন অবলুপ্তি ঘটেনি, শুধু ভারতবর্ষের প্রত্যন্তপ্রদেশে তথাকথিত অনার্য জনজাতির প্রভাব বাড়ছিল। কিন্তু মহাভারতের এই জায়গা থেকে বায়ুপুরাণের কালিক অবস্থানে নেমে আসুন, দেখবেন, অসাধারণ একটি ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। বলা হচ্ছে— কলিকালে শূদ্ররাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজা হবে— রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবর্তকাঃ অর্থাৎ কলিকালে শূদ্র রাজাদের রমরমা বাড়বে, তাই শুধু নয়, তাঁরা পাষণ্ড-মতের সমর্থক হবেন।

ঐতিহ্যধারী ব্রাহ্মণতন্ত্র, বৌদ্ধ-জৈনদের ধর্মমতকে চিরকাল পাষণ্ডদের মত বলে চিহ্নিত করেছে। বহু জায়গায় বৌদ্ধদের কথা বলতে গিয়ে 'পাষণ্ড' অথবা 'পাষণ্ডী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এবং দর্শনগ্রন্থে। পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিকদের সমস্ত প্রমাণ একত্র করলে দেখা যাবে যে, নৃপতি বিম্বিসার যদিও শৈশুনাগ বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা, তবুও তিনি যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা মনে হয় না। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি পিতা কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপাধির প্রসঙ্গে তাঁর জাতি প্রমাণ হয়। তিনি নিজেকে শ্রেণিক (বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে 'সেনীয়'=শ্রেণিক) বলে পরিচয় দিয়েছেন বলে আমাদের ধারণা, তিনি বৈশ্যজাতীয় ছিলেন। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের রাজপরম্পরা সেই আমলেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাতেও বোধহয় কিছু আসত-যেত না, কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক ছিলেন বলেই পৌরাণিকেরা যেমন বিম্বিসারকে কলিযুগীয় নৃপতিদের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন, তেমনই বিম্বিসার থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে মহারাজ অশোকও বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজপোষণ অবাধে উন্মুক্ত করায় পুরাণ সামগ্রিকভাবে বলেছে, কলিকালের রাজারা পাষণ্ডমতের (বৌদ্ধমতের) প্রবর্তক হবেন— পাষণ্ডানাং প্রবর্তকাঃ।

বিম্বিসারের পর শৈশুনাগ বংশের শাসন আরও কিছুদিন চলেছিল বটে, কিন্তু সে-বংশ মহাপদ্ম নন্দের আমলে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পৌরাণিকেরা শৈশুনাগ বংশের রাজাদের 'ক্ষত্রবন্ধু' বলেছেন। ক্ষত্রবন্ধু মানে ক্ষত্রিয়ের জন্মটুকু আছে, আচার নেই। এদেরই শেষ বংশধরের শূদ্রা স্ত্রী যিনি ছিলেন, গ্রিক ঐতিহাসিক কার্টিয়াস বলেছেন— সেই রানির সঙ্গে প্রণয় হয় এক নাপিতের

এবং সেই নাপিতের ঔরসে রানির গর্ভে জন্মান মহাপদ্ম নন্দ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারক-বাহক পুরাণগুলি মহাপদ্ম নন্দের মতো শূদ্র নাপিতের উত্থানে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তার ফলে সমস্ত কলিকালের হলাহল নিক্ষেপ করেছেন নন্দ-রাজার ওপরে। তাঁরা বলেছেন— শূদ্রার গর্ভজাত মহাপদ্ম এর পরে রাজা হবেন এবং তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ উচ্ছেদ করে দেবেন ক্ষত্রান্তক পরশুরামের মতো। তিনি অতি লোভী রাজা— শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো' অতিলুব্ধো মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরো' অখিল-ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা।

এই যে নন্দরাজবংশ শুরু হল, এই সময় থেকেই শূদ্ররা সব রাজা হবেন, যত দিন না ব্রাহ্মণ কৌটিল্য এসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও যে খুব একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন তা নয়, কিন্তু তবু ব্রাহ্মণ কৌটিল্য যেহেতু রাজকর্তা হিসেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন জারি করেছিলেন, তাই তাঁর ওপরে কিছু দুর্বলতা আছে পৌরাণিকদের। বিশেষ দু-একটি পুরাণ শূদ্র নন্দরাজবংশের সমসাময়িক অন্ধ্র, পুলিন্দ, যবন, শকদের রাজবংশের বর্ণনা করে সক্ষোভে বলেছেন— এই চলবে কলিকালে। এই সব ব্রাত্য শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবনেরাই পৃথিবীর শাসক হবে এই সময়ে— এতে চ তুল্যকালাঃ সর্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি।

পুরাণকারেরা এবং মহাভারত যেভাবে কলিকালের রাজকুল এবং কলিধর্মের বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মোটামুটি পরীক্ষিৎ-জনমেজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং পশ্চিম-উত্তরে তথাকথিত অনার্য জনজাতির প্রত্যুত্থান এবং তার পরে নন্দরাজবংশের রাজত্বকালে উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডে শূদ্র নবপতিদের সার্বভৌম শক্তিই কলিকালের প্রথম সূচক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষত রাজশক্তি, শূদ্র রাজাদের করতলগত হওয়ায় সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থার বিপুল ব্যতিক্রম এবং মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। রাজশক্তি শূদ্রের হাতে থাকায় সমাজে শূদ্র জনজাতিরও প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি বাড়ছিল। শূদ্রদের এই প্রতিপত্তি কতটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, সে-কথা মহাভারতে এবং পুরাণের ক্রমিক কলিধর্ম-বিচারেও প্রমাণিত হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের অন্ত্যবর্ণের মানসিকতা কীভাবে পালটে যায়, মহাভারত তার সূত্র মাত্র করেছে— কিন্তু শূদ্র জনজাতির কেউ তখনও বোধহয় রাজা হিসেবে আসেননি।

মহাভারতে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এটুকু বোঝা যায় যে, শূদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকের হাতেই টাকা-পয়সা আসছিল। ইতঃপূর্বে যাঁদের তিন বর্ণের সেবায়

দিন কাটাতে হয়েছে, 'দাস' শব্দটি যাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত ছিল, তাঁরা অনেকেই বৈশ্য-বণিকের কর্ম গ্রহণ করায় তাঁদের হাতে টাকা আসছিল। মহাভারত বলেছে— ব্রাহ্মণরা সব শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করবে কলিকালে আর শূদ্রেরা সব টাকা উপায় করবে— ব্রাহ্মণা শূদ্রকর্মানস্তথা শূদ্রা ধনার্জকাঃ। আমাদের ধারণা— এর থেকেও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক আছে মহাভারতে এবং সেই শ্লোকটি, সব সংস্করণে দেখিনি, তবে পুণা থেকে বেরোনো 'ক্রিটিকাল এডিশনে' এই শ্লোক থাকায় সমাজের ভাঙন বোঝাতে এই শ্লোকের গুরুত্ব বাড়ে।

বস্তুত ব্রাহ্মণতন্ত্রে এতকাল যে-রাজারা পুষ্ট হতেন, তাঁরা সেকালের সমাজের বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাটা অটুট রাখার চেষ্টা করতেন। স্বয়ং মনু, ক্ষত্রিয় রাজাকে বর্ণ এবং আশ্রমধর্মের শৃঙ্খলার প্রতিভূ হিসেবে দেখেছেন— বর্ণানাম্ আশ্রমানাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতাপ এবং তথাকথিত সার্বভৌম ভাবনা ভেঙে যেতেই সমাজের বর্ণব্যবস্থারও বিপর্যয় ঘটেছে। মনু যাকে বলেছিলেন— প্রবর্তেত অধরোত্তরম্— অর্থাৎ নীচের লোকেরা ওপরে উঠবে, ওপরের লোকেরা নীচে যাবে, মহাভারতের ওই শ্লোকে সেটাই আরও স্পষ্ট হয়ে এ রকম দাঁড়িয়েছে— অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্তাবসায়িনঃ। অর্থাৎ যাঁরা একেবারে নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন, তাঁরা মধ্য অবস্থায় এলেন আর যাঁরা মধ্য অবস্থায় ছিলেন তাঁরা অন্ত্যবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, সমাজের অন্ত্য অথবা শেষ বর্ণ শূদ্রেরা বৈশ্যের কাজকর্ম আরম্ভ করলেন আর বৈশ্যেরা শূদ্রের কাজকর্ম ধরে নিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে এই বিপর্যয়টা আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বৈশ্যরা কৃষি-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে 'আর্টিজ্যান' শূদ্রদের শিল্পকর্মের দিকে ঝুঁকছিল— শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্মোপজীবিনঃ। ঘটনা হচ্ছে— আর্য রাষ্ট্রগুলির একতা ভেঙে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য করার চাইতে আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করার দিকে নজর পড়ছিল বেশি। তাই কারুকর্ম বা শিল্পকর্ম নয়, বৈশ্যরা প্রধানত স্ব-স্ব-রাষ্ট্রে, হীন ব্যবসাগুলিও আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কেননা তাঁরা পয়সা বোঝেন, নিজের ঘরে পয়সা পেলে পররাষ্ট্রে দৌড়বেন কেন! স্কন্দপুরাণের কলিধর্মে বলা হচ্ছে— বৈশ্যরা তাঁদের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে— তেলের ঘানি করবে আর ধান-মাড়াই করবে। 'তৈলকার' অথবা 'তণ্ডুলকার'— এগুলি বড় ব্যবসা নয় বটে এবং সমাজে তা ঘৃণাও ছিল খানিকটা। কিন্তু অন্ত্য চাষিদের কাছ থেকে তিল অথবা সরষে একত্রে কিনে নিয়ে এবং

অবশ্যই পাকা ধান এক লপ্তে কিনে নিয়ে সেগুলিকে 'প্রসেসিং' করাটা পুরাতন বণিকেরা মর্যাদা দিতেন না বলেই এই নতুন ভাবনা কিন্তু কলিযুগের বিপর্যয়ের মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু রাজশক্তির ডিজ-ইনটিগ্রেশন-এর সঙ্গে-সঙ্গে এই ধরনের আঞ্চলিক ভিত্তিতে ব্যবসা করাটা যে বৈশ্যজাতির পবিবর্তনশীল মানসের পরিচয় দেয়, সে কথা পৌরাণিকেরা তেমন অনুধাবন করেননি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূদ্রদের রাজবংশের পরম্পরা নেমে আসলে চরম অবস্থা হয় ব্রাহ্মণদের। এতদিন যাঁরা রাজার কাছে সম্মান পেয়ে এসেছেন, যাগ-যজ্ঞ, শ্রৌত-বৈতানিক কর্মে যাঁদের সম্মান এবং দক্ষিণা বাঁধা ছিল, সমাজে বর্ণ-ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাবার ফলে তাঁদের মধ্যে তো পরিবর্তন আসবেই। বিশেষত নিম্নতব বর্ণের হাতে তখন টাকা-পয়সা আসছে। এই মুহূর্তে বিভূতিভূষণের ইছামতী উপন্যাসে নালু পালের চরিত্র এবং তাঁর ব্যবহাব-বিবরণ স্মরণ করলেই পৌবাণিকদের কলিযুগীয় দুর্ভাবনাটুকু বুঝতে পারবেন। কথা হচ্ছে— নালু পাল যেভাবে সমাজে আপন ধনসম্পত্তিব জোরে জায়গা করে নিচ্ছে, তাব প্রক্রিয়াটা সেইকালেই শুরু হয়েছে। মহাভারত এই প্রক্রিয়াব সূচনা করে বলেছে— কলিযুগে ধন-সম্পত্তির মালিক শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে তাচ্ছিল্যের সম্বোধনে ডেকে বলবে— আরে, আমি এসে গেছি, এই যে বামুন, দুটো কথা আছে তোমার সঙ্গে। প্রত্যুত্তরে বামুন বলবে— বলুন বাবু! কী কথা— ভোবাদিনস্তথা শূদ্রা ব্রাহ্মণাশ্চার্যবাদিনঃ।

পুরাণগুলিব মধ্যে বায়ুপুরাণও সূত্রাকারে মহাভারতের শব্দ পুনরাবৃত্তি করে বলেছে যে, ব্রাহ্মণেরা, যিনি যে-অবস্থানেই থাকুন, তাঁরা সকলেই কলিকালে শূদ্রদের মর্যাদা-সম্বোধনে আহ্বান করবেন— শূদ্রাভিবাদিনঃ সর্বে যুগান্তে দ্বিজসত্তমাঃ। যদি বা এই কথাটা অতিশয়োক্তিও হয়ে থাকে, তবু শূদ্র জন-জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা যে ওঠা-বসা, মেলা-মেশা অথবা খাওয়া-দাওয়া করবেন— এ আশঙ্কায় মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ এক সুরে বলেছে— শূদ্রানামন্ত্যযোনেস্তু সম্বন্ধা ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ভবন্তীহ কলৌ তস্মিন্ শয়নাসনভোজনৈঃ।। শূদ্রবর্ণের আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়ল এমনটি হওয়ারই কথা, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু নন্দাদি তথাকথিত শূদ্রেরা রাজপদে অধিষ্ঠিত হলে কী হওয়া সম্ভব, তার একটা সার্থক চিত্র আছে কূর্মপুরাণে এবং তা থেকে বোঝা যায় কূর্মপুরাণের কথক-ঠাকুর শূদ্র রাজাদের অধিষ্ঠান-সময়টাকেই কলিকাল বলে বুঝেছেন।

ব্রাহ্মণেরা ততদিনে বেদ পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করার সহজ পন্থা পেয়ে গেছেন অথবা তীর্থক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে পাণ্ডার কাজ করতে আরম্ভ করেছেন— বেদবিক্রয়িণশ্চান্যে তীর্থবিক্রয়িণঃ পরে— এটা হয়তো আরও কিছু পরবর্তী সময়ের ব্রাহ্মণ্য সংকট, কিন্তু শূদ্র রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণদের অবস্থাটা কী, তার সার্থক কলিচিত্র দিয়েছে কূর্মপুরাণ। এই পুরাণ বলেছে— এই কালে অল্পবুদ্ধি সাধারণ লোকেরা যদি ব্রাহ্মণদের উৎকৃষ্ট আসনে বসে গম্ভীর চালে ধর্মোপদেশকের ভূমিকায় দেখত, তবে তারা কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তি ছুড়ে দিত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে— আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা চালয়ন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ। যে-সব শূদ্রেরা রাজার ঘরে কাজ করে তারা রাজশক্তিতে বলবান হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেরও তাড়না করতে ছাড়ে না। এই কলিকালে বিভিন্ন উচ্চাসনে বসবেন শূদ্ররাই এবং ব্রাহ্মণেরা সেখানে চারপাশে সাধারণ আসনে বসে থাকবেন— উচ্চাসনস্থাঃ শূদ্রাশ্চ কলৌ কালবলেন তু। আর এরকম হবেন নাই বা কেন— কূর্মপুরাণ কারণ দেখিয়েই মন্তব্য করছে— কালের গতি এমনই যে, কলিকালে রাজাও তো ব্রাহ্মণদ্বেষী শূদ্র।

অনেকেই মনে করেন— পুরাণগুলির এত সব কলিধর্মবর্ণনা অনেক পরে লেখা হয়েছে, তাই এগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে না দেখাই ভাল। আমরা বলব— পুরাণগুলিও তো সব এককালে লেখা হয়নি, বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে। ফলে পুরাণগুলির সময়ের হিসেব পাওয়া গেলে বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত কলিধর্ম বর্ণনা থেকে সমাজের সার্থক শূদ্রায়ণ এবং ব্রাহ্মণ্যের অবনতি ক্রমিকভাবে ধরা যায়। কূর্মপুরাণের বর্ণনা থেকে বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়— শূদ্রদের ওপরে যে-বাচিক, বৈষয়িক এবং সামাজিক তাড়ন-পীড়ন ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে ঘটত, ব্রাহ্মণরা যেন ঠিক তার উলটো প্রতিক্রিয়াগুলি বর্ণনা করেই তাঁদের কলিধর্মের ব্যবহারগুলি বিবৃত করেছেন। কিন্তু সত্যদৃষ্টি অথবা কবির ক্রান্তদর্শিতা দিয়েই যে পৌরাণিক এমন কলিধর্মের ভবিষ্যৎ বিবরণ লিখেছেন, তা মনে হয় না। তাঁরা যদি সমাজে এই বিপ্রতীপ চিত্র এতটুকুও না দেখে থাকেন, তবে শূদ্রায়ণের 'ব্যুমেরাং'টা এমন সার্থকভাবে দেখানো সম্ভবই হত না। কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত সগন্ধ স্বজাতির এমন অধঃপতন বাস্তব দৃষ্টি ছাড়া লিখতে পারে?

ব্রাহ্মণদের স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন এবং মর্যাদা আস্তে-আস্তে যে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, বহু জায়গা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, কিন্তু রাজশক্তির পরিবর্তনে তাঁদের

মধ্যে যে-স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার চিত্রায়ণটি অসাধারণ ওই ভাবী কলিযুগের বর্ণনায়। বলা হচ্ছে— যাদের বেদবিদ্যার জোর তেমন নেই, এমন হৃতভাগ্য অস্বশ্রুত ব্রাহ্মণেরা তখন ফুল-মালা, বসন-ভূষণ, আরও নানাবিধ মঙ্গলদ্রব্যে শূদ্রদের পরিচর্যা করবে। এর পরেই সেই দারুণ পঙ্ক্তিটি— পুরাতন দুর্ব্যবহার কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দেবার প্রসঙ্গ। পুরাণ বলছে— এত ফুল-চন্দন-মাঙ্গলিকে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের আরাধনা করলেও রাজবৎ সমাগত শূদ্র সেই ব্রাহ্মণদের দিকে ফিরেও তাকাবে না— ন প্রেক্ষন্তে অর্চিতাশ্চাপি শূদ্রা দ্বিজবরান্ নৃপ। তবুও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকুলের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁদের সেবা করার সুযোগ খোঁজেন। শূদ্র অভিজাত পুরুষকে গজ-বাজীর বাহনে যেতে দেখলে ঘিরে ধরেন ব্রাহ্মণেরা, তাঁর কাছে স্তুতি-নতি প্রকাশ করেন— বাহনস্থান্ সমাবৃত্য শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ।

আসলে এই বিপরীত ব্যবহার খুব অচেনা হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যায়— যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অথবা দান-প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের আর বৃত্তিলাভ সম্পন্ন হচ্ছিল না, এবং শুধু মগধ নয়, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রেই ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ক্ষত্রিয়েতর রাজগোষ্ঠী প্রতিস্থাপিত হওয়ায় তাঁদের জীবনে দুর্দশা নেমে এসেছিলই। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মে ধর্মান্তরিত নিম্নতর জাতির আত্মলাভও প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যের সুব্যবস্থার অবনতি ডেকে এনেছে এবং এই অবনতিই কলিকাল বলে চিহ্নিত হয়েছে পুরাণে-পুরাণে। পুরাণকারেরা একটা কথা বার-বার বলেছেন যে, বেশ খানিকটা ধনৈশ্বর্য এবং বড় খানিকটা জমি পেলেই সেটা আভিজাত্যের হেতু হয়ে ওঠে কলিকালে। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে— আলেকজান্ডারের আক্রমণকালের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমল বাদ দিলে গুপ্তরাজাদের রাজনৈতিক সমৃদ্ধির সময়টুকু কোনও ভাবে ধরা যাবে রাজনৈতিক একতার চিহ্ন হিসেবে। তা নইলে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং সামন্ত রাজাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আধিপত্য— সেকালের পরিচিত চেহারা।

এই রাজনৈতিক অবস্থানের নিরিখে যদি সমাজের বিচার করা যায়, তাহলে দেখব, সমাজেও তখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের খানিকটা শিথিলতা এসেছে। বর্ণব্যবস্থায় বর্ণসংকর তো ঘটছিলই, অন্যদিকে রাস্তাঘাটের উন্নতি এবং টাকা-কড়ির লেনদেন ভালোভাবে শুরু হওয়ায় নগরায়ণের পথ প্রশস্ত হচ্ছিল।

পৌরাণিকেরা কলিধর্মের বর্ণনায় আরও যে-সব বর্ণনা দিয়েছেন তা বিচার করলে দেখা যাবে সমাজে এমন এক ধরনের আধুনিকতার আবরণ তৈরি হচ্ছিল, যা প্রাচীন ধারণার বাহক এবং ধারক পৌরাণিকদের ভাল লাগেনি। সেই দুর্ভাবনার সব কিছু যে খুব সদর্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা নয়। তবে আমার অন্তত বেশ মনে হয়— সে-সব ঘটনা পৌরাণিকদের নিজের আমলেই ঘটছিল এবং সেগুলি তাঁরা খুব ভাল চোখে দেখছেন না বলেই কলিধর্মের আরোপ এসেছে সেখানে। তবু বলতে হবে— কোনও সমাজেই শিথিলতা একদিনে আসে না, সমাজ আপন প্রক্রিয়াতেই সে-শিথিলতা তৈরি করে এবং সে-শিথিলতা যদি তৎকালের নায়ক-নেতাদের পছন্দ না হয় তবে তারই মধ্যে নতুন প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়, সমাজ তাতে আবার নতুন বাঁধনে বাঁধা পড়ে। আবারও আসে উদারীকরণ, পুনরায় আবার বন্ধন— এইভাবেই সমাজ চলে। কিন্তু আমি যা দেখেছি, সেই বৈদিক সমাজ থেকে শুরু করে মহাভারতের সমাজ পর্যন্তও যে-উদারতা ছিল, সেই উদারতা শিথিল হতে থাকে শ্রৌত-স্মার্ত-গৃহ্য নিয়মের সংকীর্ণতায়। কিন্তু নন্দ রাজাদের আমলে শূদ্ররাজ সৃষ্টি হবার পর গুপ্ত রাজাদের শাসন পর্যন্ত যে-অন্তর্বর্তী সময় চলেছে তার যেমন ছায়া পড়েছে মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণগুলির বর্ণনায়, তেমনই পরবর্তী ৯ম, ১০ম কিংবা ১১শ খ্রিস্টাব্দে রচিত পুরাণগুলির কলিধর্ম বর্ণনায় কলিকালের চেহারা সেই পুরাণের সময় অনুসারেই লিখিত। এর পরে আমরা আর কঠিন কোনও আলোচনায় যাব না, শুধু পুরাণগুলিতে বর্ণিত কলিধর্মের নিরিখে দেখব যে, কলিকালের ধর্মশিথিল প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে।

চার

পরাশর উবাচ— কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশম বর্ষের পুরুষের সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তমবর্ষীয়া বালিকারা সন্তানবতী হইবে। কথাটা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি কথা। কেন না প্রথম শ্রেণিতে পড়া একটি মেয়ের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া একটি ছেলের বিবাহ-ঘটনায় পরাশর যে-সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন অলৌকিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মহাভারত বয়সটা একটু বাড়িয়ে সাত-আট বছরের মেয়েদের সঙ্গে দশ-বারো বছরের পুরুষের সংযোগ ঘটিয়ে বদান্যতা দেখালেও টীকাকার নীলকণ্ঠ মূল কথাটি বলে দিয়েছেন— ইঙ্গিতজ্ঞ

পণ্ডিতের মতো। তিনি বলেছেন— কলিকালের দিন যত পরিণত হবে, স্ত্রী-পুরুষ তত বেশি জৈব কামনায় দাস হয়ে উঠবে— অতিকামাতুরা ইত্যর্থঃ। আসলে সমাজের ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থি যত শিথিল হবে, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাও তত বাড়বে আর এই বাড়াবাড়িটা পৌরাণিক সংযমীর পছন্দ হয়নি ইত্যর্থঃ।

উল্লিখিত শ্লোকটি দেখে অনেকেই হয়তো মনে করবেন— ঋষিরা এইরকমই উল্টো কথা বলেছেন বেশি। কিন্তু সত্যি বলব কী, অনেক কথা তাঁদের খেটেও গেছে। যেগুলো খেটেছে, সেগুলো বেশিরভাগই অবশ্য নদী-নালা কিংবা জীবজন্তু বিষয়ক। নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়া, কিংবা গোরুর পক্ষে ছাগলের মতো দুধ দেওয়া, প্রজানুরঞ্জনের নামে তথাকথিত রাজাদের প্রজাশোষণ, কিংবা সাধু-সন্তের ভণ্ডামি— এগুলোর মধ্যে কালের প্রভাব পড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নদী আর গোরুর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে আমরা যদি মনে করি মানুষের ক্ষেত্রেও সব মিলে গেছে, তা হলে বিপদ বাড়বে।

পরাশরের মতো এত নিষ্ঠুর বাল্যমিলনে বিশ্বাসী না হলেও মনু মহারাজ তাঁর পুরুষতান্ত্রিকতায় চব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছেন, অভিজাত পাত্র পেলে ছ-বছরের মেয়েকেও বিয়ে দেওয়া যায়। আমাদের তো তা হলে বলতে হয়— মনু মহারাজই কলিধর্ম কার্যে পরিণত করেছেন, কারণ কলিকালেই এই রকম অকাল-গর্ভধরা রমণীর সন্ধান পাওয়া যাবে বলে পুরাণ-মহাভারত জানিয়েছে। কিন্তু বেদ-ব্রাহ্মণ্যের যখন সোনার দিন ছিল, তখন কিন্তু এমন দুর্বিষহ ভাবনা চালু ছিল না। প্রেমে পড়ে বা না পড়ে একশো বছর যার সঙ্গে কাল কাটানোর বাসনা— জীবেমঃ শরদঃ শতম্, পশ্যেমঃ শরদঃ শতম্— তাঁর চেহারাটি বেশ উচ্চাবচ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা। শতপথ ব্রাহ্মণ তো কোনও ইতস্তত না করে সোজাসুজি বলেছে— মেয়েদের পক্ষে সব চেয়ে প্রশংসনীয় চেহারা হল— পৃথুশ্রোণী, ক্ষীণমধ্যা এবং পীনোন্নত পয়োধরা।

এই চেহারা আমাদের কলিযুগের লোকেদের চেনা, বরঞ্চ সপ্তম-অষ্টম অথবা নবম-দশম বর্ষের যে মুকুলিকা বালিকার বৈবাহিক সম্বন্ধ— যা কলিযুগের অভিশাপ অথচ বিধানদাতা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যদের অভিমত বিবাহ, তাতে মনে হয়, খ্রিস্টীয় ২/৩ শতক থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্যন্তই কলিকাল চলেছে, আমরা পুনরায় অন্তত ত্রেতাযুগে ঢুকে পড়েছি, কেননা ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিক্রিয়ার চরম সময়েই নিশ্চয়ই শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রশান্ততরা

রমণীর বৈবাহিক রূপ কল্পনা করেছে আমাদেরই মতো উচ্চাবচ দৃষ্টিতে। তবে কিনা, বলতে পারেন,— রমণীর শরীরের প্রত্যঙ্গ-বন্ধুর এই বিবরণ নিয়ে শতপথ ব্রাহ্মণ আর কলির জীবের বিসংবাদ না থাকলেও বিসংবাদ কি স্ত্রীলোকের আচরণ নিয়েই আছে? কলিধর্মের ঋষি বলেছিলেন— কলিকালে স্ত্রীলোকমাত্রেই সাধারণত স্বেচ্ছাচারিণী হবে, ধর্মের নিয়মে তাদের বিবাহ হবে না এবং দাম্পত্য সম্বন্ধও হবে বিপরীত। স্বেচ্ছাচারিণী মানে নিশ্চয়ই মেয়েরা নিজের ইচ্ছেমতো চলবে। ধর্মের নিয়মে বিবাহ হবে না— মানে, নিশ্চয়ই সেই অসবর্ণ বিবাহ এবং বিপরীত দাম্পত্য— মানে, নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের পৌরুষেয় আচরণ অথবা পুরুষের মাথায় চড়ে বসা।

কলিকালের এই অসবর্ণ তথা অসামাজিক বিয়ে নিয়ে বেশি কথা কী বলব— এর ঐতিহ্য এত পুরনো এবং উদাহরণ এতই বেশি যে, ঋষিরা যাঁরা কলিধর্ম নিরূপণ করেছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটু আত্মস্থ হলেই আমাদের এই কলি-কলুষ দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনই থাকবে না। স্বেচ্ছাচারিতা এবং তাও আবার মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলেই অসামাজিক অসবর্ণ বিয়ে হয়— এ ধারণাটাও তো নিতান্তই একপেশে। এমনকী ভগবদ্গীতায় কৃপাবিষ্ট অর্জুন পর্যন্ত একই ধারণার কথা বলেছেন— স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ— অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি দুষ্টু হয়ে ওঠে তবে সমাজে বর্ণসংকর সৃষ্টি হবে। আমরা বুঝি— মেয়েদের মধ্যে যাঁরা একটু স্বাধীনচেতা এবং যাঁরা কিঞ্চিৎ মধুর হাসে মধুর বাসে সরসতা বিতরণ করেন, পৌরাণিকের কলিকালের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁদেরই ওপর গিয়ে চেপেছে। কিন্তু আমাদের ব্যাসপিতা পরাশর মুনি কি দ্বাপর যুগের মানুষ ছিলেন, নাকি কলিকালের? যে-কালেই হোক সেই প্রাচীনকালে যমুনা পার হবার সময় নৌকার ওপর সত্যবতীর অতুল রূপ দেখে তাঁর যে-অবস্থা হয়েছিল, মহাভারত তার বর্ণনা দিতে গিয়ে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে, তার অর্থ করলে সোজাসুজি বোঝা যাবে, পরাশর মুনির মাথা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। আমার ভয় হয়— আজকের এই নরম কলিতে মহর্ষিকে যদি যমুনার বদলে গড়িয়াহাটের মোড় পার হতে হত, তা হলে আধুনিক সাজে সজ্জিতা কোনও পৌর-নাগরিকার অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তিনি খড়ম পিছলে পড়ে যেতেন, দ্বিতীয় দফায় বিষ্ণুপুরাণের 'কলিধর্মনিরূপণ' অধ্যায়টি ছিঁড়ে নিয়ে সেই ললনার পায়ে তিলাঞ্জলি রচনা করে কালিদাসের শিবের মতো বলতেন— অদ্য প্রভৃত্যোবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ।

অবশ্য আধুনিক স্বেচ্ছাচারিণীরা মহর্ষিকে কতদূর সহ্য করতেন, তাই নিয়ে একটা সন্দেহ করা চলে, কারণ এঁরা তো তপস্যার প্রভাব জানেন না, আর অভিশাপের ভয়ও তেমন নেই। মহাভারতে দেখছি— সত্যবতী নাকি মুনির বাচিক তাড়নায় পিতার অনুমতি পর্যন্ত নেবার সময় পাননি। শেষপর্যন্ত মৎস্য-গন্ধের খোলস ছেড়ে যোজনগন্ধা সত্যবতী মুনির প্রভাবে তাৎক্ষণিক গর্ভমোচন করে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু আমাদের সর্বকালের অভিভাবক মনু-মহারাজ পড়লেন মহাফাঁপরে। তিনি বলেছিলেন— যে-ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধর-রস পান করিয়াছে এবং শয্যায় তাহার নিঃশ্বাস গায়ে লইয়াছে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, তাহার ওই কর্মের নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান নাই : অর্থাৎ সারা জীবনের মতো তিনি শেষ— মিটে গেল এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম-তৃষা।

মনু অবশ্য মুনি-ঋষিদের চিরতৃষ্ণার্ত অবস্থা বুঝে সমগ্র ব্রাহ্মণ-জাতিকেই কিছু সুবিধে দিয়েছেন এবং সেটা বেশ একটা ফিকির অথবা কৌশলই বলা চলে। মনু বলেছেন যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে একটি সবর্ণা ব্রাহ্মণী বিয়ে করে নেবেন, পরে কামবশত যদি আবারও বিয়ে করার ইচ্ছে হয়, তবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— সব মেয়েই চলবে। মহাভারতের কবি এ-কথা স্পষ্ট করে বলেননি একবারও যে, পিতা পরাশর পূর্বে কোনও ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কল্লস্বনা যমুনার ওপর কুজ্ঝটিকার মধ্যে নৌকাবিলাসের সময় মৎস্যগন্ধার আতপ্ত নিঃশ্বাস যদি মহর্ষির গায়ে লেগে থাকে, তবু সেটা আমাদের কাছে বড় ভাগ্য, বড় অভ্যুদয়— কেন না মহাভারতের কবি জন্মেছেন। জিজ্ঞাসা হয়— ব্যাস কী কলিকালের গন্ধ গায়ে মেখেই জন্মেছিলেন।

যে-ঘটনা সেদিন ঘটেছিল, সে কি স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতায় ঘটেছিল, নাকি পরাশর মুনির মতো স্বেচ্ছাচারী স্বচ্ছন্দবিহারী পুরুষের পৌরুষেয়তায়? ভাগবত পুরাণ আমাদের মতো কলির জীবদের সচকিত করে বলেছে— ঈশ্বরস্বভাব তেজস্বী পুরুষের কাছে কোনও কিছুই দোষের নয়, আগুনের মতো তাঁরা সমস্ত দোষ ভস্মসাৎ এবং আত্মসাৎ করতে পারেন— তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা। ভাগবত সাবধান করে দিয়ে বলেছে— তাই বলে যেন সাধারণ মানুষ, তুমি-আমি এ-সব করতে না যাই : যদি করি, তা হলে শিব ছাড়া অন্য মানুষ বিষ খেলে যে-গতি হবে, সাধারণেও সেই অবস্থা হবে। জীবন তবু বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছাচারে

বিপন্ন হয়, কিন্তু তেজস্বী পরাশর, জেলের মেয়ে সত্যবতীর জালে ধরা পড়েন, আর তৎপুত্র ব্যাস নিয়োগের প্রযুক্তিতে রাজরানি অম্বিকা, অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর জন্ম দিলেন— এটাও তেজস্বী মানুষের কথা। তা হলে কলির ধর্মে বৈবাহিক অথবা দাম্পত্য ব্যবহারে আমরা কী করি!

স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্নে কলিকালের রমণীর কথা এসেছে, কিন্তু সেও তো বুঝি পুরুষেরই চিরায়ত, এখনও, তখনও। পরাশর মুনি বিষ্ণুপুরাণে নিজের দৃষ্টান্তে পুরুষদের ক্ষমা করে দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার সমস্ত দায় চাপিয়ে গেছেন কলিযুগের মেয়েদের ওপর। কিন্তু সরল সাদাসিধে বৈদিক ঋষিরা, যারা পরাশর-মনু— এঁদেরও অনেক আগের যুগের লোক তারা নির্মল হাস্যে, মেয়েদের মৃদুল-গমনের ছন্দটি মরমি মানুষের মতো ধরে রেখেছেন বৈদিক ছন্দে। 'যুবতী মেয়ের পেছন পেছন যেমন যুবকেরা ঘোরাফেরা করে'— এই ধরনের উপমা যে ঋগ্‌বেদে কত বার আছে, তার ঠিক নেই। এতে সেই যুবতীদের ওপর স্বেচ্ছাচারিতার দায় আসে কি না জানি না, তবে এতগুলি যুবকের পশ্চাৎ-পদচারণার ফলে সেই রমণীদের মনে কোনও আকুল আত্মতৃপ্তিও কি হত না? এখনকার কলিকালের মতোই? যে-সমাজের যুবকদের মনে এত গান, সেখানে যুবতীদের মনেও কি গুনগুন ছিল না কোনও— সমান্তরাল? দশাঙ্গুলির নিষ্পেষণে সংশোধিত হচ্ছে সোমরস— সেখানে উপমাটি হল— দশটি যুবতী একই সঙ্গে যেমন একটি যুবককে আহ্বান করে। বিশ্বামিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে নদীগুলি, ঠিক যেমন পুরুষদের দিকে ধাবিত হয় রমণী আসঙ্গলিপ্সায়।

এই যে সব ঋক্‌-মন্ত্র, যেখানে যজ্ঞীয় সোমরস নিষ্পেষণে রমণী-শরীরের উপমা, নদীর স্রোতোগতির মধ্যে যেখানে রমণীয় অভিসারের কথা— এগুলোকে কি স্বেচ্ছাচারিতা বলব, না কি দুই হাতে তালির সেই বিখ্যাত প্রবাদ— যা বড় স্বাভাবিক, এ-কালেও ও-কালেও। আর একটি শব্দ আছে 'সমন'। শব্দটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর বিবাদ আছে, তবু সাধারণ অর্থে এটি এক ধরনের উৎসব, যেখানে সর্বার্থে মেয়েদের আশাপূরণের ইঙ্গিত আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ পিশেলের (Pischel) মতে, সমন একটি জনপ্রিয় সার্বজনীন উৎসব, যেখানে মেয়েরা আসত মনের মানুষ খুঁজতে, যশঃপ্রার্থী কবিরা আসতেন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে প্রশংসা কুড়োতে, আর ধনুর্বিদেরা আসতেন লক্ষ্য বিদ্ধ করে পুরস্কার জিততে। এই উৎসবের মেয়াদ থাকত সারা রাত। বায়ুর গতির দ্রুততা বোঝাতে বেদের ঋষি উপমা দিয়েছেন— সমনং ন যোষাঃ— অর্থাৎ যে-গতিতে,

যে-চন্দ্রতাতায় মেয়েরা সমনে যোগ দিতে যায়। মেয়েদের এইসব তিমিরাভিসারে বৈদিক মায়েদের মদতও কম ছিল না। তাঁরা মোহন সাজে সাজিয়ে দিতেন মেয়েদের, যাতে তারা অভিজাত যুবককে আকর্ষণ করতে পারে।

বৈদিক যুগে এমন আধুনিক চর্চা দেখে তো বেশ মনে হয়, বুঝি তখনই কলিযুগের আরম্ভ হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি পুরাণই বলেছে— কলিযুগে যে-মেয়েদের সোনা-দানা-মণিরত্ন অথবা বস্ত্রালংকার নেই, সেই মেয়েও শুধু তার কেশগুচ্ছ বাহার তুলে নিজেকে অলংকৃত দেখানোর চেষ্টা করবে। কথাটা বোধহয় পুরাণের থেকেও পুরানো, কেননা মহাভারতও বলেছে— কেশশূলাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে। স্ত্রীলোকের কেশ ব্যাপারটাকে এখানে লজ্জাহীন আকর্ষণী শক্তি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ। কিন্তু পুরাণ এবং মহাভারতে এই কেশসজ্জার পারিপাট্যের মধ্যে আমরা কিছু বাস্তব ইতিহাসের গন্ধ পাই। একটা কথা খেয়াল করতে হবে— রমণীর পারিপাট্যের ঘটনাটা কলিযুগের কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য নয়, রামায়ণে রামচন্দ্রের মতো সরল ধীর-গম্ভীর নায়ককে পর্যন্ত 'কাকপক্ষ' (জুলফি) ধারণ করে ঘুরতে দেখেছি— কাকপক্ষধরো ধন্বী— সেখানে রমণীরা বিচিত্র কেশসজ্জা করবেন না, এ কেমন কথা!

সত্যি কথা সংক্ষেপে বলি— অতিপ্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে বহুতর কায়দায় রমণীরা চুলের খোপা বাঁধতেন এবং আমাদের ধারণা, আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর গ্রিকদেশীয় কেশসজ্জাও আমাদের দেশে আমদানি হয়। গান্ধার শিল্পের নরনারীমূর্তিতে যে চুলের বাহার আছে, দিনে-দিনে তা বাস্তবভাবেই রমণীর মস্তকে প্রযুক্ত হতে হতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে সে কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। আর এটাও ঠিক, যার কিছু নেই, শাড়ি-গয়না, রত্ন-অলংকার কিছুই নেই, সেই রমণী যদি চুলের কায়দা করে কিঞ্চিৎ সম্মোহন তৈরি করে, সে কি কলিকালের দোষ? কালিদাসের পার্বতী যখন— মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং— মুক্তো সিন্ধুবারে কেশকলাপ সজ্জিত করে শিবের পায়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাথা নোয়ানোর আগে তাঁর চুলে গোঁজা কর্ণিকার ফুল, আর কানের পাশে গোঁজা বৃন্তপল্লব চ্যুত হয়ে পড়েছিল শিবের পায়ে— উমাপি নীলালকমধ্যশোভি/বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্/চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন

কেশবন্ধন, কেশসজ্জা, এবং কেশ অলংকরণের বিচিত্র উপকরণ নিয়ে যে 'ইন্ডিয়ান কইফিওর'— সেটা শুধু আলেকজান্ডারের সময়ের পরের সমৃদ্ধি, তা ভাবলে ভুল হবে। মহাভারত, রামায়ণ, বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি এবং অবশ্যই অসংখ্য ভাস্কর্য এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেবে, চুলের কায়দা-কেতা এবং পারিপাট্য কলিকালের কোনও আবিষ্কার নয়, এ আমাদের বহু প্রাচীনকালের মন্ত্রণা, এই সাজ প্রায় রমণীর মনের সমবয়সি। কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামাকে মনে আছে তো। তিনি অতিশয় মানিনী ছিলেন। দেবর্ষি নারদ একবার নন্দনের মন্দারমঞ্জরী পারিজাতের একটি গুচ্ছ এনে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের পত্নীজ্যেষ্ঠা রুক্মিণীর হাতে। এই পুষ্পস্তবক কৃষ্ণের জীবনে এমনই বিপন্নতা ডেকে এনেছিল, যা বলবার মতো নয়। সত্যভামা এ পারিজাতগুচ্ছের জন্য প্রায় মরণপণ করেছিলেন। তবে সেখানে উদ্দেশ্য ছিল একটাই, রুক্মিণীকে কৃষ্ণের চোখে খাটো করে দেওয়া। কিন্তু তার জন্য যে উপায় ব্যবহৃত হয়েছিল, তা নিজমুখে বলেছেন সত্যভামা। বলেছিলেন— স্বর্গের নন্দনকানন থেকে ওই পারিজাতের গাছটাই উচ্ছিন্ন করে এনে পুঁতে দিতে হবে দ্বারকায়। আমি ওই পারিজাত ফুল খোপায় গুঁজে আমার সতীনদের মধ্যে ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে চাই— বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।

যুক্তি একটা আছে বটে। যুক্তি আছে— কৃষ্ণ আমাদের মতো কলির জীব না হলেও কলিকালেরই অবতার বটে। যে যতই বলুন— দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণ লীলাসম্বরণ করলেই তবে কলির আগমন ঘটেছে, আমরা তা মানি না। তিনি কলিতে এসেছিলেন বলেই কলির আচরণ নিজের জীবনে খানিকটা টের পেয়ে গেছেন। এই যে প্রেয়সী সত্যভামার পারিজাতের বায়না হল, তা যেমন কলিসুলভ কেশ-পারিপাট্যের জন্য, তেমনই অন্যদিকে তা কৃষ্ণকেও একেবারে নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছিল। পৌরাণিক কলিধর্মে বলা হয়েছে— কলিকালে স্ত্রীগণ উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক চুলকাইতে-চুলকাইতে অনায়াসে স্বামীর বাক্য অবহেলা করিবে— উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃ কণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ। আমাদের বক্তব্য— ত্রেতাযুগে মহারাজ দশরথের প্রিয়তমা স্ত্রী কৈকেয়ী কী করেছিলেন? তাঁর অবহেলা এবং দশরথের অনুনয়-বিনয় নিয়ে রামায়ণে অন্তত সাতটি সর্গ রচিত হয়েছে। আর এই যে সত্যভামার কথা বললাম, তাঁর বায়না রাখবার জন্য ভগবান কৃষ্ণকে স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই পারিজাত-বৃক্ষ এনে রোপণ করতে হয়েছিল দ্বারকায়।

এই আচরণকেই বা কী বলবেন— তেজস্বী ঈশ্বর-স্বভাব পুরুষের আচরণে দোষ নেই কোনও?

আমরা তাই প্রথম থেকেই বলে আসছি— কলিযুগ বলে পৌরাণিকেরা যে-ভাবীকালের বিবরণ দিয়েছেন, তা তেমন কোনও সুদূর ভবিষ্যৎ ছিল না তাঁদের কাছে। তাঁদের কাছে যেটা বর্তমান ছিল এবং সেই বর্তমান যতটুকু ভবিষ্যতের রূপ দেখতে পেয়েছিল তারই সামান্য অনুমান আছে মহাভারত-পুরাণে কলিধর্মের বর্ণনায়। বরঞ্চ বলব— কলিধর্ম ছিল প্রত্যেক বৃদ্ধ পৌরাণিকের কাছে এক রূঢ় বাস্তব, যা সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁরা। সমাজে যে আধুনিকতার আমদানি হচ্ছিল, গ্রাম-সমাজ যত নগরায়ণের পথে হাঁটছিল, সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত মর্যাদা যত বাড়ছিল, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীরা যত স্বনির্ভর হচ্ছিল, কলির প্রভাব তথাকথিতভাবে তত বাড়ছিল। এমনকী সমাজে যদি তেমন কোনও উদার মহান বিপ্লবও আসে যা শত-শত, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুক্তি ঘটায়, সেখানেও যে-অনুদার সংরক্ষণশীল মানুষ কলির প্রভাব দেখতে পান, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি মধ্যযুগের চৈতন্যের সমসাময়িক একটি শ্লোকে। যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দকে কলিযুগের পবন-অবতার বলা হয়, তাঁদের উদার বিপ্লবকেও বিরুদ্ধ সংরক্ষণশীলতায় মানুষ বলেছে— ওরে মন! মন রে আমার! তুমি যেন এই ঘূর্ণিপাকে বাঁধা পোড়ো না, কলির পরাক্রম অধুনা বড় বেড়ে গেছে— বলী কলিপরাক্রমো বিরম বিভ্রমেভ্যো মনঃ। তার মানে, 'কলিযুগ' প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এমনই একটা 'কনসেপ্ট্', যাকে যে-কোনও নতুনত্ব এবং আধুনিকত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করা যায়।

বেদপাঠে মেয়েদের বেদদত্ত অধিকার

ঠিক যেভাবে সবার সামনে আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আমাকে বকেছিলেন, এমনি হলে এখনও ঠিক সেইভাবেই বকতেন। সেই একটি বর্ণকে কটু অনুনাসিকতায় দীর্ঘায়িত করে বলতেন— অ্যাঃ! খুব বুলি ছুটেছে দেখছি! দু-পাতা বেদ পড়েই খুব যে বড় বড় কথা বলছ? অবশ্য এইই হয়, পরিপাক না হলে ক'খানা বেদ-মন্ত্র মুখস্থ করেই লোকে বড় বাগ্মী হয়ে যায়— বেদমধীত্য ত্বরিতো বক্তারো ভবন্তি। মাস্টারমশাই বেঁচে থাকলে বলা যেত— শুধু আমি কেন স্যার, এখন যে সবাই বড় বড় কথা বলছে। কেউ ধর্মের জন্য, কেউ অধর্মের জন্য, কেউ রাজনীতির জন্য, কেউ স্বার্থের জন্য, কেউ বা শুধুই আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য বেদের ব্যবহার এবং অপব্যবহার— দুইই করছে। বেদের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য যাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, তাঁদের আরও একটি কারণে মাস্টারমশায়ের সুরে বকা লাগানো দরকার। কারণটা বলি।

যাঁরা হঠাৎ বেদ-পাঠে অথবা বেদ-গানে স্ত্রীলোকের কোনও অধিকার নেই বলে ফতোয়া জারি করলেন, তাঁদের একবার জিজ্ঞাসা করি— যে পুরুষ-পুঙ্গবেরা বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে অহরহ বেদের উচ্চতা স্থাপন করছেন, তাঁদের কি বেদ-পাঠে খুব অধিকার আছে? স্বর এবং বর্ণের উচ্চারণে যদি বিকার আসে, তো যজ্ঞকালে নানা বিপত্তি ঘটে বলে বৈদিকেরা ভয় পান। বৈয়াকরণেরাও নাকি সেই কারণে ভাল করে ব্যাকরণ পড়েন— যাতে মন্ত্রের উচ্চারণে ত্রুটি না হয়— মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা। আহা, যে ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ে দেন, যিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রাদ্ধ করেন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের স্পেশাল পেপার পড়ান এবং ভারতবর্ষের শত শত মহাবিদ্যালয়ে যাঁরা সাম্মানিক বিষয়-সূচিতে সংস্কৃত-ক্লাসে বেদ পড়ান (মহাশয়! আমিও তাঁদের একজন)— তাঁদের মধ্যে ক'জন আছেন, যাঁদের উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরে সঠিক মন্ত্র উচ্চারণের ক্ষমতা আছে! দু-চার জন ছাড়া কারও নেই। বেদের নিয়ম মতো তো তাহলে সবার এখন চাকরি যাওয়া উচিত। আরও কথা হল— বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকথিত ব্রাহ্মণ-শূদ্র-অন্ত্যজ নির্বিশেষে আমরা যারা এতকাল একসঙ্গে বেদ পড়ে এসেছি এবং পড়িয়ে এসেছি— শাস্ত্রের নিয়মে এখন তাঁদের নিশ্চয় ঘোর নরকে গরম তেলে ভাজা-ভাজা হবার কথা— অথবা বিশ্ববিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের বৃহৎ-কাষ্ঠে দোষ 'নাই'।

নরকের কথা থাক। আপাতত শাস্ত্রং— অভয় দিয়ে বলি, অনুস্বর ধনুঃশর নহে মহারাজ! অধিকারের নিয়ম এক রকম, অধিকার হরণের নিয়ম আরেক রকম। মূলে যাঁরা শাস্ত্র রচনা করেছিলেন তাঁরা উদার ছিলেন। পরে যাঁরা নিজের প্রয়োজনে শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা অধিকার হরণ করেছেন নিজেরই স্বার্থে, তপস্বীর করুণায় নয়। প্রথমে জেনে নেওয়া ভাল— বেদের দুটো অংশ আছে। প্রথম অংশ মন্ত্রভাগ, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগ। মন্ত্রভাগের মধ্যে যেখানে শুধুই দেবতার স্তুতি, আহ্বান অথবা প্রার্থনা— সেখানে কে বেদপাঠে অধিকারী বা অনধিকারী, সেসব কথা কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, নানা মন্ত্রের অর্থ এবং বক্তব্য থেকে যদি এমন প্রমাণ হয় যে, পুরুষেরা বেদ-মন্ত্রের অধিকারী, তাহলে খোদ ঋক্‌বেদের মন্ত্র থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া যাবে— স্ত্রীলোকেরাও মন্ত্রে সমান অধিকারী। বৈদিক মতে বেদের মন্ত্র কেউ লেখেনি, ঋষিরা মন্ত্রবর্ণ দর্শন করেছেন। এই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে পুরুষেরা যেমন আছেন, তেমনই মেয়েরাও আছেন। বিশ্ববারা, অপালা, কি ঘোষা-রোমশার কথা থাক, ঋক্‌বেদের

যে মন্ত্রগুলি নিয়ে আমরা দুর্গাপুজার সময় প্রতিবার মোহিত হই, সেই দেবীসূক্তটির দ্রষ্টা বা রচয়িত্রী কিন্তু একজন মহিলা। তিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা অম্ভৃণী। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম আভাস যে দেবীসূক্তের মধ্যে সেই মন্ত্রবর্ণ যদি একজন আত্মজ্ঞানী মহিলা কবি চোখে দেখে থাকেন, তবে তো উত্তরাধিকারের নিয়মে সেই মন্ত্রের উচ্চারণে তাঁদেরই প্রথম অধিকার। সুখের বিষয়— বহু বছর আগেই মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে এই দেবীসূক্তের— অহং রুদ্রেভির্বসুভি শ্চরামি অহম্.. এই মন্ত্রগুলি সুরে-তালে একজন মহিলা গায়িকার কণ্ঠগত করে আকাশবাণীর কর্তারা বাংলাদেশের বেদ-বোধে চিরন্তনী সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন বিশ্ববারা নাম্নী রমণী-ঋষির কথা। তিনি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যে সোচ্চারে নিজের নাম ঘোষণা করে বলছেন— বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হয়ে দেবতাদের স্তব উচ্চারণ করার পর যজ্ঞীয় হব্যপাত্র নিয়ে অগ্নির অভিমুখে যাচ্ছে। এখানে বিশ্ববারা শুধু অন্তত ছটি মন্ত্রের দর্শনকর্ত্রী ঋষিই নন, এখানে তিনি ঋত্বিক অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের পুরোহিতও বটে। একাকিনী এই সব মহিলার স্বচ্ছন্দ অধিকারের কথা বাদ দিলেও খোদ ঋক্‌বেদের মন্ত্রভাগে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে। এমনকী প্রিয়-যজ্ঞবিশিষ্ট দম্পতির মন্ত্র-স্তুতি যে দেবতারা বেশি পছন্দ করেন তারও উল্লেখ আছে মন্ত্রের মধ্যেই। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যজ্ঞের কাজ আরম্ভ করা, সোম-রস প্রস্তুত করা এবং সবার শেষে মন্ত্রোচ্চারণে দেবতার স্তব করার মন্ত্রগুলি যথাক্রমে— রিত্বা ততস্রে মিথুনা (১ ১৩১ ৩), যা দম্পতি স মনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ (৮ ৩১.৫-৬) এবং বীতিহোত্রা কৃতদ্বসু দশস্যান্তামৃতায় কম্ (৮.৩১.৯)। এর পরেও কি রমণীয় বেদপাঠে সন্দেহ!

এরপরেও কি মেয়েদের বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার নিয়ে অর্বাচীন ধর্মধ্বজীদের বাগাড়ম্বর শোনার প্রয়োজন আছে? বেদের মন্ত্রভাগ ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভাগে এলেও স্ত্রীলোকের এই অধিকার অব্যাহত আছে। অবশ্য এখান থেকেই মেয়েদের জ্ঞান-গম্যি এবং বিবাহের যজ্ঞীয় সংস্কারটা ধর্তব্যের মধ্যে এসে গেছে। অবশ্য অধিকার এখানে সামান্য খর্ব করা হলেও স্ত্রীলোকের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে আরণ্যক গ্রন্থগুলি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শুধু স্পষ্ট করে ব্রাহ্মণপত্নীদের মন্ত্র উচ্চারণ করবতেই বলেনি— অনুবাকং পত্নীং বাচয়তি— তাঁদের সমস্ত আহবনীয় হোমে উপস্থিত থাকতে বলেছে। উপরন্তু বৈষ্ণবরা

যেমন কীর্তনের ধুয়ো ধরেন অথবা সম্মিলিত কণ্ঠে আমরা যেমন স্ত্রী-পুংনির্বিশেষে গান করি, ঠিক তেমনি করেই ব্রাহ্মণ-বধূদের সামগানের উচ্চারণ এবং সুর করতে বলা হয়েছে— পত্নীসহিতানাং সর্বেষাং প্রস্তোতৃনিধন ভাগোচ্চারণং বিধত্তে। হায়, এত সুর করেও রমণীর কণ্ঠে যদি সেই সুর এখন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, তবে বেদ-বিরোধী কথা বলার দায়ে ধর্ম-প্রবক্তাদের সিংহাসনটাই কেড়ে নেওয়া উচিত।

বেদের ধর্ম, যাগ-যজ্ঞ, হোম, মন্ত্রোচ্চারণ, দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের আচরণীয় কর্তব্যগুলি নিয়ে যে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম পূর্বমীমাংসা দর্শন। জৈমিনীর সূত্র এবং তার ওপরে টীকা-টিপ্পনীগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যজ্ঞে সমানাধিকার এবং মন্ত্রোচ্চারণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম, কিন্তু জায়গার অভাবে তা এখানে করা গেল না। মনে রাখা দরকার— বৈদিক ক্রিয়াকর্মে এবং মন্ত্রোচ্চারণে মেয়েদের অধিকার খর্ব করা আরম্ভ হয়েছে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রচনার পর থেকে, বিশেষত মনু মহারাজের তাড়নায়। স্মৃতি গ্রন্থগুলি বেদমূলক হলেও, তার মধ্যে আচার-আচরণের গোঁড়ামিটাই বেশি। বস্তুত স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদ নয়, সে কথা বহুভাবে প্রমাণ করা যায়। এর ওপরেও সেই প্রবাদ-বাক্যের মতো কথাটি আছে যে, শ্রুতি অর্থাৎ বেদ-উপনিষদের বক্তব্যের সঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ হলে শ্রুতিকেই মানতে হবে 'শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।' অতএব স্মৃতিশাস্ত্র যতই মেয়েদের অধিকার হরণ করুক, স্বয়ং শ্রুতিই যেখানে আমাদের সহায়, সেখানে স্মার্ত পণ্ডিতের কায়দায় কে কী বিধান দিলেন তাতে কিছু আসে যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও যেগুলি প্রাচীন স্মৃতি বা নিবন্ধ, সেগুলির কোনও কোনওটি পড়লে কিন্তু বোঝা যায় যে, মা কী ছিলেন এবং মা কী হইয়াছেন। যম-সংহিতার মতো প্রাচীন স্মৃতি মেয়েদের বেদে অধিকার-নির্ণয়ের সময় তার পূর্বতন সময়ের কথা স্মরণ করে বলেছে— পুরাকল্পে ছেলেদের যেমন উপনয়ন হত, কুমারী মেয়েদেরও তেমনই উপনয়ন হত, পৈতে পরতে হত। বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করা তো অতি সাধারণ কথা, নারীরা বেদ পড়াতেন এবং গায়ত্রী জপ করতেন— অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা। তবে হ্যাঁ কুমারী মেয়ে বলে কথা, গুরুকুলে পড়াতে যাওয়ার তার বিপদ ছিল অনেক। ফলে স্ত্রীলোকের বেদ-অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপনার ব্যাপারে কিছু 'কনসেশন'ও ছিল। যম-সংহিতা সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজের সংস্কারটুকু স্মরণ করেছেন সগর্বে।

যাঁরা ভাবেন— হ্যাঁ, স্ত্রীলোকের বেদ-পাঠ-টাঠের মতো একটা কিছু ছিল বটে, তবে আদুড় গায়ে কৌপীন পরে তাঁদের বেদ-পাঠ করতে হত, তাই ও সব বর্বর রীতি বন্ধ হয়ে গেছে। সবিনয়ে বলি— বৈদিক সমাজ যত খোলামেলাই হোক, তাঁদেরও কামাদি পীড়া ছিল। যম-সংহিতা বলেছে— সেকালে মেয়েরা পৈতেও পরতেন, বেদও পড়তেন— কিন্তু তাঁদের বেলায় অনেক রেহাই ছিল। মেয়েরা আদুড় গায়ে মৃগচর্ম অথবা কৌপীন পরে নিজের বেদাচার বজায় রাখতে চাইলে অন্যদের যে হৃৎ-কম্প সৃষ্টি হবে, সে কথা বৈদিক পুরুষেরা বিলক্ষণ জানতেন। আর জানতেন বলেই তাঁরা বলছেন— মেয়েরা ব্রহ্মচারিণী হয়ে বেদ অধ্যয়ন করলেও, পৈতে পরলেও তাঁরা যেন মৃগচর্ম ধারণ না করেন, কৌপীন না পরেন অথবা মাথায় যেন জটাজাল সৃষ্টি না করেন— বর্জয়েদ্ অজিনং চীরং জটাধারণমেব চ। মেয়েদের অধ্যাপক হতেন বাবা কিংবা কাকা। ব্রহ্মচারী কুমারকে যেমন বাইরে ভিক্ষাচরণ করতে হত, মেয়েদের ভিক্ষার ব্যাপারটা সীমিত থাকত ঘরেই। অর্থাৎ বেদ-পাঠের তাগিদ থাকলেও পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়ার মধ্যেই তাদের লালন করা হত। কারণটা খুব স্পষ্ট এবং জৈবিক এবং বৈদিকও বটে।

অবশ্য বেদ পড়ব কি পড়ব না— সে ব্যাপারে মেয়েদের একটা স্বতন্ত্রতা ছিল। এখনকার দিনেও যেমন অনেক মেয়ের মুখে শুনি— ধুৎ! আবার কষ্ট করে অনার্স পড়া! এম.এ. পড়া! রিসার্চ করা! তার চেয়ে বিয়ে হয়ে গেলেই বেশ ভাল— গয়না পরব, শাড়ি পরব, নিত্য নতুন সাজব। বৈদিক সমাজেও যাঁদের এইরকম বিয়ে-বিয়ে মন হত, তাঁরা বেদ-পাঠ, উপনয়ন অথবা ভিক্ষাচর্যার পথে না গিয়ে বিয়েই করে বসতেন। তাঁদের বেদে অধিকার থাকত না, কেননা তাঁরা জ্ঞানের পথ স্বেচ্ছায় পরিহার করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিকেই যাঁদের মানসিক ঝোঁকটা ছিল, সেই সব ব্রহ্মবাদিনী মহিলাদের পৈতে নেওয়া, বেদ পড়া এবং নিজের ঘরে ভিক্ষা-চর্যা সবই ছিল প্রায় পুরুষদের মতোই— তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নি-সমিন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা (হারীত-সংহিতা)। তার মানে, ব্রহ্মবাদিনীরা শিক্ষিতা রমণীদের একটি শ্রেণী।

বেদ কিংবা বেদ-কল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে স্ত্রীলোকের মন্ত্রোচ্চারণ নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশই নেই। আশ্বলায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্রে পরিষ্কার এবং 'ক্যাটিগোরিকালি' বলেছেন যে— এই মন্ত্র পত্নী পাঠ করবে, আর অমুক মন্ত্র পত্নীর হাতে বেদ দিয়ে তারপর তাঁকে দিয়ে বলাবে— ইমং মন্ত্রং পত্নী

পঠেৎ/আবার/বেদং পত্নে প্রদায় বাচয়েৎ। বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণে বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপে মেয়েদের অধিকার ছিল কিনা তার প্রমাণ ধরে রেখেছে আদিকবির রামায়ণ। রামায়ণে দশরথের পত্নী কৌশল্যা অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশ নিয়ে নিজে খড়্গাঘাতে যজ্ঞীয় অশ্ব বলি দিয়েছেন। আর রামচন্দ্র যখন বনবাসের খবর দিতে এসেছেন মায়ের কাছে, তখন তিনি রীতিমতো মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নিহোত্র হবন করছিলেন— অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা।

উদাহরণ দিতে পারি ভূরি ভূরি। ব্রাহ্মণ, সূত্র, ব্যাকরণ এবং দর্শনের নানা উদাহরণ দিয়ে বেদে রমণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রবন্ধ বেড়ে যাবে। তাই বিরত থাকলাম। বস্তুত মেয়েদের বেদপাঠের বা গানের অধিকার হরণ করা হয় পুরাণ এবং স্মৃতির যুগ থেকে। পুরাণ-কাহিনি সর্বসাধারণে্য প্রচার করার কারণেই বেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতে থাকে, এবং একই সঙ্গে আচার ব্রত উপবাসের কড়াকড়িও বাড়তে থাকে। ব্রহ্মবাদিনীর জ্ঞান আস্তে আস্তে স্ত্রী-আচারে পর্যবসিত হয়। এর জন্য দায়ী কারা জানেন? মহাভারতে যুধিষ্ঠির তাঁদের চিনিয়ে দিয়েছেন অন্যতর এক প্রসঙ্গে। বৈদিক যজ্ঞে আগে নাকি সুরা মৎস্য অথবা পশুমাংসের প্রচলন ছিল না, এগুলো নাকি নিজের কারণে ধূর্ত লোকেরা প্রচলন করেছে— ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতন্নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্। অন্তত যুধিষ্ঠিরের তাই মত। বেদে, বেদপাঠে, মন্ত্রে বা গানে নারীর অধিকারের প্রসঙ্গে আমার মতটাও যুধিষ্ঠিরের অনুরূপ। বেদ বা বেদপ্রায় গ্রন্থগুলি স্ত্রীলোককে কখনও বলেনি— বেদে তোমার অধিকার নেই। অধিকার নেই বলে যাঁরা চালিয়েছেন বা এখনও চালাচ্ছেন, তাঁদের আমি যুধিষ্ঠিরের পরিভাষাতে ধূর্ত বলি। স্বার্থান্বেষী ধূর্তরাই বলেছে— বেদে নারীর অধিকার নেই। বেদে, অন্তত বেদে, এমন কথা নেই— ধূর্তৈঃ প্রবর্তিতং হ্যেতন্ নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্।

অবশ্য এ বাবদে আমার দুঃখটা আরও একটু গভীরে। আধ্যাত্মিক প্রবক্তা, যাঁরা নিশ্চল সমাজে বিশ্বাসী, তাঁরাও বলেন বেদে নারীর অধিকার ছিল না, আবার নব্য গবেষক, যাঁরা আধুনিকতার অভিসন্ধিতে নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁরাও নানা গ্রন্থের গ্রন্থিমোচন করে দেখাতে চান— *দেখ প্রাচীন সমাজ কীরকম স্ত্রী-বিদ্বেষী, বেদে নারীকে অধিকার দেয়নি।* বস্তুত আধ্যাত্মিক প্রবক্তাদের থেকে নব্য গবেষকদের আমি আরও বেশি বিপজ্জনক মনে করি। কেননা আধ্যাত্মিক প্রবক্তরা অহংসর্বস্ব, তাঁরা যা ভাবেন, তাতেই নিশ্চল। কিন্তু যারা গবেষণার

বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে সমাজ ধারণ করবেন, তাঁরা যদি শুধু ইষ্টসিদ্ধির জন্য গোরুর পুরো শরীরটি না দেখিয়ে শুধু শিং দেখিয়েই বলেন— ওটা গোরুই, তাহলে বিপদ বাড়ে। আমার ধারণা— প্রাচীন সমাজে নারীর অধিকার কেমন ছিল, সে বিষয়ে সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলির সঙ্গে ইতিবাচক দিকগুলিও সমানভাবে দেখানো দরকার। তাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি ন্যায়বিচার যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সম্ভব হবে সম-আলোচনা। আমরা সম-আলোচনা চাই, শুধুই সমালোচনা নয়।

অবশ্য এর ওপরেও আরও একটা কথা আছে। আমরা মুক্তির নিঃশ্বাস-লিপ্সু এক আধুনিক সমাজে বাস করি। এটা বেদের সমাজ নয়, কোনও স্মার্ত পণ্ডিতের সমাজও নয়। এই সমাজে দাঁড়িয়ে স্থান এবং কালের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে যেখানে যে মন্ত্র পাঠ করা দরকার তাই করব; যেখানে যে গান করা দরকার, তাই করব। কোনও একজন আধ্যাত্মিক প্রবক্তার নিজস্ব ধর্মীয় শুচি-বাতিকের জন্য আমরা কেউ পূর্বপুরুষের সম্পত্তির অধিকার এক কণাও ছেড়ে দেব না। এবং এই নিরিখে, বেদ-মন্ত্র পড়ায় বা বেদ-গানে স্ত্রীলোকের অধিকার আছে কিনা, সেই আলোচনায় গিয়ে এক অকিঞ্চিৎকর ধর্মীয় নেতার ব্যক্তিমূল্য একটুও বাড়াতে চাই না। কারণ আমাদের সমাজে রমণীরা অর্ধেক আকাশ, তাঁদের অধিকার আকাশের মতোই স্বতঃসিদ্ধ।

পণ্ডিত-মূর্খ

আমি জানি, সকলেই আমাকে খারাপ ভাববেন। সকলেই বলবেন, আমি নিতান্ত নীচ মনের মানুষ। আজকের প্রগতিশীলতার মোড়ক, আজকের এই মেকি ভদ্রতার পরিশীলন, তার মধ্যে যেখানে নীচকে নীচ বলতে নেই, মূর্খকে মূর্খ বলতে নেই, এমনকী চালাককে চালাক বলতেও নেই, বুদ্ধিমানকে বুদ্ধিমান বলতেও নেই— সেখানে মূর্খ লোকের মূর্খতা বিচার করতে বসলে লোকে আমাকে দুয়ো দেবে বইকি। সেকালের প্রাচীন কর্তারা আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না। আমরা বহু চেষ্টায় এসব ব্যাপারে পরিশীলিত হয়েছি, অঙ্গবিকারগ্রস্ত মানুষ যে কোনও অপাংক্তেয় মর্যাদাহীন মানুষ নন, সে ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট বোধোদয় হয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্ধ-খঞ্জ-বধিরদের বিচিত্র কর্মরাশি দেখে এখন রীতিমত লজ্জিত

বোধ করি, তথাচ পুরাতন পৈতামহ-পাপের শাব্দিক প্রায়শ্চিত্তও করে থাকি।

কিন্তু আমরা মহা বিপদে পড়েছি মূর্খদের নিয়ে। বিশেষত সেই মূর্খদের নিয়ে আরও বেশি বিপদে পড়েছি, যাঁরা মূর্খ, অথচ সরল নন, যদি বা কিছু সরল তবু অযৌক্তিকতার চরম স্বর্গ থেকে মুখে-মুখে কথা বলেন। বিপদ আছে আরও— আপনি কাকে মূর্খ বলবেন, মূর্খত্ব নির্ধারণের মাপকাঠিই বা কী হবে? সত্যি কথা বলতে কি, মূর্খদের, বিশেষত স্বল্পবিদ্য চালাক মূর্খদের মূর্খ বলা পরম বিপদ। নিরক্ষর মূর্খকে মূর্খ বললে সেই মহলের আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হয়ে পড়েন, আর চালাকি-সফল মূর্খদের মূর্খ বললে, তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় এত-শত মূর্খের আবির্ভাব ঘটে যে, তাতে প্রমাদ আরও বাড়বে।

আমি অবশ্য মূর্খত্বের অনেক উপকারিতা খুঁজে পেয়েছি এবং সেই কারণে একটি সবল মূর্খজীবনই যাপন করতে চাই। এক অসাধারণ কবিই এই মূর্খজীবনের সুবিধাগুলি উল্লেখ করে আমাকে উদ্দীপিত করেছেন। তিনি লিখেছেন— সবচেয়ে বড় সুবিধে হল এই যে, মূর্খত্ব লাভের জন্য কোনও পরিশ্রম করতে হয় না এবং এই সুলভ মূর্খত্ববোধের আরও অন্তত আটটা গুণ আছে ভাল-ভাল। প্রথমত, মূর্খ মানুষের কোনও ঘটনা নিয়ে কোনও টেনশন নেই এবং তা নেই বলেই সে বড় নিশ্চিন্ত। দ্বিতীয় গুণ হল খাওয়া। মূর্খ লোকেরা প্রচুর খেতে পারে, আসলে শারীরিক ভাল-মন্দের বুদ্ধিও ততটা থাকে না বলে মূর্খ লোকের খিদেও বেশি। খাওয়াও বেশি। কথা বলাব ব্যাপাবেও মূর্খ লোকের কোনও বিরাম নেই, দিন-রাত বিষয়-ভাবনাহীন কথা বলে যেতে পারে মূর্খ লোক। আর ঘুমোতেও পারে সেই রকম, দিন-রাত— নিশ্চিন্তো বহুভোজনোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্। মূর্খ মানুষ কার্য এবং অকার্যের কোনও বিচার করতে পারে না, ফলে সমস্ত বিপন্ন-বিক্ষুব্ধ মুহূর্তেও সে অন্ধ এবং বধিরের মতো থাকে। মূর্খের মানও নেই, কোনও অপমানও নেই, সব সমান। সবচেয়ে বড় কথা, মূর্খ লোকের খুব একটা রোগ-ভোগও নেই, শরীরটাও তার যথাসম্ভব মজবুতই থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, মূর্খ হবাব মতো সুখ আর কিছুতে নেই— প্রায়েন আময়-বর্জিতো দৃঢ়বপুঃ মূর্খঃ সুখং জীবতি।

এই কারণেই আমি নিরক্ষর সুখী মূর্খদের আমাদের লিস্টি থেকে বাদ দিচ্ছি। কেননা এই নিরভিমান দৃঢ়বপু সুখী মূর্খদের ওপরে আমাদের মায়া আছে, করুণা আছে, তারা কষ্ট দেয় না। যদিও এটা আমরা খুব ভালভাবে জানি যে, পুরাকালে যখন বিদ্যাচর্চার সুবিধে সবচেয়ে কম ছিল, তখনও একটি মূর্খ পুত্রের

জন্য পিতা-মাতার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। যে পুত্র এখনও জন্মায়নি অথবা জন্মেও যে মারা গেছে— এই দুই জাতীয় পুত্রকেই তাঁরা মূর্খ পুত্রের চেয়ে শ্রেয় মনে করতেন— অজাত-মৃত-মুর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্। এ রকম আরও হাজারও নীতিশ্লোক আছে, যাতে বুঝি মূর্খত্বের জন্য সেকালে অনেক যন্ত্রণা ছিল এবং যন্ত্রণার জন্যই বহুল মূর্খতার জন্য আমাদের এখনও মায়া হয়, আমরা কষ্ট পাই। কিন্তু এমন নিরক্ষরতার অভিশাপ বাদ দিয়ে যদি সাক্ষরতার দিকে তাকাই তাহলে যন্ত্রণা আরও বাড়ে। লেখাপড়া এতটুকু না করেও যে মানুষ বিদ্বান লোকের মতো কথা বলে, চালাকি করে এবং উত্তাল বদমায়েশি করে, তাদের নিয়ে আমরা মহা-দুর্ভাবনায় পড়েছি। এমন মানুষ দেখি রাস্তাঘাটে, যারা সচিন তেন্ডুলকরের 'টেনিস এলবো'-র আয়ুর্বেদিক উপশম-পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে 'সিয়াচেন' নিয়ে চৈনিক অধ্যবসায় এবং ড. নন্দী যে কার্ডিওলজির কিছুই বোঝেন না— সেটা একেবারে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কী কী করলে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন এবং কী কী না করলে আজ জ্যোতি বসু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন— এসব ব্যাপারে এঁদের চূড়ান্ত মতামত আছে।

এঁদের আপনি মূর্খ বলতে পারবেন না। কেননা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি— সব এঁদের হস্তামলকবৎ। তাহলে আপনি কী বলবেন এঁদের-- এঁদের তো বিদ্বানও বলতে পারবেন না। এইখানেই জানানো দরকার যে, আমাদের প্রাচীনেরা নিরক্ষর মানুষকে তেমন করে মূর্খ বলেননি, বরঞ্চ আরও কয়েক প্রকার মূর্খের কথা বলেছেন, যাঁরা ঠিক প্রথাগত মূর্খ নন। তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। এমনকী সামাজিক আচার-আচরণও এই মূর্খতার নিদান হতে পারে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের নিজের দোষে যখন যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে, তখন স্বকৃত অন্যায়গুলির কথা স্মরণে না রেখে, কেন পাণ্ডবরা যুদ্ধের কথা ভাবছেন সেই চিন্তায় তাঁর রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় মহামতি বিদুরকে ডেকে তিনি যখন নিজের বিনিদ্রতার কথা বলছেন বিদুর তখন বললেন— চার ধরনের মানুষ রাতে ঘুমোতে পারে না মহারাজ! এক, যে মানুষ সহায়শূন্য দুর্বল, অথচ প্রবলতর ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত, রাতে তার ঘুম আসে না। দুই, যার টাকা-পয়সা সব চুরি গেছে, তার ঘুম আসে না। তিন নম্বর বিনিদ্র মানুষ হল চোর, কার বাড়িতে চুরি করবে, নির্বিঘ্নে কী করে পালাবে, সেই চিন্তায় তার ঘুম আসে

না। আর চতুর্থ হল কামুক। স্ত্রী চিন্তায় ঘুম আসে না তার— হৃতস্বং কামিনং চৌরমাবিশন্তি প্রজাগরাঃ।

এই চারজনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র কোনও কক্ষেই যেন পড়েন না, অথচ বিদুর কথাটা বলে দিলেন। তার মানেই, তিনি কোনও কক্ষে অবশ্যই আছেন, অথচ দাদা বলেই বিদুর তা স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না; একই ভাবে ধৃতরাষ্ট্র নিরক্ষর মূর্খ নন, অথচ বিদুর তাঁর কাছে কয়েক কিসিমের মূর্খের সংবাদ দিয়েছেন এবং অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে সেই মূর্খত্ব আছে, যে মূর্খত্বের কথা দাদা ধৃতরাষ্ট্রকে বলা যায় না।

বিদুর বলেছিলেন— যে মানুষ পড়াশুনো কিছুই করেনি, বিদ্যাস্থানের একটি বিষয়ও যে জানে না, অথচ তার স্বভাবটা বেশ উদ্ধত— অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধঃ— সেই মানুষটা কিন্তু মূর্খ। আপনারা ভাবছেন— এমনটা হয় নাকি। আমরা বলব— এই মূর্খতার জন্য এখন কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রবেশ করলেই হবে। প্রত্যেক বিভাগে আপনারা দুটি-তিনটি করে স্যাম্পল পাবেন, যাঁরা নিজেদের শাস্ত্র কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁদের ঠাট-বাট, কথাবার্তা শুনবেন— মনে হবে এমন হয় নাই আর হবার নয়। এঁদের ঔদ্ধত্য দেখলে বুঝতে পারবেন বিদুর-কথিত মূর্খ কাকে বলে। বিদুর বলেছেন— দরিদ্র লোক, যার দু'পয়সার মুরোদ নেই, সে যদি হঠাৎ বদান্য দাতা হয়ে ওঠে, তবে সেও এক ধরনের মূর্খতা। বিদুরনীতির তৃতীয় চিহ্নিত মূর্খ হলেন তাঁরাই, যাঁরা কর্ম না করেই ধন উপার্জন করতে চান— অর্থাংশ্চাকর্মণা প্রেপ্সুঃ। শব্দটা ছিল— অকর্মণা— এখানে কর্ম না করা মানে কিন্তু কোনও কর্ম না করা নয়, এখানে অকর্ম বলতে বোঝায় বিনা পরিশ্রমে ফোকটে পয়সা করা। যেমন ধরুন— জুয়ো খেলে, রেস খেলে অথবা লটারি খেলে যাঁরা পয়সা উপায় করতে চাইছেন, বিদুর তাঁদের এক ধরনের মূর্খ বলবেন।

বিদুর কিন্তু মহাভারতীয় পণ্ডিত হলেও প্রখর বাস্তববাদী। কেউ যদি নিজের সমস্ত কাজ জলাঞ্জলি দিয়ে পরের কাজ করতে যায়, তবে সে বিদুরের মতে মূর্খ। আমরা এরকম লোক বহু দেখেছি। আপনারা বলবেন— পরার্থপরতা তো খুব ভাল, বিশেষ করে 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ ধরণী-পরে'— এই নিরিখে। সত্যি বলতে কি, এই মহানুভব আচরণের বিরুদ্ধে এটা স্বার্থপরতার কোনও প্রসঙ্গই নয়। এ হল সেই আচার যখন পড়াশুনোর প্রয়োজন

ফেলে পাড়ার লোকজনের সঙ্গে লরিতে করে শবদাহ করতে যাওয়া। অথবা তত্ত্বাব-ভাবিত হয়ে পার্টির মিছিল করা অথবা নিজের বাড়ির রেশন না এনে পাড়ার রকে রোদ-চশমার আড়ালে ক্যারাম খেলা। এমনকী বিদুর এটাও মূর্খতা বলবেন— যদি কেউ বন্ধুর জন্য মিথ্যে কথা বলে, বন্ধুর জন্য মিথ্যা আচরণ করে। শেষ কথাটা বুঝতে অসুবিধে হতে পারে, তবে উদাহরণ দিলে বুঝবেন। শকুনি-মামা দুর্যোধনের জন্য কপট পাশা খেলেছিলেন, বন্ধুর স্বার্থে কর্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমর্থন করেছিলেন। এমন বন্ধুত্বপূর্ণ মিথ্যাচরণ মূর্খতাই বটে।

মূর্খ সংজ্ঞা পরিহারের সবচেয়ে বড় উপায় নিজের ক্ষমতা, নিজের 'লিমিটেশন' বোঝা। সেটা না বুঝে যেটা পাবার নয়, সেইটা যদি মানুষ পেতে চায়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিসটাকে যে মানুষ ধরতে চায়, এবং তার জন্য ভালবাসার মানুষকে, অনুকূল জনকে যে ত্যাগ করে— মহাভারতের মতে সেটা মূর্খামি— অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ। নিজের পরিমিতি বোঝার ওপরে এতটাই জোর আছে এখানে যে, নিজের আখের না বুঝে নিজের চেয়ে বলবত্তর মানুষের পিছনে লাগাটাও মূর্খতা বলেই গণ্য হয়েছে একটা মাত্র লাইনে— বলবন্তঞ্চ যো দ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ়চেতসম্। 'বলবান' বলতে তখনকার রাজতন্ত্রে শুধুমাত্র পেশিশক্তিসম্পন্ন গুণ্ডাকেই বোঝাত না, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী মানুষও বলবান বলেই গণ্য হতেন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে— লোকে বলে, কথার বলার স্বাধীনতা, ভোট দেবার স্বাধীনতা— এসব নাকি আমাদের গণতন্ত্রে আছে। কিন্তু আমাদের পাড়ার রাজনৈতিক 'কেলে পাঁচু'র যে শক্তি অথবা গ্রাম-গঞ্জে বিপক্ষে ভোট দিলেও যেখানে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ধোপা-নাপিত-পুকুর বন্ধ করে, তাতে সর্বার্থে নিজের চেয়ে বলবত্তর মানুষকে বিদ্বেষ করাটা এখনও মূর্খতাই বটে— চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

মহামতি বিদুর যদি আজকের দিনে ভারতবর্ষের যে কোনও প্রদেশে যে কোনও সরকারি দপ্তরে যেতেন, তাহলে সরকারের 'পলিসি-মেকার' থেকে আরম্ভ করে করণিক, দপ্তরি, পিয়ন পর্যন্ত সকলকেই মূর্খ বলতেন। বিদুর বলেছেন— যে কাজটা সংক্ষেপে করা যায়, সেই কাজটাই যদি লোক বিস্তৃতভাবে করে, তবে তাকে তো মূর্খ বলতে হবেই; তা ছাড়াও যে লোক সব সময়েই সন্দেহ করছে এবং যে কাজটা তাড়াতাড়ি করা যায়, সেটাকে যদি কেউ অযথা বিলম্বিত করে দেয়, তবে তাকে মূর্খ বলতে হবে— চিরং করোতি ক্ষিপ্রার্থে স মূঢ়ো ভরতর্ষভ। বিদুর তো জানতেন না যে, সংক্ষিপ্ত কর্ম বিস্তৃত করা, সন্দেহ

করা অথবা ক্ষিপ্র করণীয়কে বিলম্বিত করার আরও গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে। আজকের দিনের সদা-চালাকির বুদ্ধিতে আপনারা অবশ্য বিদুরকেই মূর্খ ভাববেন, কিন্তু বিদুর যে আজকের দিনের রাজনীতি এবং ব্যক্তিচরিত্রও খুব ভাল বুঝতেন, সেটা ধরা পড়ে তাঁর চাঁছাছোলা কথায়। বিদুর বলেছেন— যে মানুষটা নিজেই যে দোষে দুষ্ট, সেই মানুষ যদি সেই দোষ দিয়েই পরের নিন্দা করে— পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্তমানঃ স্বয়ং তথা— তবে তার চেয়ে মূর্খ আর কেউ নেই। বিদুর প্রাচীন মানুষ, তিনি জানেন না, আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি মূর্খামি নয়, এটাই বড় গুণ। ম্যানেজমেন্ট মিটিং অথবা রাজনৈতিক মিটিং— বড় ব্যক্তি, বড় নেতা নিজেই যে দোষে দোষী, তিনি সেই দোষ দিয়েই অন্যতরের নিন্দা করেন।

মহাভারত অবশ্য সাধারণ মানুষের নাচার অবস্থাটা বোঝে এবং সেই কারণেই উপদেশ দিয়ে বলেছে— যার ওপরে তোমার রাগ করার ক্ষমতাই নেই বাপু, তার ওপরে রাগও করতে যেও না, তাকে শাসনও করতে যেও না, সেটা মূর্খামি হবে— অশিষ্যং শাস্তি যো রাজন্... তমাহুর্মূঢ়চেতসম্। এখানে 'ক্ষমতা' কথাটা অবশ্যই শারীরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অর্থে বুঝতে হবে। আবার এরই উল্টো দিকে বিদুর বলেছেন— যাদের শাসন করা উচিত, যারা শাসনের যোগ্য তাদের যদি শাসন না করো, তবে সেটাও পরম মূর্খামি— যশ্চ শিষ্যং ন শাস্তি চ। আধুনিক কালে বিদুরের এই কথার গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ আছে সুকুমার রায়ের ছড়ায়— 'কাউকে বেশি লাই দিতে নেই অমনি চড়ে মাথায়।' বস্তুত আধুনিক কালের প্রগতিশীলতা এবং শ্রম-সমন্বয়ের ভাবনায় নিম্নবর্গের কর্মচারী থেকে করণিক, শিক্ষক, অধ্যাপক— সকল ক্ষেত্রেই অনেক স্বাধীনতা, অনেক শিথিলতা ছিল। ফলত শুধু নিম্নবর্গের কর্মচারী নয়, উচ্চস্তরের কর্মচারীরাও— যারা পূর্বে শাসনের যোগ্য ছিলেন, এখন তাঁরা সব রকম শাসনের বাইরে। ফলত পিতৃ-পিতামহের পাপের দায় বহন করছেন এখনকার প্রজন্ম, যাঁরা অগ্রজদের উদ্দেশে গালাগালি দিতে না পেরে শাসক নেতাদের গালাগালি দিয়ে বলবেন— শাসনের যোগ্য মানুষকে তোমরা শাসন করোনি, তোমরাও মূর্খ।

মহাভারতে বিদুর মূর্খ সম্বন্ধে যত কথা বলেছেন, তাতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, লেখাপড়া না-জানা নিরক্ষর মানুষ মূর্খের সংজ্ঞার মধ্যেই আসেন না। বরঞ্চ মহাভারত তাঁদেরই মূর্খ বলতে চায়— যাঁরা লেখাপড়া করেছেন এবং স্বল্পবিদ্যাতেই যাঁদের মধ্যে ভয়ঙ্করী শক্তি জন্মেছে।

প্রাচীন ব্যক্তিরা বলেছেন, পেটে বিদ্যে না থাকা সত্ত্বেও যদি নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করতে চাও, যদি কবি-সাহিত্যিক হিসেবে নামও কিনতে চাও— যদ্যভ্যর্থয়সে শ্রুতেন রহিতঃ পাণ্ডিত্যমাপ্তুং বলাৎ— তাহলে তার একটা ভাল এবং সহজ উপায় আছে বলি— তুমি অতিপ্রসিদ্ধ স্মরণীয় ব্যক্তিদের ধরে-ধরে গালাগাল দাও আগে। যেমন ধরো— ব্যাস-বাল্মীকি এই সব মহাকবিদের সম্পর্কে উল্টোপাল্টা কথা বলে নিশ্চিন্তে গালাগাল কর— ব্যাসাদীন্ কবি-পুঙ্গবান্ অনুচিতৈর্বাক্যৈঃ সলীলং ক্ষিপন্। তারপর নিজের লেখা শ্লোক, কবিতা সোচ্চারে সবার সামনে সগর্বে পাঠ করো, কিন্তু চোখ বুজে পাঠ করো সেগুলো। অন্যেরা যেসব কাব্য-কবিতা লিখছে, সেগুলোর যথাসাধ্য নিন্দা করো বিনা প্ররোচনাতেই, আর সভা-সমিতিতে, বিদ্বৎসভায় বড় বড় পণ্ডিত মানুষের বিভিন্ন কথার প্রতিবাদ করে যাও নিরন্তর— কাব্যং ধিক্কুরু যৎ-পরৈ-র্বিরচিতং স্পর্ধস্ব সার্ধং বুধৈঃ — এইভাবে চললে সুস্থ বিদ্যা না থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়।

''নতুন কিছু করো দাদা নতুন কিছু করো। যদি কিছু না পারো তো বউকে ধরে মারো।'' প্রাচীনেরা বলেছেন— যেভাবে হোক যদি প্রসিদ্ধ পুরুষ হতে চাও তবে নতুন কিছু তোমায় করতেই হবে। হয় তুমি বাড়িতে মাঝে-মাঝেই বাসন-পত্র মাটিতে ফেলে ভাঙো, নয়তো কাপড়-জামা ছেঁড়ো কুচিকুচি করে, অথবা এমনও করতে পারো রাস্তায় গাধার পিঠে চড়ে যাতায়াত শুরু করো। এইরকম নতুন নতুন কাজ করলে তুমি খ্যাতিমান পুরুষ হবে— যেন কেনাপ্যুপায়েন প্রসিদ্ধঃ পুরুষো ভবেৎ। তবে এ তো গেল সাধারণ মানুষের সাধারণ উপায়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠা। ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যা পেটে নিয়ে বড় হয়ে ওঠার উপায় বলেছেন অন্য এক প্রাচীন কবি। বলেছেন— কিছু কিছু লোক আছেন, যাঁরা সভাস্থলে, বিদ্বৎসভায় অনেক বিবাদ করেন, কেননা অন্যের যশের কথা শুনলেই তাঁদের মাথা ধরে— যে সংসৎসু বিবাদিনঃ পরযশঃশূলেন শল্যাকুলাঃ। সাপের মাথার মণির একটা মিথ ব্যবহার করে কবি বোঝাতে চেয়েছেন— এঁদের কিন্তু একটা আলগা চটক আছে, চোখটায় সব সময়ই যেন একটা রাগ-রাগ ভাব, পণ্ডিত-সজ্জনের গুণ এঁরা অসাধারণ দক্ষতায় নিরাবরণ করে দিতে পারেন, অথবা আচ্ছাদন করতে পারেন আত্মস্তুতির গরিমায়— কুর্বন্তি স্বগুণস্তবেন গুণিনাং যত্নাদ্ গুণাচ্ছাদনম্। কবি মনে করেন এই ধরনের বিদ্যা সাপের মাথার মণিটির মতো শুধু পরের উদ্বেগ সৃষ্টি করে, এটাকে বিদ্যা বলে না।

তবে কি এটা মূর্খতা? না, আপনি একে সোজাসুজি মূর্খামি বলতে পারবেন না, কারণ এর পেটে কিছু বিদ্যে আছে। প্রাচীনেরা এই বিদ্যেটাকে কী চোখে দেখেছেন, সেটা বোঝা যায় আর এক মহাকবির কথায়। আত্মস্তুতি এবং আত্মপ্রশংসার নানা কিসিম আছে এবং তাতে যে বুদ্ধিমান মানুষেরও মন ভোলানো যায়, সেটা আজকের দিনের অঙ্গ। কিন্তু পুরাতনকালে আত্মস্তুতি ব্যাপারটা ভীষণ রকমের দুর্গুণ এবং মূর্খামি মনে করা হত। সেই মহাকবি লিখেছেন— কেন যে মানুষ আত্মস্তুতি করে বুঝে পাই না। এতে নিজের সুখও হয় না, নতুন কোনও সৌভাগ্যও আসে না। এখানে কবির উপমাটি ভয়ংকর। তিনি বলেছেন— নিজেই নিজের স্তন-মর্দন করে কুলকামিনী স্ত্রী কোন্ সুখ পায়! তাতে সুখও নেই, সৌভাগ্যও নেই— যথৈব চ কুলস্ত্রীণাং স্বয়ং স্বকুচমর্দনে। আজকাল অবশ্য আত্মস্তুতি করে এই স্বমর্দন-সুখ অনেকেই লাভ করছেন।

পুরাতন কবি একে যতই মূর্খামি মনে করুন, আসলে এটা এখন বিদ্যা। চতুরতার বিদ্যা। বর্তমান কালচারে যদি নিজেকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়, সঠিক বিদ্যে না থাকলেও যদি ওপরে উঠতে হয়, তাহলে গাইতে হবে, নিজের গুণ নিজে গাইতে হবে এমন ভাবেই, যার মধ্যে কথা, শব্দ কিছু নাও থাকতে পারে। নিজেকে জলে তৈলবিন্দুবৎ প্রসারিত করে মেলে ধরা— আমরা একেই আত্মস্তুতি বলতে চাই, অথচ প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরকম বিকীর্ণ আত্মপ্রশংসাকে রীতিমত ঘৃণা করতেন। বলতেন— আত্মশক্তি না থাকলেই এই মূর্খামি করতে হয়। তাঁরা বলতেন— কাদের জন্য খেটে মরছি আমরা, কাদের শিক্ষা দিচ্ছি, অ্যাঁ! একদল হল উদ্ধত মানুষ, যারা পরের উন্নতি দেখলে নিজেরা পাগল হয়ে যায়— কতিচিদুদ্ধত-নির্ভর-মৎসরাঃ। আর একদল আছে তারা সব সময়েই নিজের এবং নিজের কথার প্রশংসা করে চলেছে— কতিচিদ্ আত্মবচঃস্তুতিশালিনঃ। আর আরেক দল তো আছে নিরক্ষর মূর্খ, তাদের কথা আর কী বলব। সত্যি বলতে কি, কাদের জন্য এত খেটে মরছি দিনরাত— তদিহ সম্প্রতি কং প্রতি মে শ্রমঃ!

নিরক্ষর মূর্খের সঙ্গে পরশ্রীকাতর উদ্ধত ব্যক্তি এবং আত্মশংসী মানুষটি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হলেও বুঝতে পারি— এদের তিন জনের চরিত্র এক রকম নয়। নিরক্ষর মূর্খের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে যদি কোনও গোয়ার্তুমি না থাকে, তবে তাকে যা বোঝানো যায়, তাই বোঝে— এটা না হলে আমাদের

দেশে কোনও রাজনৈতিক ধূর্তেরা গদিতে বসতে পারতেন না। আর যদি গোয়ার্তুমি থাকে, তাহলে তাকে উপদেশ দিলে সে প্রচণ্ড খেপে যাবে এবং অবশেষে উচ্চতর, বলবত্তর তথা গোষ্ঠীবৃহত্তর মানুষের হাতে ধোপা-নাপিতসহ রসাতলে যাবে। এঁদের নিয়ে অবশ্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু কথঞ্চিৎ বিদ্যা এবং বেশির ভাগ অবিদ্যায় যিনি উদ্ধত হয়ে ওঠেন, তাঁকে সামাল দেবার কোনও উপায় কিছু নেই, যতক্ষণ সভায়, সমিতিতে বিদ্যাগোষ্ঠীতে যোগ্যতর ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি নিজের বিষোদ্গার করতে না পারছেন।

আসলে যোগ্যতরের ধীশক্তিকে পরাস্ত করার যে বৌদ্ধিক অক্ষমতা, তা থেকেই মাৎসর্য জন্মায় এবং সেই মাৎসর্যই ঔদ্ধত্যের রূপ নেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো মৎসরী ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করে পারবেন না বলেই তাঁকে বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে— তাঁকে সায় দিয়ে চলতে হবে। উদ্ধত মূর্খ মানুষকে যথাসম্ভব সায় দিয়ে চলতে-চলতে নিজের কথা বলা যায়— মূর্খং ছন্দানুবৃত্ত্যা চ। মূর্খ অথচ উদ্ধত-- এমন লোকেব কাজই হল বিনা কারণে বিবাদ বাধানো। সভা-সমিতিতে মূল বক্তার বক্তব্য শোনার পর যদি কোনও ভাবে প্রশ্নের সুযোগ থাকে, তবে এমন হতেই পারে যে বক্তা সময়াভাবে কতক খাঁটি কথা বলতে পারলেন না, অথবা যা বললেন, তার প্রসঙ্গান্তর অপেক্ষিত ছিল। সেখানে প্রশ্নও অনেক সুস্থিত হতে পারে। কিন্তু এমন প্রাশ্নিক আমি দেখেছি, যিনি অপ্রসঙ্গে, অনপেক্ষায় এমন বিহ্বল প্রশ্ন করেন, যা শোনার পর বক্তা-বেচারা চেয়ার-পারসনের চাদরের তলায় আশ্রয় খোঁজেন। আর মূল বক্তা যদি তখন উদ্ধত মূর্খের উত্তরে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন, তাহলে যা অবস্থা হতে পারে তার একটা নমুনা দিয়েছেন এক কবি। কবি বলেছেন— একটি বানর যদি হঠাৎ মদ্যপান করে বসে এবং তাব পরে যদি বানরটিকে একটি কাঁকড়াবিছে কামড়ায়— মর্কটস্য সুরাপানং তস্য বৃশ্চিকদংশনম্— তার ওপরে যদি আমার মূল বক্তাটি তাঁর প্রশ্নের উদ্ধত প্রত্যুত্তর দেন, তবে সেটা হবে সেই সুরাপীত, বৃশ্চিক-দষ্ট বানরের ওপর ভূতের আবেশ— এর পর যা ইচ্ছে তাই ঘটে যেতে পারে— যদ্‌বা তদ্‌বা ভবিষ্যতি।

আর বাকি রইলেন সেই অবিবেকী আত্মশংসী মানুষটি, নিজের কথা বলতে যাঁর গণ্ডদেশ স্ফীত হয়, পরের উৎকর্ষে যাঁর মাথা ধরে যায়, এমন মানুষকে সামলানো বড় কঠিন। দেখিয়ে-দেখিয়ে কাজ করা যার অভ্যাস, নিজের কথা বলে-বলে যাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়, উপযুক্ত এবং চোখ-কান-খোলা

কর্তৃপক্ষই তাকে আপন ঔদাসীন্যে পর্যুদস্ত করতে পারেন, না হলে এঁদেরই চিরকালীন বাজার। রাজসভায় এঁদের কদর, মন্ত্রীর কাছে এঁরাই তাড়াতাড়ি পৌঁছান, এবং এঁরাই কর্তৃপক্ষের নজর কাড়েন সবার আগে। তারপর যেদিন রাজার বোধোদয় হয়, মন্ত্রীর নজর পড়ে আরও উন্নততর আত্মশংসীর দিকে এবং কর্তৃপক্ষ যখন বোঝেন যে, তিনি কথা যত শুনেছেন, কাজ তত পাননি, তখনই আত্মশ্লাঘী মূর্খ মানুষের খানিক শিক্ষা হয়।

মূর্খের অনেক কিসিম শুনলাম, আরও অনেক কিসিম আছে, যা বলবার সময় আসবে পরে। অন্য কোনও অবসরে। আজকের এই মোহকলিল আত্মরতির দিনে বিদ্বান, বুদ্ধিমান হওয়াটাও খুব জটিলতা বলে মনে করি। বিশেষত পণ্ডিত-সজ্জনদের যত দেখছি, ততই আমার পুরাতন কালের কতিপয় বিষয়-রসিক অধ্যাপকদেব ওপর শ্রদ্ধা আরও বাড়ছে। তাতে নিজেকেও যেমন ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে, অপরদেরও তাই। অবশ্য বিদ্যাব প্রথমোন্মেষ যৌবনোদ্দীপ্ত বয়সে খানিকটা তাড়িয়ে নিয়ে যায় বটে, তাতে ঔদ্ধত্যও খানিকটা আসতে পারে আহার্য রূপসজ্জাব মতো, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যাই এক সময় তাকে আরও অভিনিবিষ্ট করে গভীর নির্জন বিদ্যাবসে, তখন নিজেকেই একটা আস্ত মূর্খ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এক কবি লিখেছেন— আমি যখন খানিকটা পড়াশুনা করে বেশ তৃপ্ত হলাম, তখন নিজেকে মদমত্ত হাতির মতো মনে হত। আরও খানিকটা জানার পর নিজেকে প্রায় সর্বজ্ঞই মনে হত, মনে হত— আমি বুঝি সবই জানি— তদা সর্বজ্ঞো'হস্মীতি-অভবদ্ অবলিপ্তং মম মনঃ। তারপর যখন বড় বড় পণ্ডিতের কাছে উপনিষণ্ণ হলাম, বুঝতে পারলাম অনন্ত বিদ্যাচর্যার ব্যাপ্তি কত হতে পারে, তখন থেকে নিজেকেও মূর্খ ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না, গর্ব-অহঙ্কারেব জ্বরটাও শরীর থেকে তদবধি নেমেছে— তদা মূর্খো'স্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ।

অথ দুর্নীতি-কথা

আমি জানি, এ-কথা বললে আমাকে আবারও লোকে সন্দেহ করবে। আমার ভাবনা নিয়ে সন্দেহ, চরিত্র নিয়ে সন্দেহ, এমনকী আমার স্বাভাবিক চিন্তার জগৎ নিয়ে সন্দেহ। আমি এতকাল যা দেখেছি— অধিকাংশ মানুষ চান— আমাদের এই পৃথিবীর মানুষ আরও সৎ হোক, আরও ভাল হোক, কোনও মিথ্যাচার যেন মানুষকে ক্লিন্ন না করে, লোভ, হিংসা, মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা যেন আমাদের গ্রাস না করে। হ্যাঁ! বাঁচার জন্য এই রকম একটা আদর্শ পরিবেশ আমরা চাই বটে, কিন্তু কোনও দিন পাই না। বাজারে গেলেই বৃদ্ধ বলেন— আরে মশাই! কালে কালে কী হল! চুরি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, হরণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এবারে মশাই! চলে যেতে পারলেই হয়। আমি প্রথম প্রথম ঠাট্টা করে বলতাম এগুলো না থাকলে কতগুলো সৎ লোকের কত ক্ষতি হয়ে যেত বলুন তো। এই যে যত

খবরের কাগজওয়ালারা, তারা যদি হরিনাম-সংকীর্তন, বাঙালির স্বাস্থ্যচর্চা এবং 'ডাবল্যু-টি-ও'র কর্মসমিতির কার্যবিবরণ দিত, তাহলে একান্ত বৈষ্ণব, স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং শিল্পপতিরা ছাড়া কয়জন সাধারণ মানুষ খবরের কাগজ পড়ত! এতগুলো টিভি চ্যানেলের কী হাল হত? পাড়ার আড্ডাখানাগুলোর গুষ্টিসুখ কোথায় যেত? বাসে-ট্রেনে লোকে কী আলোচনা করত? এই সব সাধারণ সৎ মানুষদের দৈনন্দিন জীবন কতটা পানসে হয়ে যেত ভাবতে পারেন?

আমার ঠাট্টা শুনে বৃদ্ধ মানুষটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমাকে নিতান্ত সমাজবোধহীন অন্তঃসত্ত্ব ব্যক্তি হিসেবে উপেক্ষা করে চলে গেছেন। তবু আমি বৃদ্ধকে বলিনি যে, আপনি কেন ওই ডাকাতি, ধর্ষণ এবং হরণের ঘটনাগুলি পড়েছেন। সেদিনের কাগজে শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা ছিল, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাফাই-কাহিনি ছিল। সে সব ছেড়ে আপনি কিনা...। বৃদ্ধকে এ কথাও বলিনি যে, আপনার আমলে কী ছিল মশাই! সকলে সাধু ছিলেন, ধর্ষণ-হরণ হত না, সকলে সত্য কথা বলত, আর সরকারি অফিসে ঘুষ বলে কিছু ছিল না? কর্পোরেশনের লোকেরা বিনা কোনও ইয়েতে বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করে দিত?

এই এতটুকু মুখপাতের পরেই আগে যা বলেছিলাম— আমার ভাবনা, চরিত্র এবং স্বাভাবিকতা নিয়ে সন্দেহ উঠবে। তবে কি আমি খুন-জখম, হরণ-ধর্ষণের ঘটনাগুলিকে উৎসাহ জোগাচ্ছি, নাকি এই সব খবরই আমার ভাল লাগে। যদি আমাকে সত্য কথা বলতে বলেন এবং যদি আপনারাও সত্য কথা বলেন, তাহলে নিশ্চয় বলব— এগুলিতে আমার-আপনার উৎসাহ না থাকলেও এই সব ঘটনাই আমরা পড়ি, দেখি এবং চর্চা করি। এগুলির মাধ্যমে মানুষের কোন প্রবৃত্তি তুষ্ট হয়, তা মনস্তাত্ত্বিকেরা জানেন, আমি বলব না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাব যে, এগুলি আজকের কোনও 'ফেনোমেনন' নয়, এগুলি চিরকাল আছে, ছিল এবং থাকবে। আমি এ কথাও বলে থাকি যে, ভগবান ব্রহ্মা শুধু কতকগুলি দেবতা এবং ঋষি সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অসুর, রাক্ষস, সাপ-শকুনও সৃষ্টি করেছিলেন, আর মানুষ সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর সবচেয়ে বড় মুন্সিয়ানা। মানুষের মধ্যে দেবতা-ঋষি, অসুর-রাক্ষস, সাপ-শকুন সকলের প্রতিচ্ছায়া আছে। আর মৎস্যপুরাণের সেই বিখ্যাত পৌরাণিক ঘটনাটা ভুলে যাবেন না: প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্রকে সন্তান সৃষ্টি করতে বললে তিনি যোগবলে কতকগুলি জরা-মরণহীন অমর্ত্য পুরুষ সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা কিন্তু

এই সৃষ্টিকর্মে এতটুকু খুশি হলেন না। বামদেবকে এই ধরনের সৃষ্টি করতে নিষেধ করে রসিক ঠাকুর ব্রহ্মা বললেন— দেখ বাছা! জরা-মরণহীন এক সম্পূর্ণ শুদ্ধা সৃষ্টি কখনও খুব ভাল হতে পারে না— নৈবংবিধা ভবেৎ সৃষ্টি র্জরামরণবর্জ্জিতা। পৃথিবীর যাবতীয় শুভ এবং কল্যাণকর বস্তু দিয়ে কখনও এই বিশাল সৃষ্টিকর্মের মাহাত্ম্য তৈরি হতে পারে না। জগতে ভাল থাকবে এবং তার পাশাপাশি মন্দও থাকবে— এই হল সৃষ্টির রহস্য।

সাধে কি আর সকল দেবতাকে ছেড়ে সর্বকালের এই পিতামহপ্রতিম মানুষটিকে সৃষ্টি-কার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্তত বাস্তববোধ অথচ হৃদয়ে মহাকবিত্ব না থাকলে ব্রহ্মা অত বড় দামি কথাটা বলতে পারতেন না। সত্যিই তো, এই জগতে যদি একটা লোকও মিথ্যা না বলত, মিথ্যাচার না করত, অন্যায় না করত, প্রত্যেকেই সৎ, সাধু, মহৎ এবং বদান্য হয়ে বসে থাকত তাহলে এই জগতের কোনও বৈচিত্র থাকত না, বিশেষত্বও থাকত না। সম্পূর্ণ জগৎটা সততা এবং সাধুতার গড্ডলিকায় এমন স্থির, জড় এবং নিষ্প্রাণ হয়ে উঠত যে, সে জগৎ রসিক-ভাবুক-শিল্পীজনের বাসযোগ্য হত না। পিতামহ ব্রহ্মার আশয় যদি ঠিক-ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে বুঝতে হবে সব কিছুরই প্রয়োজন আছে— ভাল-মন্দ, সাদা-কালো, সাধু-অসাধু— সকলেরই প্রয়োজন আছে— ভাল এবং সৎকে বোঝার জন্য মন্দ এবং অসতের প্রয়োজন আছে। আর যাঁরা বলেন, আগে এমন ছিল না, এখনই যত খারাপ হয়েছে, তাঁদের বলি— সব কালেই খারাপ ছিল, মন্দ ছিল, অসাধুতা ছিল এবং সেগুলি কাটিয়ে ওঠার রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগ্রাম চিরটা কাল চলেছে এবং এখনও তা চলছে, পরেও তাই চলবে।

আজকে যে বিষয় নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি, তার ইংরেজি প্রতিশব্দটা বেশ জুতসই বটে, কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃতে খুব ভাল প্রতিশব্দ নেই। কথাটা খুব বলি আমরা— 'করাপশন': 'করাপশনে' দেশ ভরে গেছে। 'করাপশন' কথাটার একটা সার্বিক ব্যাপ্তি আছে— এই ধরুন, সরকারি অফিসার ঘুষ খাচ্ছে, কিংবা মন্ত্রী-আমলা নিজের আখের গোছাচ্ছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফাঁকি দিচ্ছেন— এ সবই কিন্তু 'করাপশনের' আওতায় পড়বে। এমনকী সক্রেটিস, বুদ্ধ অথবা চৈতন্যের মতো— এমনকী এত বড় মানুষ না হলেও নিদেনপক্ষে যদি রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা ডিরোজিওর মতো সংস্কারক মানুষ যদি স্বসময়ের যুবা পুরুষদের নিজস্ব বৈপ্লবিক ভাবনা-চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে থাকেন, তবে

সেটাও কিন্তু যুব সমাজকে 'করাপ্ট' করার ভাবনা বলে চিহ্নিত হয়েছে। সংস্কৃত বা বাংলায় এই শব্দের কী মানে করবেন— অসাধুতা? অন্যায় আচরণ? অধর্ম? অথবা এগুলো সবই।

দেখুন, চুরি-ডাকাতি অথবা খুন-রাহাজানিকে কিন্তু 'করাপশন' বলে না, সেগুলো 'ক্রাইম', কিন্তু একজন সরকারি অফিসার চুরি করলে, অথবা ব্যবসার প্রয়োজনে বা আত্মোন্নতির প্রয়োজনে একজন সমৃদ্ধ মানুষ যদি ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে কাউকে খুন করায় অথবা রাজনৈতিক ভোট-সিদ্ধির জন্য একজন সবলে ধর্ষিতা নারীকে যদি দুশ্চরিত্রার অপবাদ দেওয়া হয়, সেগুলি কিন্তু 'করাপশন'। মূলত এগুলি 'ক্রাইম' হলেও বিশদর্থে এগুলি 'করাপশনে'র আওতায় পড়ে। তার মানে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল যে, চুরি, খুন-জখম, রাহাজানি অথবা ধর্ষণ যদি একটা সমাজের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ হয়ে দাঁড়ায়, তখন আবারও কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত কথাটা বারবার শোনা যাবে— 'করাপশনে' দেশ ভরে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি 'ক্রাইম' এবং 'করাপশনে'র মধ্যে এক চুলের একটা তফাত আছে। 'ক্রাইম' বস্তুটা অনেক সময়েই একটা ব্যক্তিগত স্তরে নিহিত থাকে কিন্তু 'করাপশন' ব্যাপারটা অনেকটাই সামাজিক এবং বৃহত্তর স্তরে চলে যায়।

আজকের দিকে আপনারা তো মনু-মহারাজের নাম শুনলেই খানিকটা গাল-মন্দ করে থাকেন। হ্যাঁ, এ-কথাও মানি যে স্ত্রী এবং শূদ্রদের ব্যাপারে তাঁর কথাবার্তা এবং ভাবভঙ্গি খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু এ-ছাড়াও তো বিষয় আছে। সে-সব জায়গায় সেই কালের দিনে মনু-মহারাজের বিশ্লেষণ শুনলে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তা সেটা খ্রিস্টীয় ২য়/৩য় শতাব্দী হবে, সেইকালে মনু বলছেন— চোর দু'রকমের হয়।— প্রকাশ এবং অপ্রকাশ— দ্বিবিধাংস্তস্করান্ বিদ্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকান্। এই দুই প্রকারের মধ্যে যারা অপ্রকাশ চোর— অর্থাৎ যারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে, প্রচ্ছন্ন রাখে, কাজ সারা হয়ে গেলেই যারা বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়, তাদের তো বোঝা যায়। তারা মানুষের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে এবং সে-সব অপহরণ করার যন্ত্রপাতিও আছে— কেউ বাড়িতে সিঁদ কাটবে, সন্ধিভেদক, কেউ বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পথিকের পকেট কাটবে অথবা সংস্কৃত প্রাকৃত শব্দের বিবর্তন মেনে গ্রন্থি-গণ্ঠি-গাঁঠ কাটবে— অর্থাৎ গ্রন্থিচ্ছেদক।

এই অপ্রকাশ বা 'প্রচ্ছন্নবঞ্চক' গাঁঠকাটা তথা সিঁদেল চোরদের নিয়ে মনু যত চিন্তা করেছেন, যত শব্দ ব্যয় করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা

করেছেন প্রকাশ্য চোর বা প্রকাশ-চোরদের নিয়ে। আমি আগে ভাবতুম— প্রকাশ-চোর বলছেন কেন মনু, এরা কি প্রকাশ্যে লোক দেখিয়ে চুরি করে। পরে বুঝেছি যে, বেশ বুদ্ধি করেই তিনি কথাটা বলেছেন, কেননা এই হল 'সেই করাপশনের' জায়গা, যেখানে চুরির ব্যাপারটা সকলের জানা— 'প্রকাশ' কথাটার তাৎপর্য এইখানেই। আজকের দিনে সরকারি স্তরে কতকগুলো জায়গা জানাই আছে— জানাই আছে যে, এই সব দপ্তরে চুরি হয়, টাকার লেনদেন হয়। লোকে জেনেই পকেটে বেশি টাকা নিয়ে বেরোন যাতে কলকাতা কর্পোরেশন, এক্সাইজ, কাস্টমস্, সেলস্ ট্যাক্স-এর দপ্তরে নিজের কর্মযোগ ব্যাহত না হয়। এই যে জানাই আছে— এখানে নিজের কাজ করাতে গেলে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা ছড়াতে হবে— এটাই প্রকাশ চৌর্য, হয়তো মনুর মতে এখনকার কর্মরত পুরুষেরাই প্রকাশ-চোর।

মনু তাঁর সময়ের 'করাপশন' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকাশ-চোরদের একটা সাধারণ উপাধি দিয়েছেন এবং সেই উপাধিটি এতটাই সর্বাশ্লেষী যে সমস্ত দপ্তরের তাবৎ অসাধু কর্মচারীরা এই শব্দের আওতায় এসে যাবেন। মনু বলেছেন— 'উৎকোচকাঃ' অর্থাৎ যারা ঘুষ নেন, কার্যার্থী ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে যারা অন্যায় অযৌক্তিক কাজটি করে দেন। 'উৎকোচ' শব্দটা এতটাই বিশদ ব্যাপ্ত শব্দ যে, টাকা দিয়ে বাড়ির অন্যায় প্ল্যান স্যাংশন করা, অথবা টাকার বদলে মদের দোকানের লাইসেন্স বার করাটাই শুধু উৎকোচের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় না, একজন মানুষ যদি দারোয়ানকে টাকা দিয়ে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান, তবে সেটাও উৎকোচের আওতায় পড়ে।

এ-ছাড়াও আর এক ধরনের প্রকাশ-চোর আছে— যাদের মনু বলেছেন 'ঔপধিক'। এটা যে কতখানি আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন এক শব্দপ্রয়োগ, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আজকাল আমাদের শহর-গ্রাম-আধা শহরে এলাকাভিত্তিক রাজত্ব করেন 'তোলাবাজ' নামে এক বিচিত্র মানবাংশ। এরা কখনও সরাসরি রাজনৈতিক দলের লোক, কখনও বা রাজনীতির মদতে পুষ্ট, এরা বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেন মানুষের কাছ থেকে। মনু হয়তো 'তোলাবাজ' দেখেননি সেই অর্থে, কিন্তু সেই যুগের সমাজেও এমন খণ্ডাংশ একটা ছিল, যারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত। শুধু টাকা আদায় করা নয়, এই শব্দের টীকা করতে গিয়ে টীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখেছেন— 'ঔপধিক' হল

সেই ধরনের প্রবঞ্চক যারা ভয় দেখিয়ে পরধন হরণ করে এবং সেই ধনেই জীবিকা নির্বাহ করে। অতি প্রাচীন কালেও যে এই ধরনের ত্রাসসৃষ্টিকারী মানুষের অভাব ছিল না, মনুর লিস্টিতে 'ঔপধিক' শব্দটা থেকে তা বোঝা যায়।

রাজকর্মে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের মধ্যে যে 'করাপশন' ভীষণভাবে চলে— এ-কথা মনু নানাভাবেই বুঝেছেন, সে-কথা সময়মতো বলব। কিন্তু সেকালে আরও যে-সব জায়গায় 'করাপশন'-এর নমুনা দেখেছেন মনু তা প্রধানত ব্যবসার ক্ষেত্রে, যাকে মনু বলেছেন— নানা পণ্যোপজীবিনঃ— অর্থাৎ যে-সব ব্যবসাদারেরা পণ্যের মূল্য এবং পরিমাণের ব্যাপারে বঞ্চনা করে। আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে, যাতে মনুর নিন্দাকারীরা আশ্চর্য হবেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানমঞ্চের মানুষেরা খুশি হবেন, সেটা হল— মনু বলছেন— এরাও এক ধবনের প্রকাশ-চোর, যারা এই ধরনের মিথ্যে কথার স্তোকবাক্য উচ্চারণ করে বলে— তোমার প্রচুর ধন-পুত্র-লক্ষ্মী লাভ হবে। মনু এঁদের নাম দিয়েছেন 'মঙ্গলাদেশবৃত্ত' এবং মনুব মতে এবা লোক-ঠকানো প্রবঞ্চক। এমনকী তাদের ওপরেও মনু খুশি নন, যারা হাতের রেখা দেখে মানুষের শুভাশুভ ফল বলে জীবিকা নির্বাহ করেন। মনুর ভাব দেখে মনে হয়— জ্যোতির্বিদ্যাকুশল জ্যোতিষী ছাড়াও আবও এক ধরনের মানুষ ছিলেন যারা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতেন— যাদেব পারিভাষিক নাম 'ঈক্ষণিক'। মনু এঁদের প্রবঞ্চক তথা প্রকাশ-চোরদের অন্যতম বলে নির্ধারণ করেছেন।

'কবাপশন'-এর আরও যে-সব জায়গা আমরা আধুনিককালেও চিহ্নিত করি, তার মধ্যে অন্যতম স্থান হল বৈদ্য-চিকিৎসকদের ক্ষেত্র। এই গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য মাথায় রেখেও আমরা এখনও বলতে পারি না যে আমাদের হাসপাতালগুলি অথবা আমাদের চিকিৎসক-কুল সর্বথা দুর্নীতিমুক্ত। সত্যি বলতে হলে বলতে হয়— এ বিষয়ে আমরা মনুর সময়-কাল থেকে দু-হাজার বছর পেরিয়ে এসেও প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। মনুও চিকিৎসকদের দুষছেন, আমাদের মতো করেই শত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও চিকিৎসকদের একাংশের ওপর সমস্ত দুর্নীতির দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। শ্রদ্ধার কথাটা এই জন্য বলছি যে, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ এই দুই ধরনের প্রবঞ্চককে প্রথম দফায় চোর বললেও তালিকা করার সময় মনু তাঁদের বলেছেন— সমাজের কাঁটা— প্রকাশান্ লোককন্টকান্। তার মধ্যেও আবার ডাক্তার-বদ্যি-চিকিৎসকদের কথা বলার সময় মনু চিকিৎসকদের বিশেষণ হিসেবে যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটার মধ্যে এই ইঙ্গিতটা আছে

যে সকল চিকিৎসকই এমন নন। মনু বলেছেন— ঠিক ঠিক কাজ করছেন না এমন চিকিৎসকেরাও এই সমাজের কাঁটা, তাঁরাও অর্থগৃধ্নুতার দ্বারা প্রবঞ্চনা করছেন সমাজকে— অসম্যক্‌কারিণশ্চৈব... চিকিৎসকাঃ।

চিকিৎসকদের কথায় পরে আবার আসব। মূল প্রস্তাবের ভূমিকা রচনা করার সময়েই মনুর কথা এসে গেল। তাই কথাটা শেষ না করে অন্য কথা আরম্ভ করতে পারছিলাম না। মনুর যুক্তিমত প্রকাশ-চোরদের প্রসঙ্গ উদ্ধার করে আমরা শুধু বোঝাতে চাইলাম যে, তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'করাপশন' বলতে আমরা যা বুঝি, তার খানিকটা অন্তত তাঁর সময় এবং যুক্তিমত বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সময় এবং যুক্তি তো বুঝতেই হবে, যেমন ধরুন পাশা খেলা বা জুয়া খেলা আজকের দিনে হলেও তার কোনও 'অফিসিয়াল' নিয়মকানুন নেই, কিন্তু সে যুগে তা ছিল। ফলে করাপশন-এব একটা জায়গা ছিল এই পাশা খেলার আসরগুলি। বেশ জুত করেই তখনকার দিনে পাশাখেলা হত এবং তা খেলা হত বাজি ধরে। খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই পাশাখেলা নিয়ে একটা সম্পূর্ণ সূক্ত আছে এবং সেখানে পাশায়-হারা জুয়াড়ির এমন আতান্তরের কথাও আছে, যাতে মনে হয় বাজি ফেলে খেলায় হারার পর জুয়াড়ি যদি প্রতিজ্ঞাত অর্থ প্রতিপক্ষকে না দিত, তবে রাজ-দরবারে নালিশ করা যেত। ঋগ্‌বেদের কালেই এই দ্যূতক্রীড়ার এমন আইনসিদ্ধ প্রযুক্তি দেখতে পাচ্ছি যে, পাশাড়ু জুয়াড়ির বাপ-ভাই-মা জুয়াড়ির ওপর রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। নালিশের জেরে রাজপুরুষ অথবা প্রতিপক্ষ জুয়াড়ি জুয়াড়ির বাড়িতে চলে আসছে এবং জুয়াড়ির বাপ-মা-ভাই হতচ্ছেদ্দা করে বলছে— আমরা একে চিনি না, একে বেঁধে নিয়ে যান আপনারা— পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়ত বদ্ধমেনম্।

লক্ষণীয় বিষয় হল, বেদের কাল থেকে বৃহদ্দেবতার কাল, আর মহাভারতের কাল থেকে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক রচনার কাল— এই বিরাট সময় জুড়ে যে পাশাখেলার রমরমা দেখা যায়, তাতে এটুকু পরিষ্কার যে, বিত্তশালী, মধ্যবিত্ত এবং গরিব মানুষ— সকলের কাছেই পাশা খেলার একটা বিরাট জগৎ ছিল, যাকে মৃচ্ছকটিক সাধারণভাবে বলেছে— দাবা-পাশার জগৎটা হল আসলে মানুষের কাছে সিংহাসনহীন রাজ্যপাট— দ্যূতং হি নাম পুরুষস্য অসিংহাসনং রাজ্যম্। মনে রাখতে হবে পাশাখেলার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সভাগৃহ থাকত, সেই সভাগৃহের মালিক থাকত, সেখানে বাজি ধরে দ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বীরা

পাশা খেলতেন এবং তাতে খেলার নিয়ম এবং নিয়ম-ভাঙার ফলে 'করাপশন'-এরও জায়গা ছিল। মনে আছে, মৃচ্ছকটিক নাটকে সংবাহক নামে সেই মানুষটি যখন পাশা খেলায় দশ মোহর হেরে দ্যুতসভা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন দ্যুতসভার মালিক এবং সংবাহকের খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী মাথুর দু'জনেই তাকে তাড়া করেছিল। সে অবস্থায় কোথাও আশ্রয় পায়নি সংবাহক। অবশেষে যে তাকে বাঁচাতে এসেছিল, সেও কিন্তু এক জুয়াড়ি। মনু মহারাজ দেখেছিলেন যে জগতে জুয়াড়িরাই নায়ক এবং প্রতিনায়ক, সেখানে 'করাপশন' তথা প্রকাশ-চৌর্যই হয়তো সাধারণ নিয়ম। দাবা-পাশা-তাসের জায়গায় করাপশন-এর ব্যাপারটি যদি এখনও বোধগম্য না হয়ে থাকে, তবে পাঠক মহাশয়কে আজকের দিনে পাড়ায় পাড়ায় 'চিট ফান্ড', 'বেসরকারি লটারি-খেলা' এবং অল্প বিনিয়োগে বৃহদ্-বস্তু-লাভের শীঘ্র সুবর্ণ সুযোগের জায়গাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই, তাহলেই বুঝতে পারবেন 'করাপশন' কেমন করে হয়।

আজকের দিনের চেতনা এবং গবেষণার দৃষ্টিতে মনু-কথিত দুর্নীতিগুলির মধ্যে রাজকর্মে নিযুক্ত রাজপুরুষের অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্য কিছু হয়তো 'করাপশন' বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সামাজিক নীতি-নিয়ম এবং অর্থের দানাদান-সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলি তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল করলে সে-কালের 'করাপশন'-এর দৃষ্টান্তগুলিও সঠিক বোঝা যাবে। একথা মানতেই হবে যে, সুপ্রাচীনকালে যখন আইনগুলিই ভাল করে তৈরি হয়নি, তখন 'করাপশন' ব্যাপারটাকেও তেমন করে ধরা যায় না। আর আগেই তো বলেছি যে, অভাবের তাড়নায় বা স্বভাবের তাড়নায় যে চুরি করছে, তাকে 'করাপশন' বলা যায় না, এমনকী ইহজগতে বা পরকালের নরকে চোরকে ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলে শাস্তি দিলেও সে পাপ 'করাপশন' নয়। বরঞ্চ 'করাপশন'-এর প্রথম অর্থটা সেইখানেই সবচেয়ে প্রযুক্ত হবে, যেখানে আইন-বহির্ভূত খাতে টাকা-পয়সার লেনদেন হচ্ছে। এমনকী টাকা-পয়সাই বা কেন শুধু, এই আইন-বহির্ভূত ঘটনা যদি পণ্য-বিনিময়ের ক্ষেত্রেও ঘটে তবে তাকেও 'করাপশন' বলা যায়। যেমন খোদ ঋগ্‌বেদের সত্য-যুগেও যে চুরির ঘটনা ঘটেছে, তাতে শাস্তি ছিল সূর্যের তাপ— রূপক ভাঙলে সেটাকে ফুটন্ত তেলের কড়াই বলতেও আপত্তি নেই। কিন্তু এটা 'করাপশন' নয়। বরঞ্চ লোকের বিশ্বাস ভাঙিয়ে ইন্দ্রমূর্তি বিক্রি করার যে ঘটনাটা ঋগ্‌বেদে আছে, সেটাকে আমরা স্বচ্ছন্দে 'করাপশন' বলতে পারি।

অনেকটাই এ-ঘটনা আমাদের কেওড়াতলা শ্মশানের শবলগ্ন ফুল-বিছানা-খাটের কথা মনে করিয়ে দেয়। এমনই শুনতাম যে, নগরের শ্মশানে শবদেহের সঙ্গে যে ফুল-বিছানা-খাট আসে, তার ফুলগুলি কিছুক্ষণের মধ্যে পাশের বাজারে বিক্রি হয়ে যায়, খাট এবং বিছানাও আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় পুনরায় বিক্রির জন্য। ঋগ্‌বেদে দেখছি— লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইন্দ্রের মূর্তি ঘরে রাখলে শত্রুনাশ হয়। এই বিশ্বাসের ফলে ইন্দ্রের মূর্তি কেনা-বেচা হত। তা একজন বিক্রেতা অনেকগুলি ইন্দ্রের মূর্তি তৈরি করে, লোকের কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু বিক্রির সময় লোভে পড়ে কম দামেই মূর্তিগুলি ছেড়ে দিয়েছিল। পরে সে ভাবল— আরও অনেক লাভ হত, নেহাতই বোকামি হয়ে গেছে অত কম পয়সায় মূর্তি বেচে। সে এবার ক্রেতার কাছে গিয়ে বলছে আমি ওই মূর্তি তোমার কাছে বিক্রি করিনি, তুমি আমার মূর্তি ফেরত দাও, নয়তো বেশি দাম দাও— ভূয়সা বস্নমরচৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্। বৈদিক এই ক্রেতা ভদ্রলোকও কম পাটোয়ারি-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ নন, তিনি বললেন— এই এটুকুখানি ইন্দ্রমূর্তির জন্য যা দাম দিয়েছি, অনেক দিয়েছি, তাছাড়া তোমার সঙ্গে যা কথা হয়েছে, তার ওপরে একটি পয়সাও দেব না। ক্রেতা নিজের কথায় গ্যাঁট হয়ে বসে রইল— স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীৎ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এর পর যেন অদ্ভুত একটা নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বললেন— যারা দীন এবং যারা দক্ষ, তারা দুই পক্ষই পণ্য-মূল্যকে নিজের পক্ষে দোহন করে— দীনা দক্ষা বিদুহন্তি প্রবাণম্।

দেখুন, বৈদিক শব্দ-পঙ্‌ক্তির সঙ্গে টীকাকার সায়নের মোটামুটি সাযুজ্য রেখে একটা অর্থ তো সাজিয়ে দিলাম বটে, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদজ্ঞ অভিজিৎ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখলাম যে বৈদিক ঋষির এই এক যে বৈদিক ঋষির এই এক পঙ্‌ক্তি মন্ত্র-দর্শনের মধ্যে গভীর অর্থ আছে— বিশ্বব্যাপী পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা এই শেষ পঙ্‌ক্তি নিয়ে মাথা কুটে মরেছেন। এক জাপানি বেদজ্ঞ, যাঁর নাম তোশি ফুমি গোতো (Toshi Fumi Goto), তিনি একটা গোটা প্রবন্ধই লিখে ফেলেছেন ওই শেষ রহস্য-পঙ্‌ক্তির ওপর 'বিদুহন্তি প্রবাণম্'। অত কথা লিখতে গেলে এই প্রবন্ধ শেষ হবে না। তবে এইটুকু বলা দরকার, অতিশয় বিজ্ঞ জার্মান এবং ইংরেজ পণ্ডিতেরা 'প্রবাণম্' শব্দটির আরও একটা রূপ দেখেছেন। এটা ঠিক অন্যতর এক পাঠ নয়, অন্যতর এক রূপ। ওঁরা বলেছেন '(প্র)-বাণম্' শব্দটা '(প্র)-পাণম্'-এ

হতে পারে। কথাটা এইজন্যে এসেছে যে, গ্রিফিফ্থ সাহেব অথবা গেলড্‌নার সাহেব যেখানে ইংরেজি কিংবা জার্মান অনুবাদ করতে গিয়ে 'দোহন' (দুহন্তি) ক্রিয়ার সঙ্গে তাল রেখে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন এইভাবে যে— simple and clever both milk out the udder— অর্থাৎ সরল এবং চতুর দুই জনেই গোরুর আলান দুইয়ে নিচ্ছে, সেখানে ইন্দ্রমূর্তির কেনা-বেচার তাৎপর্যটাই হারিয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বুঝেছেন যে, ঋষির রহস্য আরও গভীরে এবং তা শব্দবোধের ব্যাপার। ওঁরা মনে করেন— শব্দটা যদি 'বাণ' হয় তবে বণিক্ কথাটাও একই ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে, আর সেটা যদি 'পাণ' হয়, তবে পণী, পণ্য, পণম, বিপণন, প্রপণন এই সব শব্দের অর্থ ওই পাণ-কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। এফ বি. জে. কয়পার সাহেব আমাদের ভাগ্যে আজও বেঁচে আছেন। তিনি আধুনিক গবেষণার সমস্ত সূত্র বিচার করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বৈদিক শব্দটা সম্ভবত '(বিদুহন্তি প্র)' পাণম্-ই হবে এবং তার প্রাচীন অর্থ হবে কেনার মূল্য, কেননা একেবারে মূল ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষায় এই শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ (vafna: price, value) রয়ে গেছে, যে শব্দ থেকে 'পাণ' অথবা কথঞ্চিৎ দূরগত অনার্যোচিত উচ্চারণে তা 'বাণ' হয়ে গেছে।

আমরা যে এতক্ষণ ধরে ভাষাতত্ত্বের মধ্যে শব্দসন্ধান করে যাচ্ছি তার কারণ একটাই। এখানে ইন্দ্রমূর্তির বিক্রেতা মানুষটি বোধহয় দীন, অর্থাৎ সে গরিবও বটে, সরলও বটে। আর ক্রেতা ভদ্রলোক, তাঁর টাকা-পয়সার সম্পন্নতা কতটুকু আছে তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সে চতুর বটে। বৈদিক ভাষায় যেটা দক্ষ। গ্রিফিফ্থ এবং গেলড্‌নারের অনুবাদে এই ক্রেতা ভদ্রলোক এতটাই চতুর যে, তিনি খুশি হয়ে উঠছেন— ভাগ্যিস্ তিনি ইন্দ্রমূর্তিটি কেনেননি অথবা কেনার পরও বিক্রেতার চাপে পড়ে আর বেশি পয়সা দেননি। বৈদিক পঙ্‌ক্তিতে এতটা পর্যন্তও কোনও দুর্নীতির ব্যাপার নেই, ব্যাপারটা পণ্যবস্তুর মূল্য নিয়ে দরকষাকষি— যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষই পরস্পরকে দুইয়ে নিতে চায়— বি দুহন্তি প্র পাণম্— পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করতে চায়। কিন্তু এর পরের মন্ত্রেই টের পাওয়া যাবে যে, সেই বেদের কালেও ক্যাওড়াতলা শ্মশানের মতো বিক্রীত বস্তুর আবর্তন ঘটত।

পরের মন্ত্রে দেখা যাচ্ছে— ইন্দ্রমূর্তির বিক্রেতা হেঁকে বলছে— কে আমার এই ইন্দ্রকে দশটা গোরু দিয়ে কিনবে গো— ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ। অসুররাজ বৃত্রের মতো বড় শত্রুকেও নাশ করবে এই ইন্দ্র। তোমাদের

শত্রুবধ হয়ে গেলে আবার এই ইন্দ্রমূর্তি আমায় ফিরিয়ে দেবে— যদা বৃত্রানি জংঘনদ্ অথৈনং মে পুনর্দদৎ। এই হল ক্যাওড়াতলা শ্মশানের মতো সেই ঋগ্বৈদিক স্থান। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বিক্রেতা মানুষের গভীর বিশ্বাসের জায়গাটার আর্থিক ফায়দা তুলতে চাইছে। সে-যুগে সম্পদ অথবা বিত্ত হিসেবে এক-একটা গোরুর মূল্য কম ছিল না। সেই গোরু দশ-দশটার বিনিময়ে একটা ইন্দ্রমূর্তি— এটা বেশ চড়া দামই বটে, আর সেই জন্যেই হয়তো আগের মন্ত্রের ক্রেতা মূর্তিটা না কিনে বড় খুশি হয়ে গিয়েছিল। অথবা কম দামে কিনে আর একটি পয়সাও বাড়তি দেয়নি। কিন্তু দীন, সরল বিক্রেতাও দক্ষ হয়ে উঠেছে বুঝি। সে তার পণ্যের দামটি চড়া হাঁকছে বটে। কিন্তু পরের কথাতে সে তার দরকষাকষির সম্ভাবনাটুকু তো বজায় রেখেইছে, উপরন্তু কাজ হয়ে গেলে তাকেই পণ্য ফেরত দেবার মধ্যে আধুনিক শ্মশানের দুর্নীতিটুকুও আছে। এটা ঠিক ভাড়া খাটানোও নয়। লোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একই জিনিস বার-বার বিক্রি করার মধ্যে যে দুর্নীতি আছে, এটাকেই বিশদর্থে 'করাপশন' বলা যায়।

তবু বলি, বৈদিক কালে আইনের গ্রন্থি তেমন শক্ত হয়নি, আর 'করাপশন'-এর ক্ষেত্রগুলিও তেমন স্পষ্ট নয়। বস্তুত মানুষ তো নিজে-নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় না। একটি মানুষ তার পরিবার, সমাজ এবং সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু রাজশাসন এবং শাসনাধিকারে অধিষ্ঠিত কর্মচারী যদি শাসনের শিথিলতা বুঝে ব্যক্তিগত উপার্জনে মন দেয় এবং অন্যদিকে সামাজিক একক হিসেবে একজন মানুষও যখন আইনের বাইরে এসে ব্যক্তিগত সুযোগ গ্রহণ করে, তখনই দুর্নীতির জায়গা স্পষ্ট হয়ে ওঠে উভয়ত। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক জীবনে আইন-বহির্ভূত অর্থের দান এবং আদান, সোজা কথায়— ঘুষ দিয়ে সুযোগ কেনা— এটাই যদিও দুর্নীতি বা 'করাপশন'-এর সবচেয়ে প্রচলিত রীতি, কিন্তু এমনও দুর্নীতি আছে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, যেমন গভীরে তার নিঃশব্দ পদ-সংক্রমণ, তেমনই ব্যাপ্ত তার জাল। অধিক অর্থের বিনিময়ে সুযোগ কেনার যে জায়গাটা, সেখানে কখনও কাজ করে অজ্ঞানতা বা অকর্মণ্যতা, আবার কখনও কাজ করে স্বজন-পোষণ, ব্যক্তিগত অসুবিধে-সুবিধে এবং কর্তব্যে ফাঁকি দেয়া, এমনকী জাতি-বর্ণের বৈষম্যও কখনও দুর্নীতির জন্ম দেয়।

এমন অবশ্য হতেই পারে যে, একজনের সংসারের টানাটানি, কম মাইনে পাওয়া, জীবন-ধারণের দৈনন্দিন গ্লানি থেকে ব্যক্তিগত দুর্নীতির জন্ম হয়, অথবা এমন হতেই পারে যে, দক্ষ এবং কর্মকুশল এক ব্যক্তিও বহুল দুর্নীতির জায়গায় কাজ করতে এসে পারস্পরিক সংক্রমণে নিজেও দুর্নীতি-পরায়ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু পণ্ডিত-সুজনেরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, দুর্নীতির পিছনে আছে যূথবদ্ধ মানুষের মনস্তত্ত্ব, যা একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে পূর্বাহ্নেই দূষিত করে রেখেছে। যে কোনও বড় দুর্নীতিচক্রের পিছনে এমন একটা পূর্বাবস্থা থাকবেই, যেখানে সরকারে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি— সে গণতন্ত্রেই হোক বা রাজতন্ত্রে— সেই ব্যক্তির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এবং সে নিজের স্বার্থে এবং সুযোগ-সন্ধানীর স্বার্থে নির্ধারিত পথের বাইরে চলাফেলা করতে পারে।

দুর্নীতি কেন হয়, করাপশন ব্যাপারটার নিদান কী, এই গবেষণার খুব বেশি প্রয়োজন নেই এখানে। বরঞ্চ বলতে চাই— করাপশন-এর সমস্ত ঘটনাই প্রায় আমাদের সভ্যতার সমবয়সি। আর শুধু ভারতবর্ষ কেন, যে কোনও প্রাচীন সভ্যতা— তা গ্রিস দেশেরই হোক অথবা মিশর, তা অ্যাসিরীয় সভ্যতাই হোক অথবা ভারতীয়— সব জায়গাতেই দুর্নীতি ছিল, ঘুষও চলত। অ্যাথেনীয় বিচার-ব্যবস্থায় বিচার-মণ্ডলে অবস্থিত 'জুরি'দের ঘুষ দিয়ে স্বানুকূলে নিয়ে আসার মতো দুর্নীতির রাজ ছিল সেকালে। সব চেয়ে বড় কথা, ঘুষ খাওয়া বা দেওয়া যেখানে অনেকটাই ব্যক্তিগত অথবা একটি প্রতিষ্ঠানের গোষ্ঠীর মধ্যে এই ব্যবহার চলে, সেখানে প্রাচীনতম সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় ঘুষের কারবারও চলত, বিশেষত ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পররাষ্ট্র বা বিদেশি শক্তিকেও ঘুষ দিত, কখনও বা নতুন রাজনৈতিক শক্তি অথবা জমিদার-তন্ত্র— নিজস্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদে ক্ষয়িষ্ণু বা তুলনামূলকভাবে বলবত্তর সহায়কেও ঘুষ দিত। এসব দুর্নীতির ঘটনা বিদেশি সভ্যতায় অনেক বেশি ঘটেছে, তবে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় তেমন করে ঘটেনি। বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তথা উপনিষদেও সত্য, ঋত এবং ত্যাগের এত মাহাত্ম্য শোনা যায় যে, রাজাদের অথবা বৈদিক আমলে প্রচলিত গোষ্ঠীগুলির পক্ষে ঘুষ দিয়ে নিজেদের রাজত্ব বা গোষ্ঠীতন্ত্র কায়েম করতে হয়নি। খ্রিস্ট পরবর্তী সময়ের সাহিত্যে, বিশেষত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্বলতর রাজা সন্ধি-বিগ্রহের প্রয়োজনে বলবত্তর রাজাকে ভূমি-হিরণ্যের বিনিময়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসছেন, এমন পরামর্শ আছে। তবে কৌটিল্যের এই বিনিময় পদ্ধতি অনেকটাই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে, এটা ঠিক রাজনৈতিক 'করাপশন' নয়।

প্রাচীন যুগে রাজতন্ত্র ছিল, অতএব রাজতন্ত্রে কী ধরনের 'করাপশন' চলত, তারই ইঙ্গিতটা প্রথম দেওয়া দরকার এবং সে ইঙ্গিতটা মনু-মহারাজ বেশ স্পষ্ট করেই দিয়েছেন। মনু বলেছেন— অন্তত আঠারোটা দোষের মধ্যে একটা-না-একটা রাজাদের গ্রাস করে বসে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম চরম দোষে একটা হল 'অর্থদূষণ'। সোজা কথায় রাজার 'অর্থদূষণ' বলতে বোঝায়— রাজকোষে জমা-পড়া অর্থের অপহরণ এবং যে অর্থ যাকে দিতে হবে, সেই অর্থ পুরোটা তাকে না দিয়ে নিজে ভোগ করা— অর্থ দূষণম্ অর্থানাম্ অপহরণম্, দেয়ানাম্ অদানম্। বলতে পারেন, রাজতন্ত্রে রাজাই সব, তাঁর যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। সবিনয়ে জানাই— প্রাচীন নির্দেশ এমন ছিল না। রাজকোষে যে অর্থ জমা পড়েছে, তা রাজকর বাবদ প্রজাদের দেওয়া অর্থ, তার আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্ম হিসেব রাখা হত। সেখানে যে অর্থ জমা পড়ল, তার অর্ধেক লিখিয়ে অর্ধেক আত্মসাৎ করা অথবা জনকল্যাণমূলক কর্ম যা করণীয় ছিল, তা না করে নিজের কাজে লাগানোর ব্যাপারটা রাজাদের আদর্শ নীতি ছিল না। মনু এটাকেই 'অর্থদূষণ' বলেছেন এবং বলেছেন— এই দোষ যদি রাজাকে গ্রাস করে, তবে তাঁর রাজ্য এবং জীবন দুইই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তবে অর্থদূষণ যে সব সময় রাজাদেরই গ্রাস করত, তা নয়। রাজ-অধিকারে নিযুক্ত মন্ত্রী-অমাত্য-সচিবেরাও অর্থদূষণে লিপ্ত হতেন। মনু-কৌটিল্যের মতো রাজধর্ম-বিশেষজ্ঞেরা বারবার নানা ছলে মন্ত্রী-অমাত্যদের পরীক্ষা করে নিতে বলেছেন। এমনও বলেছেন— যাঁকে মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার কথা রাজা ভাবছেন, তাঁকে পূর্বেই প্রচুর অর্থ এবং কামনার বিষয় উপহার দিয়ে তাঁর নীতি-স্থিতি বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন। বিশেষত বিত্ত, রাজকোষ বা অনুরূপ কোনও অধিকার, যেখানে টাকা-পয়সার লেনদেন হয়, সেখানে অর্থের ব্যাপারে যিনি শুদ্ধ বলে চিহ্নিত হয়েছেন, তাঁকেই রাজা নিযুক্ত করবেন। কিন্তু পরীক্ষা করে নিলেও, শত পরীক্ষা করে নিলেও রাজযন্ত্রের শিথিলতা, বাস্তব পরিবেশ এবং রাজাদের ব্যক্তিগত অশুদ্ধির কারণে একান্ত অর্থশুদ্ধ মন্ত্রীরাও 'করাপটেড' হয়ে পড়েন। এমনকী তা এমনও হয়, বিশেষত রাজা যদি নিজে 'করাপটেড' হন, তাহলে মন্ত্রী-অমাত্যেরাও সেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা, কৌটিল্য বলেই দিয়েছেন রাজা যেমন চরিত্রের হবেন, তাঁর মন্ত্রী-অমাত্য-সচিব এমনকী সেনা-সেনাপতিরাও তেমন প্রকৃতিরই হবেন— স্বয় যচ্ছীলাঃ তচ্ছীলাঃ প্রকৃতয়ো ভবন্তি।

আমরা আগে বলেছিলাম— নিজের রাজ্য ঠিক রাখার জন্য পররাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তর রাজাকে ভূমি এবং অর্থের বিনিময়ে তুষ্ট রাখাটা এক রকম রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেটা ঠিক 'করাপশন' নয়। কিন্তু একই ধরনের এই তথাকথিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যদি রাজার নিজের রাজ্যপাটের মধ্যেই হতে থাকে, তাকে 'করাপশন' ছাড়া আর কীই বা বলা যায়। মহাভারতের মধ্যেই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সেকালের দিনে রাজা বদলের সঙ্গে মন্ত্রী-অমাত্য-সেনাপতি ইত্যাদি রাজার সহায়ক জনকে অর্থ-মান দিয়ে নিজের অনুকূলে তৈরি করে নেবার একটা ব্যাপার ছিল অর্থাৎ রাষ্ট্র-যন্ত্রকে নিজের অনুকূলে না নিয়ে এলে রাজাব পক্ষে রাজ্য চালানো অসুবিধে হত। মহাভারতের অন্যতম প্রতিনায়ক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন পুত্রের হিতৈষণায় পঞ্চ-পাণ্ডবকে তাঁদের জননীসহ বারণাবতের জতুগৃহে পাঠাতে চাইছেন, তখন তিনি যেটা ভয় পেয়েছিলেন, সেটা হল— যুধিষ্ঠির পিতৃ-পিতামহক্রমে যে মন্ত্রী-অমাত্য লাভ করেছেন, তাঁরা পাণ্ডুর কাছে এতটাই কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা যুধিষ্ঠিরের পক্ষেই থাকবেন এবং পাণ্ডব-ভাইদের বারণাবতে পাঠিয়ে কোনও দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলার ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। ফলত সেই সব কৃতজ্ঞ মন্ত্রী-অমাত্যেরা যুধিষ্ঠিরের জন্য উলটে আমাদেরই না হত্যা করে বসে— কথং যুধিষ্ঠিরস্যার্থে ন নো হন্যুঃ সবান্ধবান্।

দুর্যোধন এতক্ষণ ধরে পিতার কথা শুনছিলেন, কিন্তু আর তাঁর ধৈর্যে কুলাল না আসলে তিনি এখনকার রাজনৈতিক দলনেতাদের মতোই জানতেন যে দুর্নীতিরও একটা মোহ আছে। এখন যেমন নিজস্ব স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য সরকার পক্ষ আমলা-পুলিশদের বিচিত্র উপায়ে হাত করে ফেলে, এই দুর্নীতি তখনও জানা ছিল, আর ঠিক সেই কারণেই দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মুখের শঙ্কা কেড়ে নিয়ে বললেন— ছোঃ! মন্ত্রী, অমাত্য আর জনগণ! আপনি যে-কথা বলছেন অর্থাৎ ধনে-মানে যেভাবে তাদের তুষ্ট হতে দেখেছেন— অর্থ-মানেন পূজিতাঃ— এই কথা তো? তো, সে কায়দা কি আমি জানি না? ওই সব মন্ত্রী, অমাত্য আর সাধারণ লোক, দুদিনে আমার পক্ষে চলে আসবে। ধ্রুবম্ অস্মৎ সহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি প্রধানতঃ কারণ রাজকোষ এবং অমাত্যরা— সবই এখন আমার হাতে।

দুর্যোধন যেটা পরিষ্কার করে বললেন না, সেটা হল— তাঁর হাতে রাজকোষ আছে বলেই অমাত্যরা তাঁর অনুগত হয়ে পড়েছে। দুর্যোধনের কাছে ভরসা

পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন এবং পরে দেখা যাচ্ছে এই বারণাবতে যাবার কথা তাঁকে নিজের মুখে বলতেও হয়নি। দুর্যোধনের টাকা খেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রীরা— অর্থাৎ পূর্বে যাঁরা পাণ্ডুর মন্ত্রী ছিলেন যাঁরা পূর্বে যুধিষ্ঠিরের গুণ গাইতেন— তাঁরাই এখন ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের হয়ে বলতে লাগল— আঃ। বারণাবতের মতো অমন সুন্দর জায়গা হয় না, তার ওপরে আবার সেখানে পশুপতি শিবের মেলা বসেছে। উঃ। এত সুন্দর জমাটি জায়গা না! মন্ত্রী-অমাত্যের মুখের এই উচ্ছ্বাসে ভুলে পাণ্ডবরা নিজেরাই বারণাবতে যাবার টোপ গিলেছেন, এবং অজান্তেই জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মরার টোপও। মন্ত্রী-অমাত্যদের বশে এনে দুর্যোধন আরও বড় যে দুর্নীতিটি করেছিলেন, সেটি হল— পৌর-জনপদবাসীদের টাকা-পয়সা দিয়ে ভোলানো। দুর্যোধনেরা সব ভাই মিলে জনগণের মধ্যে এমন টাকা ছড়িয়েছিলেন, বিশেষত রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গ মন্ত্রী-অমাত্য-সচিব-সেনাপতি— সকলকে অর্থ এবং অযোগ্য লোককে অপ্রয়োজনীয় সম্মান দিয়ে এমন ভাবেই হাত করে নিয়েছিলেন— অর্থমান-প্রদানাভ্যাং সঞ্জহার সহানুজঃ— যে, তারা আর প্রতিপক্ষের অনুকূলে একটা কথাও বলত না।

আমরা বলি— এটাকেও 'করাপশন' বলে, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান পুরুষের দুর্নীতির কাজে মন্ত্রী-অমাত্য-জনগণ সকলেই শামিল হয়ে যেতে পারে। এ কোনও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ঘুষ চালাচালির করাপশন নয়, এ হল সার্বিক দুর্নয়ের এক ব্যাপ্তিময়তা, যাতে করে 'করাপশন'টাকেই সামগ্রিক নীতি হিসেবে মেনে নেয় মানুষ। আর 'করাপশন' যখন এইভাবে অভ্যাস হয়ে যায়, তখন মন্ত্রী-অমাত্যদের কোনও লজ্জা থাকে না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইতর খলজনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি ঘটান। সরল সত্য বলা সাধারণ মানুষ তাতে মৃত্যুর পরোয়ানা লাভ করে।

কথাটা বলছি এই জন্য যে, এই সার্বিক দুর্নীতির রূপ আমাদের সাধের গণতন্ত্রেও বড় অপ্রত্যক্ষ নয়। মন্ত্রী থেকে দলনেতা, বিরোধী নেতা থেকে দলপুষ্ট ক্ষমতাশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি সত্যবক্তা সরল ব্যক্তি মুখ খোলেন, তবে তিনি নিজের জীবন নিঃসংশয়ে কাটাতে পারবেন না। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন— যারা মন্ত্রীদের চুরির সম্বন্ধে রাজার কাছে সত্য ঘটনা নিবেদন করে, তাদের তোমায় প্রোটেকশন দিতে হবে, নইলে মন্ত্রীরা তাকে মেরে ফেলবে। আমরা গণতন্ত্রের বালাই নিয়ে শুধু এইটুকু যোগ করি যে, শুধু

চুরি নয়, যে কোনও ব্যাপার বা যে কোনও দুর্নীতি, যা দলীয় নেতার প্রসঙ্গে সত্য অথচ তাঁর অপ্রিয়, তা প্রকাশ করলে সত্যবক্তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং সেটা করাপশন-এর অন্যতম অঙ্গ।

ভীষ্ম এই সার্বিক 'করাপশন'-এর প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে কোশল দেশের ক্ষেমদর্শী রাজার উপাখ্যান শুনিয়ে বলেছিলেন— পুরাকালে কোশল দেশে ক্ষেমদর্শী রাজা যখন রাজত্ব করছেন, তখন কালকবৃক্ষীয় নামে এক মুনি এসে উপস্থিত হলেন রাজার কাছে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল— ক্ষেমদর্শী এবং কালকবৃক্ষীয়— এই দুটি নামের মধ্যেই রূপক আছে। প্রথম জন মঙ্গলদর্শী, কল্যাণদর্শী। আর কালকবৃক্ষীয় স্থাণু সাক্ষীর মতো, তিনি সব কিছু দেখতে পান। যাই হোক, ক্ষেমদর্শী রাজার অবস্থা দেখে কালকবৃক্ষীয় মুনি আজ কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। রাজার রাজ্যে 'করাপশন-র‍্যাকেট' ধরিয়ে দেবার জন্য তিনি অদ্ভুত একটি কাজ করেছেন। তিনি একটি কাককে খাঁচায় পুরে জনগণকে বোঝাতে লাগলেন— তোমরা এই কাকের বিদ্যা শিক্ষা করো। কেননা কাক সব জানে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— সব।

আমরা জানি— কাকের এই ভূত-ভবিষ্যৎ জানার ক্ষমতা থাকতে পারে না। প্রতীকী ব্যবহারে মুনি বোঝাতে চাইছেন যে, রাজ্যের মন্ত্রী-অমাত্যেরা চুরি করছে, অথচ সেটা কেউ বলছে না। কাক কিন্তু এমন নয়, তার অভ্যাসই হল— কোনও কিছু অন্যরকম দেখলেই, অন্যরকম শুনলেই সে কা-কা করে চেঁচায় এবং আপন গোষ্ঠী-সচেতনতায় সকল কাককে একত্র জড়ো করে। কালকবৃক্ষীয় মুনি জনগণকে নিদেন পক্ষে এ 'বায়সী বিদ্যা' শিখতে বলছেন। তিনি নিজে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে-ঘুরে যত অনাচার দুর্নীতির খবর পেয়েছেন— সর্বং পর্যচরদ্ যুক্তঃ প্রবৃত্ত্যর্থী পুনঃপুনঃ— সেসব তিনি রাজ্যবাসীকে জানিয়েছেন। ওই কাকের কথা বলতে-বলতে একদিন কালকবৃক্ষীয় মুনি প্রায়-আধুনিক বিরোধী দলনেতার মতোই বেশ কিছু লোককে তাঁর পাশে পেয়ে গেলেন এবং যথোচিত সাহস সঞ্চয় করে সেই সব লোককে নিয়ে বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীদের অন্যায় দুর্নীতিগুলি সব বুঝিয়ে দিলেন— সর্বেষাং রাজযুক্তানাং দুষ্করং পরিদৃষ্টবান্।

সর্বভাবে জনগণকে অবহিত করার পর মুনি একদিন সেই খাঁচায়-পোরা কাকটি নিয়ে উপস্থিত হলেন ক্ষেমদর্শী রাজার কাছে। লক্ষণীয়, এতদিন ধরে যে জনগণ 'বায়সী বিদ্যা' শিখে বিস্তর কা-কা করে লোকসংগ্রহ করল, তারা

কেউই মুনির সঙ্গে নেই। আছে শুধু সেই প্রথম কাকটি, যে মহাসারল্যে সত্য বলতে প্রস্তুত। মুনি এবার রাজার সামনে এক-এক মন্ত্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন— অমুক জায়গায় এই কৌশলে তুমি টাকা মেরেছ, এই এই লোক জানে, আর এই কাকটিও তাই বলছে— এবম্ আখ্যাতি কাকো'য়ম্। এই রকম আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে টাকা মারার দায়ে অভিযুক্ত করে মুনি চলে গেলেন রাজার দরবার থেকে। শনাক্তকারী কাকও তাঁর সঙ্গে চলে গেল।

পরের দিন যে ঘটনা ঘটল, সেটাই ভয়ঙ্কর। খাঁচার অধিকারী রাত্রে ঘুমিয়েছেন, যেমন সব বিরোধী নেতাই সারাদিন অন্তহীন বিপ্লবের পর রাত্রে ঘুমোন। কিন্তু পূর্বদিনের শনাক্ত হওয়া মন্ত্রীরা ইতোমধ্যেই লোক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাদের কেউ রাতের অন্ধকারে এসে মুনির পাশে রাখা পঞ্জরস্থ কাকটিকে সূচাগ্র শরের আঘাতে মেরে রেখে গেল— তম্ অস্যাভিসৃপ্তস্য নিশি কাকম্ অবেধয়ন্। তার পরে মৃতের শরীর নিয়ে যেমন পলিটিকস হয়। কাকের ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে, সেই মৃত কাকটিকে নিয়েই মুনি উপস্থিত হলেন রাজার কাছে— বায়সন্তু বিনির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা বাণেন পঞ্জরে। তারপর মৃত কাকের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে মুনি বললেন— এই তো আপনার রাজ্যের অবস্থা, যে সত্য কথা বলবে, তারই তো এই অবস্থা হবে। আপনার এবং আপনার রাজ্যের হিত করতে গিয়ে এই কাক মারা পড়ল। রাজ্যের সমস্ত 'করাপশন'-এর ক্ষেত্রগুলি পুনরুল্লেখ করে মুনি বললেন— আপনার রাজ্য হাঙর-কুমিরে ভর্তি নদীর মতো, তবু আমি এই মূর্খ কাককে নিয়ে এই ভয়ঙ্কর রাজনীতির নদী পার হতে চেয়েছিলাম— কাকেন বালিশেনেমাং যামতার্যমহং নদীম্।

মূর্খ কাক, নাকি যে সত্য কথা বলে মিথ্যা দুর্নীতি শনাক্ত করে সেই মূর্খ। রাজনীতি এবং রাজযন্ত্রে যখন 'করাপশন' ঢুকে যায়, তখন এই রকমই ঘটে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের আমলে গণতান্ত্রিক সরকার-পক্ষ এবং অতিপুষ্ট বিরোধী দলনেতারা ছিলেন না। কিন্তু প্রসঙ্গত টীকা লিখবার সময় নীলকণ্ঠ অদ্ভুত একটা কথা লিখেছেন। লিখেছেন— রাজনীতির এই নদীটা সজাতীয় এবং বিজাতীয় দুর্বলগ্রাসী রাজপুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আজকের আধুনিক রাজনীতিতেও এই একই চিত্র। স্বজাতীয় রাজপুরুষ, সরকার-গোষ্ঠী, তার স্বজাতীয় দল, দলনেতা, দল-পক্ষপাতী আমলারা-পুলিশেরা আর বিজাতীয় বিরোধী গোষ্ঠী, বিরোধী দল, দলনেতা এবং বিরোধীমত পুষ্ট আমলা-পুলিশ। এই সজাতীয় আর বিজাতীয় রাজনীতি— দুয়ের মধ্যেই যেখানে দুর্বলগ্রাসী দুর্নীতি চলে, সেখানে বলির পাঁঠা হল মূর্খ কাক অর্থাৎ মূর্খ জনগণ

আমরা জানি, যে কোনও সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্রে এবং রাজনীতিতে দুর্নীতি, অন্যায় এবং 'করাপশন' থাকবে, ভাল-মন্দের মিশেলে মন্দটা থাকবেই এবং থাকবেন সেই খাঁচা-বন্দি সত্যভাষী, মূর্খ কাক-প্রতিম জনতা, যাঁরা শোরগোল তুলবেন, চেঁচাবেন এবং দু-একজন মারা যাবেন। আমরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ঘুষ চালাচালি নিয়ে আরও খানিক প্রাচীন তথ্য নিবেদন করব ভেবেছিলাম, কিন্তু লেখা বিষয়ের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা থাকায় রাজনৈতিক 'করাপশন-এর দিঙনির্দেশ করেই ক্ষান্ত রইলাম আপাতত।

নাগরিকতা, অসভ্যতা এবং কৌটিল্য

কথার মানেটা, এখন খুব খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আগে এমন ছিল না। আমাদের কালে 'নাগর' কথাটা লম্পট পুরুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, এমন রমণীর মুখে তার প্রেমাস্পদ পুরুষের সম্বন্ধে এই শব্দটা শোনা যেত যা খুব শ্রোতব্য নয়, যাতে ভদ্র-সমাজে তির্যক ভাবেও উচ্চারিত হত— রসের নাগর। যেন নাগর মানেই সে ব্যক্তি কামকলাসিক্ত অভদ্র রসের আকর। বৈষ্ণব পদাবলিকারেরা এ শব্দের গৌণার্থ আরও চড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নিয়ে গৌর-নাগরিয়া ভাব এই এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের অন্যতম ধারা। কিন্তু 'নাগর' শব্দের এমন বিপরীতার্থ আগে ছিল না। একেবারে আভিধানিকভাবে শব্দটার মানে যদিও নগরে যিনি থাকেন, তিনিই 'নাগর' বা নাগরক কিন্তু একটু বিশদার্থে নাগর মানে অবশ্যই ভদ্রলোক এবং এমন ভদ্রলোক যাঁর রুচি আছে, এমনকী

টাকাপয়সাও একটু বেশি আছে। আধুনিক 'নাগর' শব্দটির মধ্যে যে লাম্পট্যের কলঙ্ক-চিহ্ন মুদ্রিত হয়েছে তার কারণ হয়তো কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন। তিনিই অর্থবান, ঐশ্বর্যশালী, রুচিশীল পুরুষের কামকলাভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বারেবারে 'নাগরক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তী কালে 'নাগর' অথবা 'নাগরক' শব্দের মধ্যে বাৎস্যায়নী কামতন্ত্রের জঘন্য উত্তরাধিকারটুকু রয়ে গেল, কিন্তু নগরের সভ্যতার অংশটুকু লুপ্ত হয়ে গেল। আরও পরবর্তী সময়ে, হয়তো বা শুধু বাৎস্যায়নী গন্ধ দূর করার জন্যই শব্দটা 'নাগর' বা নাগরক— কোনওটাই থাকল না, সেটা হয়ে গেল 'নাগরিক'। শব্দটা এখনও চলছে।

আমাদের বক্তব্য হল— অভিধান তথা প্রত্যয় নিষ্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও 'নাগর' নাগরক এবং নাগরিক— এই তিনটি শব্দের আকর-শব্দ কিন্তু নগর। কিন্তু বাৎস্যায়নের কালেও যেমন এই শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ ছিল তেমনই আমাদের কালের নাগরিক শব্দটির মধ্যেও কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ আছে। নাগরিক বলতে এমনই একজনকে বোঝায় যিনি করদানের বিনিময়ে রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা কিছু পান। এই দৃষ্টিতে একজন গ্রামবাসীও নাগরিক। কিন্তু এটা বেশ জানি গ্রামবাসীরা যতই নাগরিক হোন, 'তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম'। বাস্তবে নাগরিক হচ্ছেন তিনিই, যিনি নগরে বসবাস করেন, নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন এবং নাগরিক আইন মেনে নাগরিক কর্তব্যগুলিও পালন করেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কিন্তু 'নাগরক' অথবা 'নাগরিক' কথাটা আমাদের ব্যবহৃত অর্থে প্রযুক্ত নয়। বরঞ্চ নগরপাল বলতে যা বোঝায়, নগরবাসী জনের প্রয়োজন এবং করণীয় কর্তব্য তথা অকরণীয় কর্ম সম্বন্ধে যিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব বহন করছেন, তিনিই কৌটিল্যের মতে নাগরিক বা নাগরক। অবশ্য নগর-প্রশাসনের আরও কিছু কাজ ছিল, যেগুলি নাগরিক ছাড়াও অন্যান্য প্রশাসনিক অধিকারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল।

আধুনিক কালে আমাদের শহরবাসী নাগরিক পুরুষেরা পৌরসংস্থার কাছে যে তামাম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন অথবা পৌরসংস্থাই বা আমাদের জন্য কতটা কাজ করে— সে-সব প্রতিতুলনায় স্থাপন করে 'সবই ব্যাদে আছে' এইভাবে কৌটিল্যের মাহাত্ম্য খ্যাপন করাটা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ এটাই আমরা দেখাতে চাই, আমাদের প্রতিতুলনায় কৌটিল্য কতটা আধুনিক ছিলেন, খ্রিস্টপূর্ব সেই চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি কতটা ভেবেছিলেন নগরপাল এবং নগরবাসীর কর্তব্য বিষয়ে। এ-বিষয়ে ভাবনা করতে গেলে প্রথমে যেটা

বলা দরকার, সেটা হল— জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি কোনওটাই কিন্তু আজকের নয়। সে আগেও যেমন ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। হাসপাতালে রোগী নিয়ে গেলাম, অথচ উপযুক্ত ডাক্তার পেলাম না অথবা ডাক্তার ডাকলাম তিনি এলেন না, রোগী মারা গেল— এ-সমস্যা আজকের নয় চিরকালের। শহরের রাস্তাঘাট খারাপ অথবা বাজারে গেলে দোকানদার ঠকাচ্ছে, বাড়ির সামনে অন্য লোক মরা ইঁদুর ফেলে গেল, সামান্য সমাধানের জন্য সরকারি কেরানি বা অফিসার ঘুস নিচ্ছে, কনট্রাক্টে যে সময়ে যে কাজ হবার কথা, হল না— এ-সব সমস্যা আজকেও আছে, পুরাকালেও ছিল। আমরা বড় জোর ভাবতে পারি— এই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক যুগে বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধেগুলো নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথাই ছিল না, অথচ তা হয়। আর সেই জন্যই কৌটিল্যের স্মরণ নেওয়া— অন্তত সমস্যাগুলো উচ্চারণ করে জানিয়ে দেওয়া যে, দু-হাজার চারশো বছর ধরে আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি— তখনকার রাজতন্ত্রে যে সমস্যা ছিল, এখনও তেমনই আছে।

প্রশাসনের সুবিধের জন্য সম্পূর্ণ জনপদকে চারভাগে ভাগ করে নেওয়া অথবা নগর-শাসনের সুবিধের জন্য এক-একটি নগরকে চার ভাগ করে নিয়ে বড়-ছোট মর্যাদার বিভিন্ন প্রশাসক নিযুক্ত করাটা খুব বড় বুদ্ধির পরিচয় নয় বলেই না হয় ধরে নিলাম। কিন্তু নগরের এক-একটি অংশে কতকগুলি পরিবারের বসবাস, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের জাতি, গোত্র, নাম এবং তারা কে কী কাজ করে, অপিচ সেই কাজ থেকে তাদের আয় কেমন হয় এবং ব্যয় কেমন হয়— এই সম্পূর্ণ হিসেবটি কিন্তু থাকতে হবে নগরের কর্তাব্যক্তি গোপ এবং স্থানিকের কাছে। যাঁরা ভাবছেন নগরবাসী মানুষ-জনের স্থিতি এবং গতাগতি বোঝার জন্য এটা একটা বিশেষ ব্যবস্থা, তাঁদের জানাই, এটা একটা বড় কাজের অঙ্গমাত্র। আমরা যাকে এখনকার দিনে 'সেনসাস' (Census) বলি— এ হল তাই। কৌটিল্য সমস্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি গ্রামে কটা মানুষ আছেন, তাঁদের কাজ-কর্ম, চরিত্র, আয়-ব্যয়— সব কিছুর হিসেব রাখতে বলেছেন।

যেখানে গ্রামের মধ্যেই ক'জন কৃষক পরিবার, ক'জন বণিক, ক'জন গয়লা এবং তাদের মধ্যেও কারা রাজকর দেয় এবং কারা দেয় না এত হিসেব, সেখানে নগরে শহরে এ-হিসেবের আরও কড়াকড়িই হবার কথা। তবে জনপদের মধ্যে মানুষ-জনের সংখ্যার হিসেব, তাদের গোত্র-বর্ণ এবং ক্রিয়া-কর্মের এই হিসেবটা খুব সরলভাবে একটা 'সেনসাস-রিপোর্ট' তৈরি করার জন্যই এবং শহরেও

তাই— এতটা সরলভাবে এই ব্যবস্থা কৌটিল্যের মননের মধ্যে ছিল না। কৌটিল্য একই কাজের মাধ্যমে দুটি তিনটি কাজ সেরে ফেলেন। লক্ষণীয়, এই সংখ্যা গোনার কাজটা যেমন প্রশাসনিক উপায়ে সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে চলত, তেমনই এই কাজ সমান্তরালভাবে করা হয় আরও একটি ধারায় এবং সেটা গুপ্তচরের ধারা। এই গুপ্তচরেরা কিন্তু জনপদের কিংবা নগরের শাসক গোপ কিংবা স্থানিকের কাছে রিপোর্ট করবে না, কেননা তারা নিযুক্ত হয় সর্বোচ্চ পদাধিকারী সমাহর্তার দ্বারা। কেন এমন ব্যবস্থা? কেননা, এই গুপ্তচরেরা একদিকে যেমন গ্রাম-শহরের জমি-জিরেত, ঘর-বাড়ি, মানুষ-জনের হিসেব করছে, তেমনই অন্য দিকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত গোপ-স্থানিক এবং প্রদেষ্টা পুরুষদের কাজকর্মগুলিও খেয়াল করবে।

কেন এমন ব্যবস্থা ছিল, তা আমাদের কর্পোরেশনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। কর্পোরেশনের অফিসারেরা (কাজ-কর্ম দেখে অবশ্য করণিক না অফিসার কোনওটাই বোঝা যায় না) বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানা বিধানে নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ করে কর-নির্ধারণ করেন। এই প্রক্রিয়া চলার সময়ে গৃহস্থ সময়মতো সচকিত হলে জমি-বাড়ির কর প্রথাবহির্ভূতভাবে অর্ধেক বা অর্ধেকেরও কম হয়ে যেতে পারে। এইখানেই গুপ্তচরের কাজ। কৌটিল্যের গুপ্তচর গৃহস্থের বেশ ধরে গ্রাম শহরের জমি-বাড়ির হিসেব রাখত এবং সেখানে কে-কতটা কর দিচ্ছে এবং কারাই বা করে ছাড় পাচ্ছে এবং সেখানে গোপ-স্থানিক-প্রদেষ্টারা কী ভূমিকা নিচ্ছেন, তাঁরা ঘুষ খাচ্ছেন কি না— এই সমস্ত রিপোর্ট তিনি দেবেন সর্বোচ্চ আধিকারিক সমাহর্তার কাছে। আর গণতন্ত্রে কী হয়? এখন কর্পোরেশনের অধিকর্তা নিজের দেওয়ালেই বহুতর অপহারী কর্মচারীদের কৌশল দেখে নিজেই সার্বিক অপহরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক-একটি জমি-বাড়ির দেয় কর প্রচলিত বাজারদরের চেয়ে তিন গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সেটাই আবার কর্মচারীদের কৌশলী মহানুভবতায় দ্বিগুণে নামিয়ে এনে কর্পোরেশনের সমাহর্তা তাঁর আপন সংস্থা এবং কর্মচারী দুই পক্ষকেই মহান সুযোগ করে দিয়েছেন। কৌটিল্যের আমলে এমনটি হবার উপায় ছিল না। কেননা সরকারি অফিসার বাজারদরের চেয়ে বেশি স্ট্যাম্প-ডিউটি ধার্য করলে যে প্রজা-বিক্ষোভ ঘটত, তারও সংবাদ দিত গুপ্তচরেরাই। এখন অবশ্য ক্ষোভের কথা সোজাসুজি বললেও কিছু হয় না, কেননা এই যুগে গণতান্ত্রিক এবং দলতান্ত্রিক সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের চেয়েও বেশি শোষণ করা যায়

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রীয় কালে গ্রাম-শহরের প্রশাসনে প্রশাসনিক ধারা ছাড়াও আরও একটা কারণে গুপ্তচর নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে, আরও একটি কারণে এবং সে-কারণ আজকের দিনের একটা জ্বলন্ত সমস্যা। কৌটিল্য বলেছেন— গ্রাম-শহরে, নগরে মানুষের সংখ্যা, বৃত্তি, চরিত্র এবং তাদের আয়-ব্যয়ের ওপর নজর রাখা ছাড়াও গুপ্তচরেরা আরও একটি কাজ করবে। তারা জানবে— নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে কারা অন্যত্র গিয়ে বাস করছে, কিংবা অন্যত্র গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। বিদেশ থেকেই বা কারা এ-দেশে এসেছে কেন এসেছে এবং এসেই যদি থাকে তা হলে আবার ফিরে গেল কেন? একই সঙ্গে খবর রাখবে নর্তকী এবং বেশ্যাদের এবং অন্যান্য ধূর্ত-বদমাসদের— তারা কোথায় যাচ্ছে এবং অন্য দেশের তেমন কেউ এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করছে কি না— এ-সব খবর সমাহর্তার কাছে পৌঁছে দেবে।

বেশ বোঝা যায়— কৌটিল্যের রাজনীতিতে জনপদ কিংবা নগরে কোথাও অত সহজে অলক্ষ্যে ঢুকে পড়া বা বেরিয়ে যাওয়া যেত না। আজকের দিনে আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে যেমন দেখতে পাই— অপরাধপ্রবণ মানুষ নির্বিবাদে গ্রামে-শহরে ঢুকে পড়ছে, নির্বিরোধে লোক মারছে এবং নির্বিচারে পালিয়ে যাচ্ছে— শত্রু-দেশের এমন দুর্ব্যবসায় কৌটিল্য কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না। গ্রাম-শহরের মনুষ্যাবাস ছাড়াও আরও এগারোটা জায়গায় কৌটিল্য নজর রাখতে বলেছেন গুপ্তচরদের। বলেছেন— তারা যেন চোরের বেশেই থাকে এবং চোরের মতোই যেন নিপুণ হয়, কেননা তারা যাদের খবর জানবে, তারাও এক ধরনের চোর। কৌটিল্য বলেছেন— যে কোনও দেবস্থান যে কোনও খালি জায়গা— যেখানে লোক যায় না, জলাশয়, যে কোনও তীর্থস্থান অথবা প্রাকারবেষ্টিত দেবমন্দির, অরণ্য-প্রদেশ যেখানে ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ করেন, পাহাড়, বন-গহন— এই সব জায়গায় শত্রুরাজ্যের অনিষ্ট পুরুষেরা— যারা লোক মারতে এতটুকু দ্বিধা করে না— তাদের প্রবেশের ওপর নজর রাখতে হবে, নজর রাখতে হবে চোরদের ওপরেও। এদের আসা-যাওয়া এবং সাময়িক স্থিতি— সব কিছুর কারণ জানতে হবে— স্তেনামিত্র-প্রবীর-পুরুষাণাং চ প্রবেশন-স্থান-গমন-প্রয়োজনানি উপলভেরন্।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের সম্পত্তির অধিকার অথবা বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না, কেননা এ-দেশে মানুষ মরলে সরকারের কিছু আসে-যায় না। কিন্তু কোনও মতে বেঁচেই যদি থাকি এবং জমি-বাড়ি-

জীবিকার জন্য প্রভূত রাজকর দিয়ে যদি পৈতৃক জীবনটা ধারণই করি, তবে কৌটিল্যের খ্রিস্টপূর্ব কালের তুলনায় তা কেমন করি— দেখা যাক।

নাগরিক সুবিধের কথা মাথায় রেখে প্রথমে রাস্তা-ঘাটের কথাই ধরা যাক। এ-কথা মেনে নিচ্ছি যে, এখনকার নগরগুলির যেমন চেহারা, তখন নিশ্চয়ই তেমন ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনের মতো নগর তো ছিল এবং সেই নগরের সংখ্যা কিছু কম ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিকের মতে আলেকজান্ডার শুধু পঞ্জাবেই দু'হাজার নগর জয় করেছিলেন। কথাটা যদি বাড়াবাড়িও হয়, তবু বলব দু'হাজার না হোক, দুই শত তো হবে, না হলে নিদেনপক্ষে কুড়ি। বিশেষত মহাভারত থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি, কামসূত্র থেকে অর্থশাস্ত্র— সর্বত্র 'আরবানাইজেশন' বা নগরায়ণ সম্পর্কে এত তথ্য আছে যে, তার পথ-ঘাট নিয়ে বড় বড় বই লেখা হয়ে গেছে। আমরা ব্যাপারটাকে অত জটিল না করেও বলতে পারি যে, মহাভারত এবং বৌদ্ধ যুগেই বেশ কিছু দূরগামী রাস্তা আমাদের দেশে তৈরি হয়ে গেছে— উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পূর্বে। এখনকার পেশোয়ার (তখনকার পুরুষপুর) থেকে মাত্র আঠারো মাইল দূরে ছিল গান্ধার (এখনকার কান্দাহার) রাজ্যের রাজধানী পুষ্কলাবতী। সেই পুষ্কলাবতী থেকে মেগাস্থিনিস এক হাজার একশো ছাপ্পান্ন মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে পৌঁছান। তাঁর আসার পথে পড়েছিল উদভাণ্ড (বর্তমান ওহিন্দ্), তক্ষশিলা, পঞ্চনদীর পরিচিত পথ, হস্তিনাপুর, কনৌজ, প্রয়াগ— এই সব বড় বড় শহর।

এই সব বড় শহরে যে-সব সাধারণ রাস্তা-ঘাটের পরিচয় পাই, সেটা নগরায়ণের প্রথম পর্বে খুব মোটা দাগে স্থলপথ, জলপথ, রাজপথ— এইরকম ভাগে ভাগ হলেও বুদ্ধের সময় থেকে কৌটিল্যের সময়ের মধ্যেই সেগুলি একটা নাগরিক স্বরূপ লাভ করেছিল, এমনকী তার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যকারিতার দিকটাও এমন সুচিন্তিতভাবে ভেবেছেন কৌটিল্য, যেটা আজকের দিনের অনেক বহুলালাপী মন্ত্রীদেরও লজ্জা দেবে। কৌটিল্য নগর তৈরির আগে রাস্তা তৈরি করে নিতে চান অর্থাৎ রাস্তা দিয়েই প্রথমে পরিকল্পিত বাস্তুবিভাগ সম্পূর্ণ হবে। তাঁর মতে নগর তৈরির সময় তিনটি রাজপথ পূব-পশ্চিমে এবং তিনটি উত্তর-দক্ষিণে আয়ত থাকবে এবং এইভাবে ভাগ করলে সম্পূর্ণ নগরটি ষোলোটি চতুষ্কোণ ভূমি-মণ্ডলে বিভক্ত হবে।

বড় বড় এইরকম ছয়টি রাজপথ তৈরি হওয়ার পর তৈরি করতে হবে বেশ কতকগুলি বত্রিশ ফুট চওড়া রাস্তা, যেগুলি দিয়ে রথ চলাচল করবে— রথ চলত বলেই হয়তো এগুলির নাম ছিল রথ্যা। এবারে রাজমার্গ থেকে দ্রোণমুখে যাবার রাস্তা— 'দ্রোণমুখ' হল চার দিকে একশো-একশো করে চারশো গ্রামের মাঝখানে যে বড় গ্রাম, এখনকার ভাষায় 'স্মল টাউনশিপ'। থাকবে স্থানীয়-এ যাবার রাস্তা— 'স্থানীয়' রীতিমতো উপনগর— আটশো গ্রামের কেন্দ্রস্থল, যেখানে বাজার-হাট বসে এবং থানা আছে। সম্পূর্ণ জনপদের বিভিন্ন স্থানে যাবার রাস্তার সঙ্গে থাকবে গোচারণ-ক্ষেত্র বা গোশালায় যাবার রাস্তা, যাকে বলা হয়েছে 'বিবীত-পথ'। এক সৈন্যশিবির থেকে অন্য সৈন্যশিবিরে যাবার জন্য আলাদা পথ— এমন পথ যেখানে সৈন্যদের ব্যূহ সাজিয়ে মার্চ করে নিয়ে যাওয়া যায়— এই পথ হল ব্যূহপথ। দেশি-বিদেশি পণ্য যেখানে নির্দিষ্টভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয় অথবা বন্দর-শহরে যাবার জন্য পথ হল 'সংযানীয়'।

এই যে তিন-তিন ছটি রাজমার্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে এতগুলি পথ, এই সব কটা পথই কিন্তু চৌষট্টি ফুট চওড়া। কিন্তু এত প্রশস্ত পথ-পরিকল্পনাতেও আমরা আশ্চর্য হই না, বরঞ্চ আশ্চর্য লাগে ভেবে যে, এইসব বড় বড় রাস্তা ছাড়াও কৌটিল্য এমন কতকগুলি পথের কথা বলেছেন— যেগুলির পিছনে তাঁর মানবিক এবং পরিবেশগত ভাবনা কাজ করেছে। যেমন মানুষের অন্ত্যকৃত্য করার জন্য যে শ্মশানে যেতে হবে, তার জন্য পৃথক একটি পথ রাখতে বলেছেন কৌটিল্য। শবদেহ বয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে যে বেদনা এবং শূন্যতাবোধ কাজ করে অন্য লোকের চোখেও সেটা খুব কষ্টকর এবং নঞর্থক ভাব তৈরি করে বলেই কৌটিল্যের ভাবনায় একটা চৌষট্টি ফুটের পৃথক শ্মশান-পথের ব্যবস্থা। এ-ছাড়াও আছে গ্রাম থেকে গ্রামে যাবার পথ, এবং যে-সব জায়গা থেকে রাষ্ট্রের অর্থাগম হয় যেমন, ফুল-ফলের বাগান, সবজি-বাগান, ধানাক্ষেত্র অথবা সংরক্ষিত বন বিভাগ, যেখান থেকে হাতি, ঘোড়া, গোরুর জোগান আসে, সে-সব জায়গায় যাবার জন্যও বত্রিশ ফুটের রাস্তা থাকতে হবে বিভিন্ন জায়গায়। আজকের দিনের নাগরিকতায় আমরা যেমন ভারী যানবাহন চলবার জন্য পৃথক রাস্তার চিন্তা করে থাকি কৌটিল্য সে-কথা ভেবেই সে-কালের যানবাহন চলার ক্ষেত্রে হাতি যাবার পথটাকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছেন। ক্ষুদ্র পশুর জন্য, বৃহদাকার পশুর জন্য এবং রথ যাবার চক্রপথের জন্য বিভিন্ন ঋতু এবং মাটির গুণাগুণ বুঝে পৃথক পথ তৈরি হলেও এই পথগুলি যে অন্য

প্রয়োজনে ব্যবহার হত না, তা বোধহয় নয়, তবু এই পৃথক এবং চিহ্নিত পথ-ব্যবস্থাটাই খুব জরুরি, কেননা আজকের আধুনিকতায় এই ভাবনা বড় প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

ভাল ভাল অনেক রাস্তার কথা তো হল, কিন্তু সে রাস্তায় চলাফেরা করার পথে বাধা সৃষ্টি হলে কৌটিল্যের কালে কী হত সেটাও বলা দরকার। আমাদের কাছে তো অবরোধ, যানজট, মিটিং মিছিল, রাস্তা নোংরা করা সব কিছু এমন জল-ভাত হয়ে গেছে যে, কোনও জায়গায় তাড়াতাড়ি পৌঁছলে বা অবরুদ্ধ না হলে নিজেরই কীরকম আশ্চর্য লাগে। কৌটিল্যের নিয়মে-- রথ্যা অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে রথ-শকট চলত, সেই রাস্তায় যদি কেউ ধুলো-ময়লা ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করত এদের আট পণ জরিমানা হত। রাস্তায় পাঁক, জল এ-সব ফেলে যদি অবরোধ তৈরি হত তো জরিমানা একের চার পণ। আমাদের রাজপথগুলিতে হাঁটুন, মন্দির, মসজিদ, সরকারি অফিস, অথবা শেয়ালদা-হাওড়া স্টেশনে যান, দেখবেন এখানে-সেখানে মনুষ্যবিষ্ঠা, পশুবিষ্ঠা এগুলি থেকে এখনও আমরা মুক্তি পাইনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন বিষ্ঠা-দূষণ রবীন্দ্র সরোবরে দেখেছি, সল্টলেকে সরকারি অফিসের পাশে দেখেছি, আর শেয়ালদা-হাওড়ায় এবং হাসপাতালে দেখেছি পুঞ্জ পুঞ্জ। কৌটিল্যের সময়ে বিষ্ঠাদণ্ড এবং মূত্রদণ্ড বলে দুটি আইন ছিল। জায়গার গুরুত্ব বুঝে বিষ্ঠাদণ্ড এবং মূত্রদণ্ড উত্তরোত্তর বাড়ত। একমাত্র চরম বিপন্নতার উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বিষ্ঠাদণ্ড মূত্রদণ্ড থেকে রেহাই ছিল না। আজকের দিনে যাঁরা নিজে হাওয়া খেতে-খেতে এবং গৃহপালিত কুকুরকে হাওয়া খাওয়াতে-খাওয়াতে অন্য মানুষের ঘরের সামনে এবং সরকারি রাস্তায় কুকুরের বিষ্ঠার দায় কুকুরের ঘাড়ে চাপান, আমরা নিশ্চিত জানি, কৌটিল্য বেঁচে থাকলে আজকে সেই পশ্বধিকারীর ওপরে পশুবিষ্ঠাদণ্ড নেমে আসত অন্তত এক পণ।

তার ওপরে এ-জিনিস তো হামেশাই চোখে পড়ে। রাস্তার মধ্যে ইঁদুর-বিড়ালের হানাহানিতে ইঁদুর মারা গেল অথবা দুইটি কুকুরের মারামারিতে একটি কুকুর মারা গেল— এমন ঘটনার কথা বলছি না। কিন্তু আমার বাড়ির সামনে অন্য বাড়ির মৃত ইঁদুর, কিংবা অন্য গৃহের মৃত কুকুর রাস্তায় ফেলে যাওয়া— এমন ঘটনা যে কত দেখেছি এই কলকাতায়, তার ঠিক নেই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে কৌটিল্যের শাসনটা এইরকম— বিড়াল, কুকুর, বেজি, কিংবা সাপের মৃতদেহ যদি নগরের মধ্যে কোথাও ফেলা হয়, তবে অপরাধীর

দণ্ড কমপক্ষে তিন পণ। পশু যদি বড় হয়, দণ্ডও তাহলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর রাস্তায় যদি কোনও ভাবে মানুষের মৃতদেহই ফেলে রাখা হয় তাহলে আর রক্ষে নেই, তার দণ্ড পঞ্চাশ পণ।

অর্থবল, জনবল, আলস্য অথবা মানসিক দূরত্বই হয়তো একটা কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে, যখন মানুষ মানুষের মৃতদেহ সংকার না করে রাস্তায় ফেলে আসে এবং দণ্ড যখন আছে তখন তো এটাও প্রমাণ হয় যে, অপরাধীকে না পাওয়া গেলে রাষ্ট্রই সেখানে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু মনুষ্যশবের ক্ষেত্রে যা সত্য, অন্য পশু-শবের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। সেখানে শুধু আত্মগৃহশুদ্ধির প্রবৃত্তিটুকুই কাজ করে। মনুষ্য-শব নগর-পথে পরিত্যাগ করার জন্য যে অত্যধিক জরিমানা হত, তার কারণ একটাই এবং তা হল— রাস্তায় ফেলা তো দূরের কথা, শব-নিষ্ক্রমণের জন্য একটা আলাদা পথ ছিল, সেই পথে শব নিয়ে না গেলে, এমনকী নগরের যে নির্দিষ্ট দ্বার দিয়ে শব নিয়ে যাবার যে ব্যবস্থা, সেই দ্বার দিয়ে শব-নিষ্ক্রমণ না ঘটিয়ে অন্য দ্বার বা অন্য পথে তা করা হলে দুশো পঞ্চাশ পণ জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। পুনশ্চ এ-সব ক্ষেত্রে নগর-দ্বারের রক্ষক যদি ঘুষ খেয়ে মানুষকে এই সুযোগ দেয় এবং সে যদি বাধা না দেয়, তবে তার ব্যক্তিগত দণ্ডই ছিল দুশো পণ।

নাগরিক সুবিধার আর একটি বড় দিক হল স্বাস্থ্য-পরিষেবা। মনে রাখা দরকার— স্বাস্থ্য-পরিষেবা কৌটিল্যের দৃষ্টিতে সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রটা আজকের দিনে যেমন 'কনজিউমারইজমে'র দৃষ্টি থেকে ভাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কৌটিল্য বোধহয় সেই দৃষ্টি সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তত দুটি বিধান থেকে এই দুটি ভাবনাই প্রমাণ করা যায়। ডাক্তারের কাছে রোগী আসল এবং তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন, এ তো খুব কাম্য পরিস্থিতি। এ ব্যাপারে ডাক্তার-বদ্যিরা এখনও যেমন দায়িত্বশীল তখনও তেমনই ছিলেন। কিন্তু 'ইমার্জেন্সি কেসে' যখন রোগী ডাক্তারের কাছে আসে, তখন কৌটিল্যের বক্তব্য হল— কোনও বৈদ্য যদি রোগীকে প্রাথমিক পরীক্ষা করে এমন বোঝেন যে, চিকিৎসা আরম্ভ করলেও বা চিকিৎসার পরেও তার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে, তবে আগে তিনি উপযুক্ত আধিকারিক রাজপুরুষকে সে খবর জানিয়ে তবে চিকিৎসা আরম্ভ করবেন। তাতে সুবিধে এই যে, রোগী যদি বেঁচে যায়, তবে কারওরই কিছু বলার নেই, কিন্তু রোগী যদি মারা যায় তবে অন্তত ডাক্তারকে দোষী

সাব্যস্ত করে তাকে মারধর করা অথবা চিকিৎসালয় ভাঙচুর করার ঘটনাগুলি ঘটবে না। আর কৌটিল্য বলেছেন— প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বৈদ্য যদি তা রাজদ্বারে না জানিয়ে নিজের দায়িত্বে চিকিৎসা আরম্ভ করেন এবং তাতে যদি রোগী মারা যায়, তা হলে ওই বৈদ্যের ভাল রকম জরিমানা হবে।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, নাগরিকের জীবন নিয়ে রাষ্ট্রের ভাবনা আছে এবং রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-পরিষেবার মধ্যেও রাষ্ট্রের একটা 'কনট্রোল' কাজ করছে। এ ছাড়াও ডাক্তারির ক্ষেত্রে যে 'কনজিউমারিজম'-এর কথা বলেছিলাম, তার একটা ভাবনাও প্রমাণ হয় কৌটিল্যের বক্তব্য থেকে। কৌটিল্য বলছেন— বৈদ্য রোগীর যে চিকিৎসা করছেন, সেই চিকিৎসাব মধ্যে যদি কোনও ভুল থাকে এবং বৈদ্যের কর্মদোষে অর্থাৎ তাঁর ভুল চিকিৎসায় যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তবে সেই বৈদ্যের জরিমানা হবে পাঁচশো পণ। এ কথা ঠিক যে, 'কনজিউমাবিজম'-এর ক্ষেত্রে ক্রেতাস্বার্থে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যাপার থাকে, এখানে ব্যাপাবটা ঠিক তেমন না হলেও চিকিৎসা-কর্মে দোষের জন্য জরিমানা করাটা ক্রেতার স্বার্থ সুবক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তো বটেই। সমাজ তখনও তেমন পরিশীলিত হয়নি, ফলে চিকিৎসার বিভ্রাট বা চিকিৎসকের ত্রুটি ক্রেতাস্বার্থেব পবিপন্থী হলে সেটা আর্থিক বা অন্য কোনও ক্ষতিপূরণ বা প্রতিপূরণের দিকে না গিয়ে প্রত্যাঘাতেব চেহারা দিতে চান কৌটিল্য। যেমন শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার যদি ভুল করে শস্ত্রাঘাতে রোগীর কোনও গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক ক্ষতি করেন, বা সেই অঙ্গের বৈকল্য (ডিফরমিটি) ঘটান, তবে সেটা মামলা-মোকদ্দমার আওতায় চলে আসবে— টীকাকার বলছেন— সেই মামলায় ডাক্তারকে অভিযুক্ত করে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাবে — তদাখ্যেন বিবাদ-পদেন ভিষজমভিযুঞ্জীত— এবং সেই দণ্ড হল এইরকম— ডাক্তার নিজের ভ্রমাত্মক শস্ত্রপ্রয়োগের দোষে রোগীর যে অঙ্গের ক্ষতি করেছেন, ডাক্তারেরও সেই অঙ্গের ক্ষতি-সাধন করতে হবে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বা খানিকটা প্রতিহিংসাবৃত্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে বটে, হয়তো এমন কোনও ঘটনা সেকালে বাস্তবায়িতও হয়নি, কিন্তু এই শাস্তির ভাবনা ক্রেতার স্বার্থ-সুরক্ষার দিকে একটা স্পষ্ট পদক্ষেপ বটেই। এমনকী এত বড় কথাটা যদি নাও বলি, তবু এটা মানতে হবে যে, নাগরিকের জীবন তো বটেই, তাঁর সম্পত্তির সুরক্ষা এবং যাতে তাঁকে কোথাও ঠকতে না হয়, সেই ভাবনাটা কিন্তু কৌটিল্যেব নাগরিক-বিধির অঙ্গ ছিল,

এমনকী মহাভারত তথা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিও এ-ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের কাছে হেনস্থা, অথবা বাজারে গিয়ে ঠকে আসার ব্যাপার ছেড়েই দিলাম, নাগরিকের সম্পত্তি-সুরক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রকে এতটাই সাবধান হতে হত যে, নাগরিক যদি চোরের হাতেও কিছু খুইয়ে বসেন, তবে তা পূরণ করতে হত রাষ্ট্রকে। ধর্মশাস্ত্রকারেরা নির্দেশ দিয়েছেন— রাজার রাজ্যে যদি কারও টাকা-পয়সা চুরি যায়, তবে যে বর্ণের লোকই হোক, সব জিনিস চোরের কাছ থেকে আদায় করে তা অধিকারী ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হবে— দাতব্যঃ সর্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরে র্হৃতং ধনম্— এবং অনাদায়ে তা রাজাকেই পূরণ করে দিতে হবে রাজকোষ থেকে। এখনকার আধুনিক গণতন্ত্রে জীবন এবং সম্পত্তির অধিকার যেখানে তথাকথিত ভাবে সুরক্ষিত, সেখানে চোরে চুরি করলে চোর ছাড়া বেশির ভাগ নিরীহ অচৌর ব্যক্তিই রাজপুরুষের হাতে নিগৃহীত হয়। আর হৃত দ্রব্য ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে সরকারের দায় শূন্য।

কৌটিল্য, এমনকী যাঁকে আজকাল আপনারা নানা কারণে খুব গালাগালি দিয়ে থাকেন, সেই মনু-মহারাজেরও একটা ব্যাপারে দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল। ওঁরা যতই রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী মানুষ হোন, ওঁরা এটা খুব ভাল জানতেন যে, যে সব জায়গা থেকে রাজার রাজকোষে টাকা আসে, সেই সব বিভাগের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সাধারণ মানুষকে নানা ভাবে, নানান মাধ্যমে ফাঁকি দেন বা ঠকান। একজন ভদ্র নাগরিক যিনি রাজকর ফাঁকি দিচ্ছেন না, তিনি যাতে রাজপুরুষের হাতে হেনস্থা না হন বা তাঁকে দ্রব্যে, মানে, মূল্যে ঠকতে না হয়, সে কথা বলবার সময় মনু এবং কৌটিল্য দুজনেই 'চোর' কথাটা ব্যবহার করেছেন। মনু বলেছেন— রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব যাঁদের হাতে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ যে সব দফতর তাঁরা সামলান, সেখানে অনেক রাজপুরুষই থাকেন, যাঁরা বস্তুত অন্যের ধন চুরি করেন এবং তাঁদের স্বভাবের মধ্যেও একটা শঠতা থাকে— রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ। মনু প্রাচীন মানুষ, তাই ঘুষখোর কথাটা না বলে 'পরস্ব-আদায়ী' শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং একই সঙ্গে 'শঠতা'র প্রসঙ্গ তুলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই সব সরকারি রাজপুরুষেরা নাগরিক-জীবনে নানা হেনস্থা সৃষ্টি করে। অতএব এই সব লোক যদি একবার ধরা পড়ে, তবে মনুর মত হল— এদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্য থেকে বার করে দিতে হবে।

কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতিতে ঘুষখোর রাজকর্মচারীদের শঠতার বিবরণ সার্বিক ভাবে ধরা আছে, কিন্তু কৌটিল্যের মাহাত্ম্য হল— চুরির জায়গা হিসেবে তিনি শুধু কাস্টমস, সেলস্, একসাইজ বা এইরকম কতকগুলি সংস্থা চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হন না, চুরি বা লোক-ঠকানি জিনিসটাকে তিনি দু বা তিন দিক থেকে, অথবা বলা উচিত— একেবারে আকর থেকে ধরবার চেষ্টা করেন। খুব সাধারণ একটা জায়গা ধরুন। ধরুন, আপনি বাজারে গেলেন। তা, জিনিস কেনার সময় আমরা ক'দিন বা ক'বার ব্যবসাদারের পাল্লা-বাটখারা পরীক্ষা করি। বলতে পারি এ পরীক্ষা করার কাজটা কাদের? সত্যিই এর জন্য নাকি করপোরেশনের লোক আছে, তা সেই লোকটাকে আমরা বছরে ক'বার বাজারে দেখি! একবারও কি দেখি? কৌটিল্যের পৌতবাধ্যক্ষ, যিনি দাঁড়িপাল্লা-বাটখারার ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষ, তিনি বছরে চারবার বাজারে এসে দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা পরীক্ষা করে 'স্ট্যাম্পিং' করে যাবেন এবং এ রকম 'সিল' ছাড়া দাঁড়িপাল্লা-বাটখারা ব্যবহার করা হলে সাড়ে সাতশো পণ দণ্ড একেবারে বাঁধা ছিল। বিশেষত বিভিন্ন বস্তু মেপে নেবার জন্য এত বিচিত্র রকমের দাঁড়িপাল্লার কথা কৌটিল্য বলেছেন, তা ভাবলে পরে অবাক হতে হয়।

ওই যে বলেছিলাম ক্রেতা-স্বার্থ-সুরক্ষার ক্ষেত্রটি কৌটিল্য সব সময় মূল জায়গা থেকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। একটা কাপড় তৈরি করবার সময় যত ওজনের সুতো দেওয়া হল, বস্ত্র-প্রস্তুতির সময় তার যতটুকু হানি ঘটবে, তা ধরে নিয়েও সেই বস্ত্রের যদি কোনও ভাবে অবমূল্যায়ন ঘটে, তবে তন্তুবায়ের জরিমানা ছিল অবধারিত এবং এই জরিমানা কাপড়ের মাপ, কত সুতোর কাপড় এবং কাপড়ের কোয়ালিটি— এর যে কোনও একটা নিয়েই ঘটা সম্ভব ছিল। তন্তুবায়ের এই উদাহরণ কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, অথবা যে কোনও কারখানার অর্ডার-সাপ্লায়ার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ডাক্তার-বদ্যিরাও এই লিস্টিতেই আছেন। এই সব ব্যবসাদার এবং শিল্পমালিকদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কৌটিল্য অদ্ভুত মজা করে একটি কথা বলেছেন। বলেছেন— কেউই সামনাসামনি এঁদের কাউকে চোর বলে না বটে কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই চুরি করার প্রবণতাটুকু আছে বলে এঁদের বাস্তবে চোরই বলা যায় এবং রাজাকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তারা দেশবাসীর পীড়া সৃষ্টি না করতে পারে— এবং চৌরান অচৌরাখ্যান্.. বারয়েদ্ দেশপীড়নাৎ।

আজকাল সকলেই একটা কথা বলেন, করপোরেট অফিস থেকে কারখানা, মন্ত্রীমশাই থেকে আমলা— সবই আজকাল কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা বলছেন। কৌটিল্য কতকাল আগে ব্যাপারটা ভেবেছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। কৌটিল্য বলেছেন— শিল্পক্ষেত্রে যারা কাজকর্ম করবে, তার স্থান-কাল নির্দিষ্ট করে কাজ করবে। অর্থাৎ কোন জায়গায় কাজটা হচ্ছে, কাজটা কী, কাজের স্বরূপ কী এবং কত সময়ের মধ্যে সেটা করে দিতে হবে, সেটা শিল্পশ্রমিককে বুঝে নিতে হবে। আবার কাজ যিনি দিচ্ছেন, তিনি যদি স্থান-কাল সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ না দেন, তবে কেন তা দিচ্ছেন না, তাও জেনে নিতে হবে। স্থান, কাল এবং কাজের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্টতা এইজন্যই প্রয়োজন, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের অতিক্রম ঘটালে শিল্প-শ্রমিককে জবাবদিহি এবং জরিমানা করা যায়। সময়ের মধ্যে কাজ না করলে কৌটিল্যের মত হল— বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া। শারীরিক বিপর্যয়, আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক উৎপাতের কারণে কাজ সময়ে সম্পূর্ণ না হলে অবশ্য বিবেচনা ছিল। তা ছাড়া সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করা, কাজের জন্য দেওয়া অপরিশীলিত নিক্ষিপ্ত কাঁচামাল নষ্ট হয়ে যাওয়া, কিংবা যেমনটি তৈরি করতে বলা হয়েছিল, তেমনটি না করে অন্য রকম করে দেওয়া হলে শিল্পশ্রমিকের বেতনহানি তো হতই, উপরন্তু ক্ষতিপূরক জরিমানারও ব্যবস্থা ছিল। এমনটি আজকের দিনে হলে ক্রেতা-স্বার্থ-সুরক্ষা এবং ওয়ার্ক-কালচার কোথায় পৌঁছে যেত ভাবা যায়?

পরিচ্ছন্ন নাগরিকতার আর একটা বড় অঙ্গ হল নগরের গৃহগুলি। বলবেন— ওই তো কৌটিল্যের প্রমাণ দেখিয়ে ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় দূরে দূরে বাড়ি তৈরির কথা বলবেন। কৌটিল্যের কালে কি এমন নগরায়ণ হয়েছিল, নাকি সব লোক এসে কলকাতায় বাসা বেঁধেছিল। উত্তরে জানাই— আসল কথা হল পরিকল্পনা। নগরের কথা পরে আসবে, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জনপদ-সন্নিবেশে কৌটিল্য জনপদবাসী মানুষের সংখ্যায় একটা সমতা বা 'ব্যালান্স' চেয়েছেন। কৌটিল্যের জনপদ যেহেতু অ্যারিস্টটলের 'পোলিস' নয়, তাই তাঁর ভাবনার মধ্যে জটিলতাও কিছু নেই রাষ্ট্রকে একটি বৃহদাকার জনসমষ্টির আশ্রয় বা আধার হিসেবে চিন্তা করার ফলে, কৌটিল্য প্রথম থেকেই চেয়েছেন— যেন রাষ্ট্রের একটি অংশবিশেষ জনসংখ্যায় অতিরিক্ত স্ফীত হয়ে না পড়ে, আবার কোনও অংশ যেন জনহীনতার জন্য অব্যবহৃত বা সমস্যাকুল না হয়ে

ওঠে। এই উদ্দেশে নতুন জয় করা দেশ থেকে মানুষ-জন নিয়ে এসে পুরাতন জনপদে বসানো আবার পুরনো জনপদের জনবহুল অংশ থেকে মানুষ-জন সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন জনপদে স্থাপন করাটা জনপদের উন্নতির প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

জনপদ-সন্নিবেশেই যখন কৌটিল্য এতটা প্রগতিশীল সেখানে নগর-শহরে কেমনতর বাড়ি-ঘর চাইবেন কৌটিল্য? দক্ষিণ কলকাতা তো সে দিনের সৃষ্টি, কিন্তু উত্তর কলকাতার বউবাজার থেকে শ্যামবাজার অথবা আরও ও দিকে সিঁথি থেকে বরানগর— এসব বসতি নিশ্চয়ই কৌটিল্যের আগে তৈরি হয়নি। কিন্তু এতটুকুও কি ভেবেছি আমরা? কৌটিল্য সেই কোনকালে বলে গেছেন যে দুটি বাড়ির মাঝখানে অন্তত তিন-চার পা জায়গা খালি থাকবে— কৌটিল্যের ভাষায় এর নাম 'অন্তরিকা' অর্থাৎ অন্তর, 'প্যাসেজ'। বাড়ির সীমানির্দেশক একটা প্রাচীর থাকবে এবং আজকে যে কাঁটাতারের বেড়া দেখেন, কৌটিল্য তাই ব্যবহার করতে বলেছেন বাড়ির সীমায় চার কোণে চারটে মজবুত খুঁটি পুঁতে, তার সঙ্গে লোহার তার যোগ করে। আর বাড়টি তৈরি করতে হবে ওই সীমান্তদ্যোতক বেড়ার বিস্তার বুঝে, অর্থাৎ আগে প্রাচীর, পরে বাড়ি— তাতে জমি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হবে না প্রতিবেশীর সঙ্গে— কর্ণকীলায়স-সম্বন্ধো'নুগৃহং সেতুঃ। যথাসেতু ভোগং বেশ্ম কারয়েৎ।

প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর যাতে অসুবিধে না হয়। সে-যুগে অত-শত ফাঁকা জমির মধ্যেও কৌটিল্য বারবার প্রতিবেশীর কথা ভাবতে বলেছেন, কারণ সেটা পরিচ্ছন্ন নাগরিকতার একটা অঙ্গ। এই আধুনিক শহরেও দেখছি— একজনের ছাদের বৃষ্টিনালিকার জল আর একজনের বাড়িতে এসে পড়ছে, একজনের বাড়ির নর্দমার লক্ষ্য অন্য বাড়ি। ফ্ল্যাট বাড়ির ওপরতলার প্রতিবেশী, নাকি উচ্চবেশী— তিনি চুল আঁচড়ে চুল ফেলছেন নীচে, ডিমের খোলা এবং মোসাম্বির খোসা নিতান্ত অনিচ্ছায় স্বভাববশতই ফেলে দিচ্ছেন নীচস্থ গতায়াতি মানুষের মাথায়। কৌটিল্যের ভাব দেখে বোঝা যায়— যা কিছু করো, তোমার সীমার মধ্যে করো, এবং নিজের সীমার মধ্যেও নিজের বাড়িটাকে অযথা নোংরা করে নিও না। কৌটিল্য বলছেন— তোমার নিজের বাড়ি থেকে যত জল বেরোবে, যত নোংরা জলের ধারা গড়াবে, তা গর্ত তৈরি করে তোমার নিজের বাড়িতেই রাখতে হবে। জলের নালি, নোংরা জলের পতনস্থান অর্থাৎ 'পিট', এবং নর্দমা— যা কিছু তৈরি হবে— তার অন্তভাগ যেন নিজের জমিতেই

প্রবিষ্ট থাকে এবং তার আরম্ভ এবং শেষ— যা কিছুই হোক, তা যেন প্রতিবেশীর দেওয়াল বা প্রাচীর থেকে অন্তত তিন পা দূরে থাকে। বলতে পারেন— তিন পা আর এমন কী, সেই তো নোংরার গন্ধ বেরোবে। কৌটিল্য বলছেন— কোনও মানুষের নিজের বাড়ির নোংরা ফেলার গর্ত, বাড়ির সিঁড়ি, বাড়ির নর্দমা, বাইরে দিয়ে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি এবং শৌচালয় যদি এমন জমিতে তৈরি হয় যা প্রতিবেশীর অসুবিধে হয় অথবা প্রতিবেশীর নিজের জমিতে তৈরি তেমন কোনও নির্মাণ যদি আমার আপন বাস্তুভোগের অসুবিধে সৃষ্টি করে, তবে নাগরিক আইনে অপরাধীর ভাল রকম দণ্ড হবে।

নিজের বাস্তুজমিতেও কৌটিল্য যেখানে-সেখানে যা ইচ্ছে করতে দেবেন না। হাত ধোয়া, মুখ ধোয়া, কুলকুচি করার জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে, তেমনই বাসন মাজা বা কিছু ধোয়ার জন্য যেখানে-সেখানে জল গড়িয়ে যাবে, তাও কৌটিল্যের মতে চলবে না, তার জন্য আলাদা জল-নির্গমনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে পুত্র-কন্যা জন্মালে সেকালে যে প্রসব-গৃহ বা আঁতুড়-ঘর তৈরি হত— তার জন্যও জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হত এবং সেই প্রসব-গৃহের মেয়াদ মাত্র দশ দিন, তার পরেই সেটা ভেঙে ফেলতে হবে, তা নইলে জরিমানা। এই জল-নির্গমনের ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট কর্মের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা থেকে একদিকে যেমন 'স্যানিটেশনে'র ভাবনাটুকু প্রমাণিত হয়, তেমনই অন্য দিকে এক অসামান্য নাগরিক-বোধ প্রকট হয়ে ওঠে— আমি যা করছি, তাতে যেন অন্যের অসুবিধে না হয় এবং অন্যে যা করছে, তাতে আমার অসুবিধে হলেও আমি তার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে পারি। নাগরিক বিধিতে বাধা সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রযন্ত্র নাগরিক আইনের পক্ষে যাবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল— নাগরিক চেতনার অভাবে কোনও বিবাদ উপস্থিত হলে যার অসুবিধে হচ্ছে সেই প্রতিবেশীর সাক্ষী-প্রমাণই কিন্তু আইনভঙ্গকারীর জরিমানার কারণ হয়ে উঠবে।

কৌটিল্য এমন একটা নাগরিক-চেতনার কথা বলেছেন, যেখানে উদাসীনতারও স্থান নেই। আজকাল যেমন কেউ কারও ক্ষতির জন্য মাথা ঘামায় না, তেমন উদাসীনতার স্থান কৌটিল্যের আইনে নেই। ধরা যাক, কারও বাড়িতে আগুন লেগেছে। সে আগুন দেখেও যদি অন্য কোনও গৃহস্বামী উদাসীন বসে থাকেন অথবা আগুন নেভানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে দৌড়ে না আসেন, তবে তেমন মানুষের জরিমানা হবে। এমনকী যে বাড়িতে ভাড়াটে

রয়েছে, সেও যদি 'গৃহস্বামীর বাড়িতে আগুন লেগেছে, আমার কী'— এমন ভেবে আগুন নেভানোর চেষ্টা না করে, তবে জরিমানা থেকে তারও রেহাই নেই। আগুনের ব্যাপারে অনবধানতা থাকলেও কৌটিল্য ছাড়বেন না। অর্থাৎ আমার বাড়িতে আমারই অনবধানতায় যদি আগুন লাগে, তবে এমন 'ক্যালাসনেস' কৌটিল্যের আইনে সবচেয়ে বেশি দণ্ডযোগ্য অপরাধ। তার মানে, আজকের দিনে যে-সব বাড়িতে ঝোপা-ঝোপা ইলেকট্রিক লাইন 'শর্ট সারকিট' হওয়ার জন্যই ঝুলছে সে-সব বাড়িতে আগুন লাগলে কৌটিল্য তাদের সবচেয়ে বেশি দণ্ড দিতেন।

আগুন যাতে না লাগে, তার প্রতিষেধ হিসেবেও কৌটিল্য অনেক ভাবনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রীষ্মকালে কতটা গরম হয়ে ওঠে, এবং সেই গরমে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই শুকনো ঘরবাড়িতে কতটা আগুন ধরার সম্ভাবনা, সেটা কৌটিল্য বুঝতেন। ফলে গ্রীষ্মকালের ভর-দুপুরে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানোর কাজটাই তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। রান্না করতে হলে ঘরের বাইরে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কথা না শুনলে জরিমানা, যাকে কৌটিল্য বলেছেন 'অগ্নিদণ্ড'। বস্তুত আগুন-লাগার প্রতিষেধ হিসেবে যে-সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলি না মানলেই একটা বিস্তারিত অগ্নিদণ্ডের তালিকা আছে। দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত যারা বাড়িতে আগুনের কাজ করে, তাদের বাড়িতেই বিভিন্ন ধরনের জলাধার পাত্র মজুত রাখতে হবে 'ফায়ার-এস্টিংগুইশার' হিসেবে, রাখতে হবে নানান যান্ত্রিক সরঞ্জাম যাতে আগুনের ধোঁয়া অন্য বাড়িতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, যাতে আগুন লাগলেও অতিরিক্ত দাহ্য পদার্থগুলি দূরে টেনে ফেলা যায়। এ-সব সরঞ্জাম বাড়িতে না থাকলে জরিমানা হবে।

আগুনের ব্যবহার সম্বন্ধে বহু সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও যে আগুন লাগতে পারে, কৌটিল্য সে-কথা জানতেন এবং জানতেন বলেই অন্যান্য দৈব বিপদের সঙ্গে অগ্নিদাহকেও তিনি দৈব বিপদ বলেছেন। কিন্তু দৈব বলেই তার প্রশমনের জন্য আগে থেকেই যে প্রস্তুত থাকা দরকার— কৌটিল্যের দূরদর্শিতা এইখানেই। যেমন বর্ষার সময় বন্যাপ্রবণ এলাকায় জল এসে লোক মরলে তবে আমাদের চেতনা হয়, কৌটিল্য তা হতে দেবেন না। তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা নিতে বলেন। তিনি জানেন— নদীর তীরে যাদের বাস, তাঁরা বাস ছেড়ে যেতে চান না কিছুতেই। তাঁদের উদ্দেশে কৌটিল্যের বক্তব্য— বেশ তো থাকুন নিজের

বাড়িতে, কিন্তু দিনের বেলায় থাকুন। রাত্রিবেলায় নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হবে এবং গ্রামবাসীরা যাতে প্রয়োজনে নদী পার হতে পারে, তার জন্য নৌকো, বাঁশ, কাঠ যথেষ্ট সংগ্রহ করে রাখবেন এবং বন্যা হলে উদ্ধার-কার্যে নামাটাও একান্ত ভাবে রাজার আদিষ্ট কর্ম। সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার না করলে জরিমানা হবে।

আর এক দৈব বিপদ হল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের কালে কৌটিল্যের পরামর্শগুলি আমার কাছে রীতিমতো বৈপ্লবিক মনে হয়। তিনি বলেছেন— দুর্ভিক্ষের সময় রাজা অন্ন বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে চাষ-বাসের বীজ দেবেন বিনা পয়সায়। যাতে বিপন্ন সময়ে তাদের কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সে জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করবেন। তেমন দরকার হলে মিত্ররাষ্ট্রের রাজাকে অনুরোধ করে কিছুদিন তার রাজ্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন। আর দুটি শব্দ আছে 'কর্শন' আর 'বমন'। 'কর্শন' দুভাবে হতে পারে। যে প্রজাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে থাকবার প্রয়োজন নেই, তাদের তিনি অন্য জায়গায় সরিয়ে দেবেন। আর এক উপায় হল— ধনী প্রজাদের ওপর রাজকর বাড়িয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের তিনি সাহায্য করবেন। আর 'বমন' হল— ধনী প্রজাদের সঞ্চিত অর্থ থেকে জোর করে অর্থ সংগ্রহ করা অথবা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া— যেখানে খাবার মিলবে সহজে।

আধুনিকতা বা প্রগতিশীলতার ব্যাপারে কৌটিল্যের বোধ যে কতটা প্রখর ছিল, তার কতর উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তাতে এই প্রবন্ধের মাত্রা বাড়বে, অথচ দু-একটা উদাহরণ না দিলে কৌটিল্যের প্রখর বাস্তব-বোধটুকুও উপেক্ষিত থেকে যাবে। খুব সংক্ষেপে হলেও দুটি বিষয় এখানে বলব। আজকের দিনে আমরা যে-ধরনের অর্থনীতি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, তাতে শুল্ক ছাড় দেবার রেওয়াজটা কমে যাচ্ছে। শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে কৌটিল্যের ভাবনায় বেশ কিছু বাড়াবাড়ি আছে বলে মনে করেন এবং সেই কালে তাঁর কারণও ছিল, কিন্তু সেই শুল্ক আদায়ের মধ্যে যে আধুনিকতা আছে, তাতে পরিচ্ছন্ন নাগরিকতার পথ পরিষ্কার হয়। কৌটিল্য বোধহয় এমন অনেক রাজা দেখেছেন, যাঁরা যখন-তখন যে কোনও অছিলায় পৌর-জনপদবাসীর কাছ থেকে অন্যায় ভাবে অর্থ আদায় করছেন। কৌটিল্য মনে করেন— এই অভদ্রতা দূর করার জন্য প্রথমত প্রয়োজন একটি হৃষ্টপুষ্ট

রাজকোষ, যা না থাকলে রাজা অহেতুক পুর-জনপদবাসীকে উদ্ব্যস্ত করবেন— অল্পকোশো হি রাজা পৌর-জানপদানেব গ্রসতে।

কৌটিল্যের কর-গ্রহণের নীতি-নিয়ম বিশাল এবং মানুষের শ্রমে তৈরি রাষ্ট্রজাত এমন কোনও বস্তুই প্রায় নেই যেখানে রাজকর বা জরিমানার প্রসারিত হস্ত থেকে মুক্ত ছিল। গণিকা থেকে সুরা, ভেড়ার লোম থেকে দাঁড়িপাল্লার বাটখারা, সব কিছুর মধ্যেই কৌটিল্য অর্থের অভিসন্ধি লক্ষ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেও যেটা দেখার মতো, সেটা হল— যে জায়গায় যে জিনিস প্রচুর পরিমাণ জন্মাচ্ছে, কৌটিল্য সেখানেই সেটা বিক্রি করতে দেবেন না। কারণ এতে বিক্রেতার লাভ তলানিতে এসে ঠেকে এবং স্থানীয় ক্রেতা এতে যতই লাভবান হোন, উৎপাদনকারীর বস্তু সেখানে বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকে। কৌটিল্য চান— উৎপাদনকারী যেন তার বিক্রেয় বস্তু নিয়ে দূরস্থ বাজার ধরতে পারে। হয়তো এই কারণেই এক বিশাল বা মধ্যম জনপদের সঙ্গে দুর্গ-রাজধানীর একটা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন কৌটিল্য এবং সবার ওপরে চেয়েছিলেন একটি প্রশস্ত বণিকপথ-- যে পথ দিয়ে পরদেশের পণ্য স্বদেশে নিয়ে আসা যাবে এবং স্বদেশের পণ্য পরদেশে নিয়ে যাওয়া যাবে।

অন্য দেশীয় পণ্য এবং স্বদেশীয় পণ্যেব মধ্যে একটা 'কমপিটিশন মার্কেট' তৈরি করার দিকেও কৌটিল্যের নজর ছিল— কিন্তু সেটা স্বদেশকে বলি দিয়ে নয়। বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে তার ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্যের মধ্যে রাহা খরচ, নিজের এবং বাহক পশুর খাওয়া-খরচ, চোর-দস্যু থেকে পণ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার খরচ এবং ব্যবসা থেকে নিট লাভ— এই সমস্ত কিছু বিচার করার নীতি মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কৌটিল্য বলছেন— স্বদেশে পরদেশীয় পণ্যের দ্বার অবশ্যই খুলে দিতে হবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে রাজা যদি দেখেন যে, মোটা লাভ হওয়া সত্ত্বেও তা নিজের প্রজার পক্ষে বা স্বদেশীয় ব্যবসায়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে পীড়াদায়ক হয়ে যাচ্ছে, তা হলে তেমন লাভের মুখ তিনি বন্ধ করে দেবেন— স্থূলমপি চ লাভং প্রজানাম্ ঔপঘাতিকং বারয়েৎ। আবার যে-সব দ্রব্য রাষ্ট্রের পীড়া সৃষ্টি করে— যেমন, মদ, গাঁজা, আফিং— সেগুলির আমদানি রাজা বন্ধ করে দেবেন। অন্য দিকে রাজা যদি এমন দেখেন যে, ধান-যব ইত্যাদির উৎকৃষ্টতর বীজ অন্য দেশ থেকে আমদানি করলে নিজের দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হবে বা যে কোনও

বস্তু যা স্বদেশীয় পণ্যের মান বাড়াবে, রাজা সেই দ্রব্যের আমদানি শুল্ক ছাড় দেবেন এবং খুলে দেবেন বিদেশি পণ্যের দ্বার। এইরকম একটা অসাধারণ ব্যবসায়িক ভাবনা কৌটিল্য সেই যুগে বসে ভেবেছিলেন, এমন সংবাদ আমাদের পুলকিত করে।

পরিচ্ছন্ন নাগরিকতার শেষ বিষয় হিসেবে আমরা স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানের কথাটা জানাতে চাই। এ-কথা মানি যে, পুরাতন সংরক্ষণশীলতার কিছু কিছু ছায়া অবশ্যই একজন বিদগ্ধ শাস্ত্রকারের ওপরেও পড়ে, কিন্তু তবু কৌটিল্য এতটাই আধুনিক যে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রথমেই তিনি পুরুষ এবং স্ত্রীকে এক অদ্ভুত সমতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৌটিল্য মনে করেন— স্বামী এবং স্ত্রী এই দুয়ের দিক থেকেই এই সমতার প্রত্যাশা আছে। এত কাল শোনা গেছে, সতী লক্ষ্মী রমণী শুধু স্বামীর সেবা করবে, আর স্বামী-দেবতা পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন, কৌটিল্য এই একতরফা ধারণা পালটে দিয়ে বলেছেন— বিয়ের পর স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী যে-সব সেবাধর্ম এবং কর্তব্য আছে, তা যদি স্ত্রী না করেন, তা হলে সেই স্ত্রীর যেমন জরিমানা হবে, তেমনই স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি সেই সেবাধর্ম, তথা তাঁর কর্তব্যগুলি না করেন, তা হলে তার জরিমানা হবে স্ত্রীর দুই গুণ। ভাবতে পারেন— কৌটিল্যের কথায় কথায় জরিমানা' এমন হয় নাকি? আসলে এটা কিন্তু কৌটিল্যের বিচার-বিভাগীয় কথা। অর্থাৎ বহু দিন ঘর করার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি এমন অভিজ্ঞতা হয় যে একে অপরের প্রতি ঠিক যথাযুক্ত দায়িত্ব পালন করছেন না, তবে তারা আইন-আদালত করতে পারেন। আমাদের কাছে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা যে, দাম্পত্য দায়িত্বের বিবাদ নিয়েও আইন-আদালত করা যায় এবং সেখানে স্ত্রী-পুরুষের সমতা আছে।

আরও অবাক লাগে যখন কৌটিল্যের অতি আধুনিক ভাবনাটুকু প্রকাশ পায় ডিভোর্স নিয়ে। আগের কালের ধর্মশাস্ত্রকারেরা তো বিবাহের যাবজ্জীবন দিয়েই মানুষের দাম্পত্য জীবনকে পরম বন্ধনের সম্ভাবনায় গ্রথিত করে গেছেন। কিন্তু বিচিত্র মানুষ এবং ততোধিক বিচিত্র মনুষ্য-স্বভাবের মধ্যে কত যে বিশ্বাসভঙ্গ, কত যে আস্থাহীনতা এবং কত যে অন্যায়-অবিচার-মানসিক পীড়ন ঘটে, তার খবর ধর্মশাস্ত্রকারদের কানে পৌঁছলেও মনের কাছে পৌঁছয়নি। কৌটিল্য বাস্তববাদী মানুষ। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা তো যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভেবেইছেন কিন্তু তার সঙ্গে ভেবেছেন অর্থনৈতিক ভাবে অস্বাধীন স্ত্রীলোকের

জন্যও। স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া স্ত্রীর জন্য শুধু 'খোরপোশ' ব্যাপারটার নাম ছিল 'ভর্মণ্যা' অর্থাৎ একেবারে চুক্তি অনুযায়ী ভরণ-পোষণের দায়বদ্ধতা। কিন্তু এই চুক্তিপত্রের বাইরেও সেই বিচ্ছিন্না অবলার প্রতি কৌটিল্যের মমতাটুকু বোঝা যায় এবং সেই মমতা তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছেন এতকালের সহবাসী স্বামীর মধ্যে। বলেছেন— বার্ষিক ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত দ্রব্য তিনি দেবেনই, না হয় একটু বেশি দেবেন— অধিকং বা যথাপুরুষ-পরিব্যাপং সবিশেষং দদ্যাৎ।

এর পরে তো আরও আছে আইনের সেকশন, সাব-সেকশন। অত আলোচনার পরিসর এখানে নেই। সবশেষের কথাটি হল— পরিচ্ছন্ন নাগরিকতা এবং আধুনিকতার বিষয়ে আরও যে কত কথা আছে কৌটিল্যে, তাও এখানে বলে শেষ করা যাবে না। তবে নাগরিকতা সম্বন্ধে যত নিয়ম-বিধি এবং শিক্ষা থাকুক, কৌটিল্য পড়ার পর আপনার এই ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠবে যে, আইনি ব্যবস্থা এবং জরিমানা ছাড়া আর কোনও উপায়েই পরিচ্ছন্ন নাগরিক তৈরি করা যায় না। নিজের সুবিধার সঙ্গে অপরের সুবিধেটা দেখতে গেলে যে নিজেরও কিছু অসুবিধে হবে— এই অধিকার এবং কর্তব্যের তত্ত্ব বোঝানোর জন্যই নাগরিক আইন এবং জরিমানার প্রয়োজন বোধহয় এখনও একই রকম আছে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস: প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা

স্থান, কাল এবং প্রসঙ্গের ভেদে একই বস্তু দুই, তিন, চার রকমের চেহারা নেয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ফরাসি বিপ্লব, চিন-রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলন— এই সব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস ছিল, ছিল প্রতিপক্ষের রক্তপাত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদিতার মধ্যে যে খলতার দুষ্ট চিহ্ন আছে, সে চিহ্ন মুছে দিয়ে বৃহত্তর এবং মহত্তর এক আদর্শের ব্যঞ্জনায় এই সব আন্দোলন দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ অথবা দর্শনের মাহাত্ম্য লাভ করেছে। সন্ত্রাসবাদ যে এই মাহাত্ম্য লাভ করে না, তার একটা বড় কারণ হয়তো— এখানে হিংসা, নাশকতার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। ধর্ম, ভাষা, রাষ্ট্র, জাতি অথবা অর্থনৈতিক প্রতিকার, যে উদ্দেশ্যেই হিংসা প্ররোচিত হোক না কেন, সেই হিংসার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না। যে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই রাষ্ট্রের নিরীহ

মানুষকে যত্র-তত্র হত্যা করা, সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনের জন্য বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ করা, এমনকী সেই রাষ্ট্রকে বিব্রত করার জন্য অন্যতর রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনও সন্ত্রাসবাদিতার পরিসরের মধ্যেই পড়ে।

সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসবাদের চরিত্র এতই বিচিত্র যে পণ্ডিত-সজ্জনেরা পৃথিবীময় সংঘটিত বিভিন্নধর্মী সন্ত্রাসবাদের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারেননি এবং এই প্রবন্ধে অধুনা-প্রচলিত সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের যে স্বতোবিভিন্ন চরিত্র আছে বা প্রকার আছে, সেই প্রকারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল— অন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং অন্যটি হল— এক রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকার কর্তৃক নিজ রাষ্ট্রে এবং পররাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাস। আমরা বলতে চাই— প্রাচীনকালে যখন রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই সময় থেকে আজকে যে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের তথাকথিত সুব্যবস্থা চলছে, সেখানেও বহুক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ, প্রতিনেতা এবং বিপক্ষ দলের প্রতি যে মনোভাব এবং আচরণ ব্যক্ত হয়, তা অনেক সময়ই সন্ত্রাসবাদিতার নামান্তর।

প্রাচীন রাজতন্ত্রের পরম্পরায় রাজারা নিজেদেব ব্যক্তিশাসন বজায় রাখার জন্য যেভাবে শত্রুপক্ষকে উচ্ছিন্ন করার কথা ভাবতেন, গণতন্ত্রের হোতারাও কখনও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নামে পার্শ্ববর্তী অথবা দূববর্তী শত্রুরাষ্ট্রকে উচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন, আর অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জনগণের শান্তি, সুরক্ষা এবং স্বার্থরক্ষার নামে নির্বিচারে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন করেন— তবে একটু রেখে-ঢেকে এবং তাতে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাটা আরও জটিল এবং ধূসর হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, প্রাচীন কালে রাজতন্ত্রসেবী রাজারা অন্তঃরাষ্ট্রীয় তথা পররাষ্ট্রীয় শত্রুশাসন করবার জন্য যে ধরনের সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতেন, এখনকার দিনের পরিশীলিত সমাজব্যবস্থাতেও রাষ্ট্র সেই সন্ত্রাসী ভূমিকাই পালন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নামে। অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমাদের ভাবনাব বিষয় হবে না এখানে, তবে রাজতন্ত্রের অবশিষ্ট স্মারক হিসেবে সেই সন্ত্রাস তুলনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হবে গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও।

ভগবদ্গীতার যে কথাটা প্রাবাদিক স্তরে পৌঁছেছে, সেটা আমরা সকলেই জানি— পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। পরম ঈশ্বর যেমন ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতার গ্রহণ করেন, প্রাচীন রাজারা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে গণ্য না হলেও, তাঁরা ঈশ্বরের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতেন, অতএব ধর্ম-রক্ষা

করাটাকে তাঁরাও নিজেদের কাজ বলেই মনে করতেন। কারণ, ধর্ম মানে শৃঙ্খলা এবং রাজাকেই ধর্মের প্রতিভূ বলে মনে করা হয়েছে প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে— বর্ণানাম্ আশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টো' ভিরক্ষিতা। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বত্রই যদিও প্রজাকল্যাণ এবং জনকল্যাণের উদার আদর্শেই রাজার কৃত্য-কর্তব্যগুলি নির্ধারিত হয়েছে, তবু রাজশাসন পরিচালনা করার সময়— যাঁরা রাজার বিপক্ষতা সৃষ্টি করবেন, কিংবা যাঁরা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করবেন, তাদের প্রতি কোনও মৃদু, উদার বা শিথিল আচরণের অবকাশ প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রকারেরা রাখেননি।

মনু-মহারাজ এ-ব্যাপারে দুটিমাত্র পক্ষ বোঝেন। এক, যাঁরা রাজার অনুকূলে আছেন রাজাও তাঁদেরই নিজের 'ইষ্ট' বা অভীষ্ট জন বলে মনে করবেন, আর যাঁরা বিদ্বেষী, রাজাকে যাঁরা পছন্দ করছেন না, তাঁরা রাজার 'অনিষ্ট' পক্ষ অর্থাৎ তাঁরা রাজার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ বিদ্বেষীদের রাজা কোনও মতেই বাঁচতে দেবেন না। মনুর মতে রাজার প্রতি যাঁরা বিদ্বেষ আচরণ করছেন তাঁদেরকে খুব তাড়াতাড়িই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য রাজা সিদ্ধান্ত নেন— তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ— অতএব সাধারণ মানুষের প্রতি মনুর উপদেশ— ভুলেও যেন রাজার প্রতিকূল আচরণ কোরো না। রাজার উৎপত্তি-বিষয়ে মনু-মহারাজ ঐশ্বরিক মতবাদে বিশ্বাস করেন বলেই তাঁর উপদেশের মধ্যে যৌক্তিকতা কম আছে, এটা মনে হলেও এ-কথা মাথায় রাখতে হবে যে, কৌটিল্য এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদেরাও কিন্তু একটা বিষয়ে একমত এবং সেটা হল— রাজা কখনও কাউকে বিশ্বাস করবেন না এবং এই অবিশ্বাস এতই প্রগাঢ় হওয়া উচিত যে, রাজার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীরা এবং নিজের ঔরসজাত রাজপুত্রেরাও তাঁর বিশ্বাসের পাত্র নন। আর রাজোপজীবী মন্ত্রী-অমাত্য-সেনাপতি এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বৃত্তি সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কৌটিল্য বলেছেন— রাজার কাছে যারা জীবিকার জন্য আশ্রয় নিয়েছে, তাদের কাজ অনেকটা আগুনের মধ্যে খেলা দেখানোর মতো— আগুন তো তবু ভাল, কেননা দেহের যে অংশটুকু অগ্নিস্পৃষ্ট হয়, সেই অংশটুকুই শুধু দগ্ধ হয়, কিন্তু রাজা হলেন এমনই এক আগুন, যা মানুষের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি সব ধ্বংস করে দেয়। আগুনের এই উপমাটা কৌটিল্য যে ভাবে দিয়েছেন, মনুও ঠিক সেইভাবেই দিয়েছেন।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এবং রাজোপজীবী মানুষদের সবাইকেই যদি অবিশ্বাস করতে হয়, তাহলে রাজার দিক থেকেই একটা সার্বত্রিক সন্ত্রাস-সৃষ্টির ভাবনা আপনিই চলে আসে। আমরা বলেছি— প্রাচীন রাজতন্ত্রে রাজারা যে কখনও কখনও ভীতিজনক হয়ে উঠতেন কিংবা রাজনৈতিকভাবেই যে তাঁদের সন্ত্রাসজনক হয়ে ওঠাটা শাস্ত্রসম্মত ছিল, তার পিছনে পূর্বকল্প হল একটাই— রাজার কাছে যে ব্যক্তি, যে গোষ্ঠী অথবা যে রাষ্ট্র 'অনিষ্ট' অনভীষ্ট বা প্রতিকূল, তাদের উচ্ছিন্ন করাটাই তৎকালীন রাজার পরম এবং চরম উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটাও রাজধর্মের অন্তর্গত ছিল। রাজতন্ত্রে রাজা এবং তাঁর রাষ্ট্রের মধ্যে যেহেতু ব্যক্তিসম্বন্ধটা খুব বেশিমাত্রায় জাগ্রত ছিল, তাই রাজার আত্মরক্ষার বিষয়টিও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনই প্রজার সুরক্ষা। ফলে অনিষ্ট-শমন এবং প্রতিকূলতা নাশ করার জন্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছিল রীতিমতো জরুরি এবং তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং পররাষ্ট্রে দুই জায়গাতেই প্রসারিত ছিল।

এ-কথা অবশ্যই এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তিসর্বস্বতা থাকলেও দার্শনিকভাবে এবং নীতিগতভাবে রাজতন্ত্রের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার অবসর ছিল না কোনও। ইচ্ছে করলে রাজা জোর করেই নিজের ইচ্ছে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন, কিংবা দণ্ডবিধানও করতে পারতেন মন্ত্রী-অমাত্যের অভিমত উপেক্ষা করে, কিন্তু দণ্ডের এতাদৃশ প্রয়োগ রাজতন্ত্রের অতিবড় সমর্থক মনু-কৌটিল্যরা কেউই অনুমোদন করেননি। দণ্ড প্রয়োগের ব্যাপারে মনুর সোচ্ছ্বাস মন্তব্যগুলি দার্শনিকতার বিচারে কৌটিল্যের চেয়ে খানিকটা রূঢ় মনে হবে নিশ্চয়ই, এমনকী এক জায়গায় রাজনীতিবিদদের যান্ত্রিকতা এবং স্বার্থপর তথা আত্মলাভের কারণেই চিন্তা-বোধ-হীন দণ্ড-প্রয়োগের হাজার দৃষ্টান্ত মনে রেখেও মনু বলেছেন— ন্যায়-নীতি-শৃঙ্খলা রক্ষার মূল প্রতিভূ হল দণ্ড। এই অকপট উক্তি এবং দণ্ডের সম্বন্ধে একই সঙ্গে রাজা, পুরুষ, নেতা এবং শাসিতা শব্দের প্রয়োগ করে মনু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শুধু রাজতন্ত্র নয়, অন্যবিধ শাসনতন্ত্রেও বিপন্ন সময়ে দণ্ডই হল শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন।

দণ্ডের এই উৎকট এবং অকপট স্বরূপ মনুসংহিতায় যতই প্রশংসিত হোক অন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রজা বা অন্যতর রাষ্ট্র— কারও উপরেই অন্যায়ভাবে দণ্ডপ্রয়োগের কথা মনু বলবেন না এবং তা বললে রাজা শুধুমাত্র সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারী হিসেবেই

চিহ্নিত হতেন। অন্যদিকে অন্যায়কারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করাটাও সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না, কেননা রাজার প্রতি যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত বিরোধিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে, সে যুক্তিসঙ্গতভাবেই তা করুক বা ন্যায় অনুসারেই করুক, সেই ব্যক্তিকে কিন্তু রাজা জীবিত থাকতে দেবেন না এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই অনিষ্ট ব্যক্তিকে বিনাশের উপায় রাজা খুঁজে বার করবেন— এটাই মনুর মত এবং রাজতান্ত্রিক সংবিধানে এটাই প্রায় নিয়মের মধ্যে পড়ে। যেন-তেন প্রকারে শত্রুনাশের পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে কৌটিল্যও মনুর সঙ্গে একমত হবেন বটে, তবে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ বলেই তাঁর কথা এত স্পষ্ট নয়।

এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, ব্যক্তিগত শত্রুই হোক অথবা রাষ্ট্রের শত্রুই হোক অথবা সেটা হোক শত্রুরাষ্ট্র— এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দণ্ডবিধানের ব্যাপারে এক ধরনের দার্শনিকতা এবং নৈতিকতা কাজ করেছে এবং সেই কারণেই চরম দণ্ড বিধানের আগে নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক বোধের ভিত্তিতেই চতুরুপায়ের তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড— এই চারটি হল রাজনৈতিক উপায় এবং এই চতুরুপায় অন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যক্তিগত শত্রুর ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য ছিল তেমনই পররাষ্ট্রীয় বহিঃশত্রুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। চারটি উপায়ের মধ্যে তিনটিই যদি অসফল হয়, তবেই দণ্ডের মাধ্যমে শত্রুর শাস্তিবিধান করে তাকে অনুকূলে নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন মনু। অর্থাৎ ভালো কথায় এবং আলাপ-আলোচনায় সাম-নীতিতে যদি কাজ না হয়, তবে দান-নীতি প্রয়োগ করে কিছু দান দিয়ে শত্রুর লোভ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেওয়াটাও মনু যেমন পছন্দ করেন না, তেমনই ভেদনীতির মাধ্যমে অযথা সময় নষ্ট করাটাও তাঁর মত নয়। সামে কাজ না হলেই দণ্ড দান করাটাই মনু যথার্থ মনে করেন।

দণ্ডদানের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের মত একটু ভিন্ন। তাঁর পূর্বকালের যে বিবরণ তাঁরই লেখায় পূর্বাচার্যদের অভিমত হিসেবে পাওয়া যায়, তাতে দেখি, রাজনীতিবিদেরা কেউ কেউ দণ্ডপ্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারে নির্বিকার থাকতে বলেছেন। তাঁরা মনে করেন— মানুষকে নিজের অধীনে নিয়ে আসবার এমন ভাল উপায় আর নেই, যেমনটি দণ্ড। কৌটিল্যের পূর্বসূরিদের সোজা-সাপটা বক্তব্য এইটাই যে, যেমনভাবেই হোক ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে সকল মানুষকে নিজের বশে নিয়ে আসাটাই রাজতন্ত্রের সঠিক পদক্ষেপ। কৌটিল্য অবশ্য

সযৌক্তিক ভাবেই এই ধরনের আদর্শকে প্রায় সন্ত্রাসবাদের আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন— এমনটি চলতে থাকলে বানপ্রস্থী পরিব্রাজকেরাও রাজার উপরে বিরূপ হয়ে উঠবেন, সাধারণ প্রজারা তো কথাই নেই।

পররাষ্ট্রীয় নীতিতেও কৌটিল্য ক্রমান্বয়ে চতুরুপায় প্রয়োগের পক্ষপাতী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে কৌটিল্য বলেছেন যে, চতুরুপায়ের উপযুক্ত হল বলবান শত্রু। তিনি মনে করেন— দুর্বল শত্রুকে সামনীতি এবং দাননীতির দ্বারাই বশীভূত করা যেতে পারে আর বলবান শত্রুকে বশে আনতে গেলে ভেদ এবং দণ্ডের প্রয়োগ করা উচিত— সাম-দানাভ্যাং দুর্বলান্ উপনময়েৎ, ভেদ-দণ্ডাভ্যাং বলবতঃ। ভেদ এবং দণ্ডের মাধ্যমে বলবান শত্রুকে শমন করার যে বুদ্ধি, তার মধ্যেই কৌটিলীয় সন্ত্রাসের প্রকৃতি লুকানো আছে এবং তা যে আধুনিক অর্থেও বেশ প্রযোজ্য এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রকৃতিই যে এই ভেদ-দণ্ডের মধ্যে সমাহিত, তা আমরা পরে দেখব। লক্ষণীয় ব্যাপার হল— দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৌটিল্য দার্শনিকভাবে এবং নীতিগতভাবে মনুর মত এবং তাঁর পূর্বাচার্যের মতের পরিপন্থী হলেও রাজার ইষ্টানিষ্ট কিংবা অনুকূল-প্রতিকূল ব্যক্তির বিষয়ে তিনি যে খুব ভিন্নমত, তা তাঁর বাস্তব মন্তব্যগুলি থেকে মনে হয় না।

মনু-মহারাজের রাজধর্ম-বিশ্লেষণে রাজার হাতে যত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তার মর্মমূলে আছে দণ্ড। তিনি সামনীতির যতই প্রশংসা করুন, কিন্তু সমস্ত প্রজাবর্গ কিংবা পররাষ্ট্রের কাছেও রাজার আকার-প্রকার-অভিসন্ধি খুব স্নিগ্ধ-মধুর হয়ে উঠুক, এটা মনুর আকাঙ্ক্ষিত রাজধর্ম নয় এবং তা বোঝা যায় একটিমাত্র শ্লোক থেকেই। মনু বলেছেন— রাজাকে সদা-সর্বদা এই ভয় সর্বত্র জিইয়ে রাখতে হবে যেন শাস্তি দেবার জন্য তিনি অভিমুখ হয়েই আছেন, সৈন্য-সামন্তেরাও অস্ত্রশস্ত্রে শান দিয়ে, হাতি-ঘোড়া-রথের কুচকাওয়াজ করে যুদ্ধের প্রকট অভ্যাস প্রদর্শন করবেন, আর তার সঙ্গে থাকবে অস্ত্রবিদ্যার অভ্যাস প্রকাশিতভাবে দেখানো— নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ। মনুর এই রাজধর্ম বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে যে কোমল কোনও অভিসন্ধি নেই, অথবা রাজাকে প্রজামনোমোহন রূপে প্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব তাৎপর্যও যে মনু অনুভব করছেন না, সেটা প্রমাণিত হয়— কৌটিল্য যখন পূর্বাচার্যদের প্রস্তাবিত তীক্ষ্ণ দণ্ডের প্রসঙ্গ খণ্ডন করার সময় হুবহু মনুর মতটাই উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য বলেছেন— আমার পূর্বাচার্যরা বলে থাকেন যে, লোকযাত্রা, সমাজ-ব্যবহার

এই দণ্ডনীতির উপরেই নির্ভর করে। অতএব যে রাজা লোকযাত্রার সম্যক অনুষ্ঠানে তৎপর, তিনি নিত্য উদ্যতদণ্ড অর্থাৎ দণ্ড প্রণয়নে সদা-সর্বদা উদ্যত থাকবেন— নিত্যম্ উদ্যতদণ্ডঃ স্যাৎ। কেননা, আচার্যের এইটাই মত যে, দণ্ড ছাড়া অন্য কোনও প্রকার সাধন তেমন কার্যকর হতে পারে না, যাতে করে সকলকে বশে রাখা যায়।

কৌটিল্য নীতিগতভাবে এই মত মানেন না। কেননা সদা-সর্বদা উদ্যতদণ্ড রাজা অনেক ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ণ দণ্ডের পক্ষপাতী হয়ে পড়তে পাবেন এবং সেই কারণে সমস্ত লোকের কাছে রাজার একটা সন্ত্রাসীভাব প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকায় সকলের কাছেই তিনি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারেন বলে মনে করেন কৌটিল্য। কিন্তু নীতিগতভাবে এই মত না মানলেও অন্তঃরাষ্ট্রীয় তথা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কৌটিল্যের প্রস্তাবিত নীতিগুলি বাস্তবে এক প্রকার সন্ত্রাসের চেহারাই প্রকট করে তুলবে। সে-কথায় আমরা পরে আসব এবং এখন যে প্রসঙ্গে আলোচনা করব, সেখানেও অবসর অনুযায়ী আমরা কৌটিল্যের মতও উল্লেখ করব। প্রথমে জানানো দরকার— কৌটিল্য যেটা পূর্বাচার্যের মত বলে উল্লেখ করেছেন, তা প্রধানত মনুর মতের সঙ্গে আপাতভাবে মিলে গেলেও এটা আসলে প্রাচীনপন্থী রাষ্ট্রনীতিবিদদের অনেকেরই মত। এই ধারণার নৈতিক এবং বাস্তব সমর্থন সবচেয়ে ভাল পাওয়া যাবে ভারতবর্ষের মহাকাব্যগুলিতে। মহাভারতেই প্রধানত রাজা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চরিত্র খুব স্পষ্ট, এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও রামায়ণেও এই সন্ত্রাসের প্রকৃতি ধরা পড়ে। একই সঙ্গে বলা দরকার— এই সন্ত্রাসের পিছনে মহাকাব্যকারের নৈতিক সমর্থন নেই এবং সেই জন্যই এই সন্ত্রাস সব সময়েই প্রতিনায়কের মনোবৃত্তি-প্রসূত— যা অন্যায় এবং অধর্মের সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয়েছে। এই সন্ত্রাসের বিপ্রতীপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য অথবা রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং সার্বিক রামরাজ্য।

রাজা বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তত্ত্বগত যে চেহারাটা আমরা মনুসংহিতা, মহাভারত বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাই, সেটা প্রতিপক্ষীয় সন্ত্রাসের কারণ থেকেও জন্ম নিয়েছে, আবার আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে— প্রতিপক্ষ যে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে তার সুপ্রাচীন অন্তর্গত কারণ লুকিয়ে আছে আর্যায়ণের মধ্যে। এ কথা মানতেই হবে যে, সুপ্রাচীন কালে আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর যে প্রকৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদানগুলিতে অথবা বেদ, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ-গ্রন্থগুলির

মধ্যে পাওয়া যায়, তাতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্যরা যথেষ্ট যুদ্ধপ্রিয় জনগোষ্ঠী ছিলেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জীবনধারণের জন্য খাদ্য, আবাস এবং সুস্থিতি যেহেতু যথেষ্টই জরুরি ছিল, অতএব যুদ্ধ করার জন্য আর্যদের কোনও ভাল অজুহাত দরকার ছিল না। আবাসের জন্য অথবা কৃষিকর্মের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার কবার কাজটা যেহেতু পরাজিত শত্রুকে দিয়েই অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তাই প্রায় যাযাবর-বৃত্তি জনগোষ্ঠীর পক্ষে যুদ্ধ করাটা অনেক বেশি সুবিধেজনকও। আর যুদ্ধ যদি একবার উত্তেজিত রক্তেব মধ্যে সংক্রমিত হয়, তাহলে সেখানে এক ধবনের সন্ত্রাস উৎপন্ন হবেই।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে এমন বহুতর ঋঙ্‌মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে যেখানে আর্যগোষ্ঠীব যুদ্ধনায়ক ইন্দ্র তাঁর সামরিক তেজের দ্বারা ভাবতবর্ষের পূর্বনিবাসী জনগোষ্ঠীব ক্ষেত্র, ভূমি এবং সম্পত্তি অধিকার করে নিয়েছিলেন। পূর্বস্থিত জনসাধারণ অনেক সময়েই দস্যু বা দাস নামে চিহ্নিত এবং তাঁদের অনেকের নামও মন্ত্রের মধ্যে সবলভাবে উল্লিখিত হয়েছে। একটি মন্ত্রে স্পষ্ট বলা আছে— ইন্দ্র অন্য সহযোগী দেবতাদের সঙ্গে মিলে তথাকথিত দস্যুদের শিম্যু নামে এক প্রতিপক্ষ-নেতাকে হত্যা করে তাদের কৃষিক্ষেত্র নিজেদের শ্বেতবর্ণ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ কবে নিয়েছিলেন— দস্যুঞ্ছিম্যুংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা, সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ। আসলে বেদেব মধ্যে আর্য জনগোষ্ঠীব বহুতর আহত এবং হত নেতাদের নামও এমনভাবে চিহ্নিত হয়েছে যে, ইন্দ্র রীতিমতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিকতা এসেছে আর্যেতব গোষ্ঠীর জমি, সম্পত্তি, পশুধন এবং শস্যের মূল্যে।

বৈদিক স্তুতিমন্ত্রের মধ্যে অন্যান্য যুদ্ধপ্রিয় দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিভিন্ন যুদ্ধোন্মত্ততার যে-সব ছোট ছোট চিত্র ফুটে উঠেছে, সেগুলির সারবত্তা বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তী সময়েব যুদ্ধনীতির মধ্যে যে মহাকাব্যিক নৈতিকতা লক্ষ করা যায় তাব এতটুকুও তখন উপস্থিত ছিল না। ফলত তৎকালীন যুদ্ধনীতির মধ্যে বেশির ভাগটাই ছিল সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের চেহারা আরও শাণিত হয়েছে যুদ্ধাস্ত্রের অঙ্গে-অঙ্গে লৌহ ব্যবহারের সূচনায়। ১৪৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিপর্যয় ঘটে যাবার পর ধাতুর আকর গলিয়ে লোহা পৃথক করে নেবার (iron-smelting) গূঢ় বিদ্যাটি আশপাশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে যেতে থাকে; বেকাব হয়ে-পড়া লৌহ-কর্মকারেরা কাজ পেতে থাকে অন্যান্য প্রাচীন যুদ্ধপ্রিয় জনগোষ্ঠীর কাছে। বেদের মধ্যে রিভুদের নাম পাওয়া যাবে,

যারা ইন্দ্রের ভয়ংকর লৌহবজ্রের উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন। সিন্ধু-সভ্যতার আদিবাসী মানুষেরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানতেন, কিন্তু লোহার ব্যবহার জানতেন না। পণ্ডিতদের মতে মোটামুটি একাদশ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ভারতের মাটিতে লৌহকর্মের প্রবর্তন ঘটে এবং সেই লোহাই ইন্দ্রের ভয়ংকর শত্রুঘাতি অস্ত্র বজ্রের নিদান— যার মাধ্যমে অহি, নমুচি, ধুনি, শিম্ব্য, চুমুরি এবং বৃত্রের মতো প্রাগার্য যুদ্ধনায়কেরা একে-একে ইন্দ্রের কাছে আনত হন। অগ্নি, বায়ু, সোম, মরুৎ অথবা বিষ্ণু— এই সব দেবতাদের নামও যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত বটে, তবে তাঁরা শত্রুদমনে ইন্দ্রের সহায়তা করেন মাত্র, মূল নায়ক ইন্দ্রই।

ইন্দ্রের মতো নির্মম অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে প্রাগার্য ভারতীয়দের যুদ্ধকর্ম অত সহজ ছিল না, অন্তত অস্ত্রযুদ্ধ তো সহজ ছিলই না। এর ফলে ইতস্তত চোরাগোপ্তা আক্রমণই তাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। বৈদিকরা এই উপায়ের নাম দিয়েছেন 'মায়া', যার মধ্যে লুকিয়ে আছে ছলনা, কপটতা এবং ইন্দ্রজাল। এই 'মায়া' ব্যাপারটা যে তথাকথিত অসুরদেরই একচেটিয়া ছিল, তা নয়, কেননা অতি পরাক্রমী ইন্দ্রকেও আমরা ছলনার মাধ্যমে অসুরদের ভূমি-সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে দেখেছি। কিন্তু তবুও বলতেই হবে যে উন্নততর অস্ত্রশক্তির অধিকারী আর্য যুদ্ধনায়কদের বিরুদ্ধে অসুর-রাক্ষসদের অন্যতম প্রতিরোধই ছিল আকস্মিক সন্ত্রাস এবং মায়াযুদ্ধ। অসুরদের ছলনা-কপটতা এবং আকস্মিক সন্ত্রাসের এই সূত্র, ভারতবর্ষের প্রাচীন দুই কাব্য রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যেও বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক যজ্ঞস্থলগুলিতে বারবার হানা দিয়েছেন তথাকথিত অসুর-রাক্ষসেরা, আকস্মিক সন্ত্রাসে ব্রাহ্মণদের উত্ত্যক্ত করেছেন বারবার— এমন ঘটনা তো রামায়ণে বিশেষভাবে পাওয়া যাবে, আর মহাভারতে এই সন্ত্রাসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন আর্যদেরই অন্যতর এক জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কিন্তু তাঁদেরও পূর্বজন্মের পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে বিবাদের প্রতীক কলি এবং পৌলস্ত্য যক্ষ-রাক্ষসদের পরিচয়ে।

রামায়ণে আমরা দেখেছি— বিশ্বামিত্র মুনি দশরথ-রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে বলেছেন— আমরা যে যজ্ঞ-ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলাম, সেখানে দুই মায়াবী রাক্ষস এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে— তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ। এই রাক্ষসেরা— যাদের নাম মারীচ এবং সুবাহু— তারা যেভাবে অমেধ্য মাংস এবং রক্তে যজ্ঞস্থল অপবিত্র করে দিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করে দিত, সেটা ছিল ব্রাহ্মণ্যের ওপরে চোরাগোপ্তা আঘাত; তবু এখানে কোনও গুপ্তহত্যার চক্রান্ত

নেই যেটা পাওয়া যাবে অরণ্য-কাণ্ডে। সেখানে যোগী মুনি-ঋষিরা রামচন্দ্রের কাছে রাজা হিসেবে নালিশ জানিয়েছেন রাক্ষসদের উৎপীড়ন-কাহিনি শুনিয়ে। এমনও বলেছেন যে, রাক্ষসদের আকস্মিক আক্রমণে কীভাবে তাঁরা প্রাণ হারাচ্ছেন। পম্পা-সরোবর, মন্দাকিনী নদীর তীর এবং চিত্রকূট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কত শত মুনির মৃত শরীরও তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন রাক্ষসদের গুপ্ত এবং আকস্মিক আক্রমণের প্রমাণ হিসেবে—

এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈ বহূনাং বহুধা বনে॥

রামায়ণে রাক্ষসদের অবস্থান এবং আক্রমণের প্রকৃতি বিচার করলে বোঝা যায় যে, উত্তর, পশ্চিম এমনকী পূর্বভারতেও আর্যায়ণ-পদ্ধতি অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর দক্ষিণ ভারতের দিকে ছড়িয়ে পড়া আর্যেতর জনগোষ্ঠী— যাঁরা অন্তত আর্যদের উন্নততর অস্ত্রসিদ্ধির সামনে সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছিলেন না, তাঁরা নিজস্ব ভূসম্পত্তি হারিয়ে এই অদ্ভুত সন্ত্রাসের পথই বেছে নিয়েছিলেন। এই প্রতিক্রিয়া অন্তত স্বাভাবিক ছিল এবং রামায়ণে রাক্ষসদের এই গুপ্ত এবং প্রকীর্ণ সন্ত্রাসের কাহিনি আমরা এই কারণেই লিপিবদ্ধ করছি যাতে উলটো দিক থেকে বোঝা যায় যে, আর্যায়ণের পূর্বকল্পে যেভাবে আর্যেতর জনজাতি তথাকথিত দেবতাপ্রমাণ আর্যদের হাতে যেভাবে পর্যুদস্ত হয়ে ভূমি-সম্পত্তি হারিয়েছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়া ঘটেছে চোরাগোপ্তা গুপ্ত আক্রমণের মাধ্যমে। সম্মুখ-যুদ্ধে অস্ত্রসিদ্ধ আর্যদের হাতে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি এবং বহুতর হিংসাকর্মই যে তাঁদের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় মন্ত্রোদ্দিষ্ট আক্রোশের মধ্যে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগ্নির উদ্দেশে বলছেন— যারা চোর, যারা বাড়ি ভেঙে ডাকাতি করে, যারা তস্কর তাদের সবাইকে তোমার দাঁত দিয়ে চিবোও, তোমার হনু দিয়ে মস্ মস্ করে গুঁড়ো করে ফেল।

এখানে চোর, তস্কর, দস্যু, অপিচ গুপ্ত তথা প্রকট শত্রুর বিদ্বেষ-ভাবনা থেকে অগ্নির কাছে যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে বৈদিক জনজাতির ক্রোধাবেশটুকু টের পাওয়া যায়। এই ক্রোধের মধ্যেও মায়া নেই, মমতা নেই, এমনকী নীতি নিয়মও কিছু নেই এবং সেই জন্যই সেটাকেও সন্ত্রাস বলতে আমাদের অসুবিধে হয় না। বস্তুত সন্ত্রাস কথাটার মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধের বলদর্পিত নৈতিক তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য কোনওটাই নেই। যা আছে, তার অনেকটাই

ভীতিজনক এবং নৃশংস হয়ে ওঠার পদ্ধতি এবং সেই জন্যই সেটাকে সন্ত্রাস বলতে আমাদের বাধে না। বরঞ্চ বলা ভাল— দেবাসুর-দ্বন্দ্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বৃহৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সন্ত্রাস।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় অগ্নিদেবের কাছে পূর্বোক্ত প্রার্থনায় যে দস্যু-তস্কর তথা বিদ্বিষ্ট জনজাতিকে তাঁর দাঁতের মধ্যে পিষ্ট করার আক্রোশ দেখানো হয়েছে, সেটা রূপক মনে করার কোনও কারণ নেই। কেননা খোদ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই এমন-এমন মন্ত্র অনেক পাওয়া যাবে, যেখানে তথাকথিত ঐতিহাসিক দেবচরিত্র এবং বৈদিক যুদ্ধনায়ক ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে বেদ-বিদ্বেষীদের বিচিত্র উপায়ে ধ্বংস করার জন্য। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল— এই ধ্বংসের জন্য প্রকট যুদ্ধের পাশাপাশি জলে ডুবিয়ে মারা, আগুন দিয়ে পোড়ানো, বিষদিগ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার— এগুলির কোনওটাই বাদ যেত না। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নামই 'রাক্ষস-বিনাশী অগ্নি'। এই সূক্তে 'রাক্ষস' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরাই যাঁরা ব্যবহারিকভাবেই শত্রু এবং যাঁরা আর্য-জনজাতির ভাবনা-বিশ্বাসের বিরোধী অর্থাৎ তাদের 'heathen', 'unbeliever' বলা হয়েছে— যারা এই বেদস্তুতি মানে না, সেই সব রাক্ষসদের তুমি ভস্ম করে দাও। আমাদের শত্রু এবং আমাদের নিন্দাবাদীদের নিন্দা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর— দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ।

রাক্ষস ধ্বংসী অগ্নির কাছে যে প্রার্থনা-সূক্তি রচিত হয়েছে, তার বিশেষত্ব হল— এখানেও দুই ধরনের শত্রুর কথা বলা হচ্ছে— যে শত্রু দূরে আছে তারা এবং যারা কাছে আছে তারাও— যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে। নিকটে এবং দূরে অবস্থিত শত্রুর সঠিক অবস্থান জানবার জন্য অগ্নিকে বলা হয়েছে শীঘ্রতম চর নিয়োগ করতে এবং তারপর তাদের উপর আক্রমণ চালাতে। এই আক্রমণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়ে বৈদিক মন্ত্রকার বলছেন— হে অগ্নি! তুমি তোমার সমস্ত দাহাত্মক তেজোরাশি নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হও, তারপর সেই অগ্নিজ্বালায় পুড়িয়ে মার আমাদের শত্রুদের— উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাঁ ওষতাত্তিগ্মহেতে। আগুনে পুড়িয়ে মারার উপায়টা সঠিক যুদ্ধনীতির মধ্যে পড়ে না, যেমন পড়ে না জলে ডুবিয়ে মারার নৃশংসতা। অতি-জড়বাদী পণ্ডিতেরাও ইন্দ্রকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কেননা উরণ, অর্বুদ, পিপ্রু, শুষ্ণ, নমুচি, রুধিক্রা ইত্যাদি অসুর-রাক্ষসদের প্রতিপক্ষে ইন্দ্রের দাক্ষিণ্যপ্রাপ্ত কুৎস, আয়ু, অতিথিগ্ব অথবা সুদাসের মতো

রাজারাও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এঁদের পক্ষে যুদ্ধ করবার সময় অথবা স্বেচ্ছায় প্রতিপক্ষ শাতন করবার সময় ইন্দ্র শত শত প্রতিপক্ষীয় নেতাদের ভূমিতে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিয়েছেন— এটা কোনও বিরুদ্ধ সংবাদ নয়, কিন্তু সংবাদ এটাই যে শ্রুত, কবষ এবং বৃদ্ধ নামের তিন জনকে তিনি জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

আগুনে পুড়িয়ে মারা, জলে ডুবিয়ে মারা— এই ধরনের নৃশংসতার সঙ্গে বিষদিগ্ধ অস্ত্রের প্রয়োগ করে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করাটাও আর্য জনগোষ্ঠীর পরম নৃশংসতার মধ্যে পড়ে। বিষদিগ্ধ তির যেহেতু অতি শীঘ্র শত্রুর বিনাশ ঘটায়, অতএব তার শতমুখী প্রশংসা শোনা গেছে বৈদিক স্তুতিতে। আশ্চর্য হল— এই স্তুতি বেদের যে অংশে অবস্থিত সেটিকে পণ্ডিতেরা battle hymn বা war hymn বলেছেন। তাব মানে, এখানে-ওখানে আকস্মিক আক্রমণের জন্য নয়, এমনকী যুদ্ধকালেও নীতিবিগর্হিত অস্ত্রের প্রয়োগ অনুমোদিত ছিল না বৈদিক কালে।

আরও লক্ষণীয়, দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে নিয়ম-বিধি-সমন্বিত সন্ধিও সম্পন্ন হয়েছে এক-এক সময়ে অথচ এই সব সন্ধির পরেও সন্ধি ভঙ্গ করে বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে মেরে ফেলেছিলেন, অতি অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছিলেন নমুচিকেও। ইন্দ্র-বৃত্রাসুরের যুদ্ধ তো রীতিমতো ঐতিহাসিক ব্যাপার— বৃত্র এমনই এক প্রতিপক্ষ-নায়ক যার কথা শতবার বেদের মধ্যে এসেছে এবং পৌরাণিকেরা বৃত্রাসুরের কারণেই প্রথম বজ্র নির্মাণের প্রয়োজন স্মরণ করেছেন। অন্যদিকে নমুচি-দৈত্যের স্বর্গাধিকারের প্রসঙ্গে তাঁর ভয়ংকর নৃশংস সন্ত্রাসী আচরণ এতটাই লোকচর্চার বিষয় ছিল যে কাব্যকারেরাও সেই সন্ত্রাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হয়তো এই আসুরিক নৃশংসতা দেবতাদের পক্ষে অসহনীয় ছিল বলেই তৈত্তিরীয় সংহিতার মতো প্রাচীন যজুর্বৈদিক গ্রন্থে নমুচির সঙ্গে ইন্দ্রের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে— ইন্দ্রশ্চ বৈ নমুচিশ্চ অসুরঃ সমদধাতম্— এবং হয়তো এত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের কিছু করবার ছিল না বলেই নমুচির সঙ্গে ইন্দ্রের সাময়িক সন্ধি রচিত হয়। কিন্তু দেবতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সন্ধিপর্ব জলাঞ্জলি দিয়ে কেমন করে ইন্দ্র মেরে ফেলেন নমুচিকে তার বিশদ বিবরণ আছে সেই প্রাচীন তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ গ্রন্থে এবং আছে মহাভারতেও।

মনে হতে পারে যেন, বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি থেকে দেবাসুর-দ্বন্দ্বের যে চিত্র আমরা তুলে ধরলাম, তাতে ভারতীয় সভ্যতা এবং আর্যায়ণের প্রথম কল্পে তথাকথিত দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যে সব হত্যার ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেগুলির সন্ত্রাসের চেহারা যত না উজ্জ্বল, তার চেয়ে বেশি আছে আক্রমণ এবং নৃশংসতার উপাদান যা যুদ্ধেরই অঙ্গীভূত। আমরা কিন্তু যা বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সেটা হল— সেই প্রাচীন কালে যুদ্ধের নিয়ম-নীতি খুব সুশৃঙ্খল এবং বিধিসম্মতভাবে তৈরি হয়নি বলেই এগুলিকে আমরা একভাবে সন্ত্রাসই বলতে চাইব। অন্যদিকে এটা বলা আরও ঠিক হবে যে, বৈদিকোত্তর মহাকাব্যের যুগে যখন সুসংগঠিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং যখন পররাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধও রীতিমতো একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন যে-সব সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি অনেক সময়েই রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে স্ব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনায়কের সন্ত্রাস বলেই গণ্য হওয়া উচিত। সন্ত্রাসবাদ বলতে আধুনিক পণ্ডিতেরাও যেখানে 'premeditated, politically motivated violence' বোঝেন এবং অনেকক্ষেত্রেই সেটা যখন অন্যতর মানুষদের মনে ভীতিসঞ্চার করার জন্যই প্রধানত সংগঠিত হয়, তাই সেই সন্ত্রাসের চেহারাটা কিন্তু আমাদের মহাকাব্যগুলির মধ্যে বিশেষত মহাভারতের মধ্যে আরও বেশি স্পষ্ট এবং প্রকট।

মহাভারতের মতো বিশাল মহাকাব্য যে পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল, সেখানে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব ছিল না; যা ছিল, তা হল— পূর্ব-দক্ষিণ ভারতে আর্যায়ণ সম্পূর্ণ হবার পর একটি নির্ভেজাল আর্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞাতিশত্রুতার কাহিনি। দেশের রাজা পাণ্ডু মারা যাবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র পাণ্ডু এখানে রাজ্যের অধিকার পাচ্ছেন না এবং পূর্ব রাজা পাণ্ডুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হস্তিনাপুরে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অযোগ্য রাজপুত্র দুর্যোধন এখানে রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন। পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব তাঁদের জননী কুন্তীকে নিয়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়েই বড় হচ্ছিলেন বটে, কিন্তু দুর্যোধন বাল্য বয়স থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, পাণ্ডবরাই তাঁর রাজ্যলাভের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই কারণেই প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ছিল কীভাবে পাণ্ডবদের একে একে অথবা একসঙ্গে হত্যা করে রাজ্যের দখল নেওয়া যায়।

কৌরব-পক্ষের বৃদ্ধ আত্মীয় এবং রাজমন্ত্রীরা ন্যায়-নীতি এবং ধর্মের ভাবনাতে পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকেই তাঁর পিতার উত্তরাধিকারে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত

করতে চেয়েছিলেন। ফলে দুর্যোধন এটা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, ন্যায়-নীতি বজায় রেখে তাঁর পক্ষে রাজ্যলাভ সম্ভব নয়, অতএব অন্যায়ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। এই বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তিনি প্রথম যে পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন, সেটা হল— মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা এবং সেই হত্যার মাধ্যমে অন্য পাণ্ডব-ভাইদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া যাতে হস্তিনাপুরের রাজ্যের দিকে আর কেউ হাত না বাড়ায়।

শারীরিক শক্তিতে ভীম অন্যান্য ভাইদের চেয়ে অনেক বেশি বলবান ছিলেন বলে দুর্যোধন তাঁর প্রথম বয়সে ভীমকেই তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই হস্তিনাপুরের বাইরে প্রমাণকোটি বলে একটি জায়গায় ঔদরিক ভীমকে বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়ে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। হত্যার এই ষড়যন্ত্রের পিছনে দুর্যোধনের যে ভাবনা ছিল, তা মহাভারতে বলা আছে। বলা আছে যে, ভীমের শক্তি এবং ক্ষমতা বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল বলেই দুর্যোধন ছলনার মাধ্যমে তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন— প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভীমকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে যুধিষ্ঠিরকে কারাগারে বন্দি করতে কোনও সমস্যাই হবে না।

এই গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের পিছনে একা ভীমকে মারার চেয়েও পাণ্ডবপক্ষীয় সকলকে যে ভয় পাইয়ে দেবার তাগিদ ছিল, সেটা বোঝা যায় পরবর্তী ঘটনার সূত্রে। ভীমকে অজ্ঞান অবস্থায় জলে ফেলে দেবার ঘটনা অন্যান্য ভাইরা কেউ লক্ষ করেননি এবং তাঁরা জানতেনও না ভীমের কী হয়েছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে ভীমকে না দেখে এবং বহু অন্বেষণের পর তাঁকে না পেয়েও রাজবাড়িতে তাঁরা কোনও শোরগোল তুলতে পারেননি ভয়ে। পিতৃব্য বিদুরকে কুন্তী-জননীর বাসগৃহে ডেকে আনা হয়েছে গোপনে। তিনি পুত্রহারা জননীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু অন্য পাণ্ডব-ভাইদের নিরাপত্তার কারণেই রাজযন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারেননি অন্বেষণের সহায়ক হিসেবে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল— ভীম যখন প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরে এলেন এবং দুর্যোধনের অন্যায় অপকর্মগুলি জোরে-জোরে সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রায় ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

এইভাবে ভীমকে থামিয়ে দেবার তাৎপর্য একটাই, অর্থাৎ ঘটনা যদি দুর্যোধনের প্রতিকূলে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে দুর্যোধনের ক্রোধ আরও

বাড়বে এবং তিনি আরও ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন পাণ্ডবদের। এই সব আকস্মিক আক্রমণের প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক হিসেবে যুধিষ্ঠির একটাই পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেটা হল— কেউ যাতে আমরা বিপদে না পড়ি, তার জন্য এখন থেকে আমরা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করব— ইতঃ প্রভৃতি কৌন্তেয়া রক্ষতান্যোন্যমাদৃতাঃ।

যুধিষ্ঠির প্রত্যেককে আত্মরক্ষায় যত্নবান হতে বললেন কিন্তু রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনায়ক এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘটনা জানাজানি হতে দিলেন না ভয়ে, দুর্যোধনের ভয়ে। লক্ষণীয়, আধুনিক কালে সন্ত্রাসের যে-সব সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে, তার সঙ্গে দুর্যোধন-কৃত এই সন্ত্রাসের তাৎপর্য মিলে যায়। মাইকেল স্টোল (Michael Stohl) নামে এক আধুনিক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন সন্ত্রাসবাদী হানায় আক্রান্ত যে বিশেষ ব্যক্তিটির শারীরিক ক্ষতি হয়, সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য তার চাইতে অনেক বৃহত্তর। আক্রান্ত ব্যক্তিটির চাইতেও যারা এই সন্ত্রাসের ঘটনা দেখছে বা সবিস্তারে শুনছে এবং ভয়ে শিউরে উঠছে— সন্ত্রাসবাদীর কাছে সেটা অনেক বড় পাওয়া। এ-বিষয়ে নাকি একটা চিনে প্রবাদও আছে— একজনকে মার আর হাজার জনকে ভয় দেখাও।

হত্যার মাধ্যমে অন্যদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দেবার এই ভাবনাটা দুর্যোধন মাঝে মাঝেই ভাবতেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদের বিবাহের পরে তাঁর মুখে আমরা স্পষ্টভাবে শুনেছি যে, কীভাবে গোপনে তিনি পাণ্ডবদের ক্ষতিসাধন করতে চান। বিভিন্ন বিকল্পের কথা বলার সময় দুর্যোধন প্রথমে বলেছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণদের কাজে লাগিয়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের প্রত্যেকের মধ্যে এমনভাবেই ভেদ সৃষ্টি করবেন, যাতে তারা একে অপরকে আর সহ্যই করতে পারবেন না। একইভাবে পাণ্ডবদের তৎকালীন আশ্রয়দাতা দ্রুপদ যাতে পাণ্ডবদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন অথবা এমন অবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে পাণ্ডবরা আর কিছুতেই দেশে না ফিরে পঞ্চাল-রাজ্যেই থেকে যান— এইসব বিচিত্র ভাবনার শেষে দুর্যোধন এবার সবচেয়ে ঈপ্সিত কথাটা বললেন। বললেন— পাণ্ডবদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান মানুষটি হলেন ভীম। গুপ্তঘাতক দিয়ে নিপুণ উপায়ে সেই ভীমকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে— মৃত্যুর্বিধীয়তাং ছন্নৈঃ স হি তেষাং বলাধিকঃ।

ভীমকে কেন মারা দরকার— এ-বিষয়ে দুর্যোধনের ধারণা হল এই যে, পাণ্ডবরা তাঁরই শক্তি আশ্রয় করে যুদ্ধ করেন এবং অর্জুন যে অর্জুন, তাঁকেও তিনি তেমন আমল দেন না, কিন্তু ভীম তাঁর পিছনে থাকলেই তবে সে অজেয় হয়ে ওঠে। ভীমকে মারলে কী ফল হবে— সে ব্যাপারে দুর্যোধনের বক্তব্য হল— প্রথমত ভীম না থাকলে অর্জুন তাঁব কর্ণের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। দ্বিতীয়ত, ভীমের অভাবে পাণ্ডবদের প্রত্যেকটি লোক দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তারা জীবনে আর দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার চেষ্টা করবে না— অস্মান্ বলবতো জ্ঞাত্বা ন যতিষ্যন্তি দুর্বলাঃ। এই একবার মাত্র নয়— পাণ্ডবদের একজন বা দুজনকে মেরে অন্যদের ভয় পাইয়ে দেবার কল্পনা বারেবারেই করেছেন দুর্যোধন। এই সমস্ত পরিকল্পনার সবচেয়ে নিখুঁত পবিকল্পনা ছিল— বারণাবতে পাঠিয়ে পাণ্ডবদেব জতুগৃহের আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনায়। এই পরিকল্পনায় স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও শামিল ছিলেন এবং তিনি এই নৃশংস-ভাবনা কার্যকর করার আগে রাষ্ট্রগত বা রাষ্ট্রচালিত সন্ত্রাসের দার্শনিক সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর আমন্ত্রিত মন্ত্রী কণিকের কাছ থেকে।

মহাভারতে কণিকেব বিশেষণ দেওয়া হয়েছে 'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তম' অর্থাৎ রাজনীতিশাস্ত্রের সর্বশেষ প্রয়োজন তাঁর জানা আছে। ধর্ম-কাম-অর্থের সুষ্ঠু সমন্বয়ে যে আদর্শ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়— যার কথা বিদুর বলেছেন, ভীষ্ম বলেছেন— এই রাষ্ট্রনীতি তার থেকে আলাদা বলেই কণিকের রাজনীতি-ভাবনাকে মহাভারতে 'তীক্ষ্ণ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে— উবাচ বচনং তীক্ষ্ণং রাজশাস্ত্রার্থদর্শনম্। কণিক নিজেও জানেন যে, তাঁর ভাবনা-চিন্তা শুনলে সুস্থ মানুষের নীতিবোধ, ধর্মবোধ আহত হবে, কেননা দুর্বল, সবল, মাঝারি— শত্রু যেমনই হোক, শত্রু ভাবলেই তাকে মেরে ফেলাটাই কণিক নীতির সার কথা। লোকে যেহেতু রাজদণ্ডকেই সবচেয়ে ভয় পায়, অতএব সব সময় সেই ভয়টুকু জিইয়ে রাখতে হবে সকলের মধ্যে এবং যাকে রাজা একবার তাঁর বিরোধী বা অপকারী বলে মনে করবেন— সে ক্ষুদ্র হোক বা শক্তিমান হোক তাকে তিনি বাঁচতে দেবেন না— বধমেব প্রশংসন্তি শত্রূণাম্ অপকারিণাম্। দুর্বল শত্রুর ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা, শরণাগতি, আর্তভাব— এগুলির কোনো মূল্য নেই কণিকের কাছে। শত্রু-শব্দের মানে তাঁর কাছে একটাই— মেরে ফেলো। কেননা মেরে ফেলার পরেই শুধু আর ভয় থাকে না।

মহাভারতে কণিক যে রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলেছেন তার মধ্যে আধুনিক অর্থে 'ডিপ্লোমেসি'-র অংশ যতটুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে তাড়না বা সন্ত্রাসী রাজনীতি। তিনি বলেন— কার্যসিদ্ধির জন্য নিজের চেহারায় এবং বেশবাসে একটা সাধু-সাধু ভাব বজায় রাখ, দরকার পড়লে প্রচুর হোম-যজ্ঞ করো, জটা বল্কলও ধারণ করতে পার, কিন্তু সুযোগ পেলেই বন্য কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড় শত্রুর উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত সময়-সুযোগ না আসে, ততক্ষণ কলসীর মতো কাঁধে করেও বইতে পারো শত্রুকে, কিন্তু সময় এলেই কলসী বা শত্রুকে পাথরে আছাড় মেরে ভেঙে ফেল। শত্রুকে কী কী প্রচ্ছন্ন উপায়ে শেষ করতে হবে, সেখানে কণিকের পছন্দের তালিকায় বিষ দেওয়া, আগুনে পুড়িয়ে মারা অথবা যত রকম অন্যায় সন্ত্রাস হতে পারে, তা সবই আছে এবং এই কণিকের ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েই দুর্যোধন বারণাবতে সব রকম দাহ্য পদার্থ দিয়ে জতুগৃহ তৈরি করলেন এবং বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে বলিয়ে পাণ্ডব-ভাইদের বারণাবতে পাঠিয়েও ছিলেন। পরিকল্পনা যেমন নিশ্ছিদ্র ছিল, তাতে পাণ্ডবরা বাঁচতেন না, শুধু বিদুরের অসাধারণ বুদ্ধিতে পাণ্ডবরা কণিকনীতির সন্ত্রাস থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনাটাই শুধু একমাত্র সন্ত্রাসের উদাহরণ নয় মহাভারতে। প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেবার এই সন্ত্রাসী নীতি দুর্যোধন মাঝে-মাঝেই প্রয়োগ করেছেন পাণ্ডবদের ওপর; এমনকী বনবাস-কালে পাণ্ডবদের সাময়িক আবাসস্থলে গিয়ে নিজেদের শক্তি দেখিয়ে আসার ভাবনা এবং অজ্ঞাতবাসের সময় প্রায় বিনা কারণে বিরাট-রাজার গোধন আহরণ করার অছিলায় তাঁর রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনাও এই সন্ত্রাসনীতির মধ্যেই পড়ে। দুর্যোধন সফল হননি তার কারণ অন্য, কিন্তু প্রাচীনকালের রাজনীতিতে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটা রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ ছিল এবং তার প্রমাণ মিলবে অর্থশাস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেও। লক্ষণীয়, মহামতি কৌটিল্য রাষ্ট্র এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় তাঁর পূর্বতন রাজনীতিবিদদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে উপরিউক্ত কণিকের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন, যদিও সেই নামের বানানটা একটু আলাদা। কৌটিল্য 'কণিঙ্ক' নামে এক বিখ্যাত রাজনীতিবিদের নাম করেছেন এবং যেখানে, যেভাবে তিনি কণিঙ্কের মতবাদ উল্লেখ করেছেন, সে-সব জায়গায় তাঁর মত খানিকটা পৃথক হলেও কৌটিল্য কিন্তু অনেক জায়গাতেই কণিকের কূট পরামর্শ গ্রহণ

করেছেন— বিশেষত অন্তঃরাষ্ট্রীয় শত্রু দমনের ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্রে নাশকতা চালানোর ব্যাপারে।

কৌটিল্য এক জায়গায় লিখছেন— নিজের অনুকূল স্বপক্ষীয় মানুষের মধ্যেই হোক, অথবা শত্রুর মধ্যেই হোক, রাজা যাকে তাঁর বিরোধী বা অপকারী বলে মনে করবেন, সেখানেই নিশ্চুপে চোরাগোপ্তা হত্যাকাণ্ড চালাবেন— স্বপক্ষে পরপক্ষে বা তূষ্ণীং দণ্ডং প্রযোজয়েৎ। কৌটিল্য শুধু এইটুকু সাবধান যে, রাজা যেন অন্যায়ী, অপকারী ছাড়া ভাল লোকের ওপর এই নিঃশব্দ-দণ্ডের প্রয়োগ না করেন। কিন্তু নির্বিচারে শত্রুধ্বংস করার ব্যাপারে কৌটিল্যের অভিমত মহাভারতীয় কূটনীতিক কণিকের থেকে কিছু পৃথক নয়। কৌটিল্য এমন কথাও বলেছেন যে, রাজা বাইরে নিজেকে যতই ক্ষমাশীল দেখান নিজের অপকারী ব্যক্তিকে গোপনে হত্যা করার ক্ষেত্রে তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করবেন না— আয়ত্যাং চ তদাত্বে চ ক্ষমাবান্ অবিশঙ্কিতঃ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যোগবৃত্ত বলে একটি অধিকরণ আছে। এইখানেই গোপন-হত্যা বা উপাংশুদণ্ডের আলোচনা আছে। এই অধিকরণের সাধারণ নাম 'কণ্টক শোধন' অর্থাৎ পথের কাঁটা সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রশাসনের নানান মুখ্যপদ যাঁরা অধিকার করে থাকেন— যেমন মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ ইত্যাদি— এঁরা যদি কেউ রাজার ওপর টেক্কা দিয়ে রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্র নিজের কুক্ষীগত করার চেষ্টা করেন অথবা এই মুখ্য পুরুষেরা যদি রাজার চিহ্নিত শত্রুদের সঙ্গে মেলামেশা, যাতায়াত আরম্ভ করেন, তবে কৌটিল্যের পরামর্শ হল— ওই সব মুখ্যদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী ব্যবস্থা নিতে হবে। কৌটিল্য অনুভব করেছেন যে, রাজ্যের এই মুখ্যপুরুষদেরও যেহেতু বুদ্ধি, ক্ষমতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনসংযোগ থাকে, তাই প্রকাশ্য উপায়ে এঁদের মেরে ফেলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়, অতএব এ-সব ক্ষেত্রে রাজা সেই সব ক্ষুব্ধ মানুষের আশ্রয় নেবেন, যারা ওই পূর্বোক্ত মন্ত্রী, অমাত্য বা যুবরাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছে।

সমস্ত কাজটাই কিন্তু হবে গোপনে এবং গুপ্তচরদের মাধ্যমে। যেমন ধরা যাক, রাজার মুখ্য অমাত্য রাজার বিরুদ্ধে কাজ করছেন। রাজা তখন গুপ্তচরের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন ওই অমাত্যের ভাই বা তার নীচকর্মা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, অথবা তার রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্রের সঙ্গে। সাধারণত এই সব লোকেরা প্রশাসনিক স্তরে স্থান পাবার জন্য পূর্বোক্ত মন্ত্রী, অমাত্য, যুবরাজের ওপর

ক্ষুব্ধ এবং ঈর্ষালু হয়েই থাকেন। বাস্তবে কিন্তু তারা রাজার ওপরেও ক্ষুব্ধ। গুপ্তচরেরা ওই সব ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের যে কোনও একজনকে পূর্বোক্ত রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে গুপ্তহত্যা করার জন্য উৎসাহিত করে রাজার সঙ্গে দেখা করালে মন্ত্রীর মৃত্যুর পর তার বিষয়-সম্পত্তি সবই ওই ভাইয়ের উপভোগ্য হবে— এমন প্রতিজ্ঞা করবেন। এর পর সেই ক্ষুব্ধ ব্যক্তি অস্ত্র দিয়েই হোক অথবা বিষ দিয়ে পূর্বোক্ত মহামাত্রকে হত্যা করবেন। কিন্তু এই হত্যার পর ওই ভাইটিকেও ভ্রাতৃহন্তার অপবাদ দিয়ে হত্যা করবেন রাজা। অথবা ওই ক্ষুব্ধ ভ্রাতা এবং ওই মন্ত্রী— এই দুই পক্ষকেই রাজা তাঁর ঘাতক গুপ্তচরদের দিয়ে হত্যা করবেন, কিন্তু এই হত্যার পিছনে জনসমক্ষে প্রচার কিন্তু থাকবে অন্য।

কৌটিল্যের এই গুপ্তহত্যার ভাবনাতে কেউ রাজার আপন নন, কেননা 'যুবরাজ' নামক মানুষটি তো প্রধানত রাজার ছেলেই হয়ে থাকেন। কিন্তু যুবরাজও যদি রাজার বিরুদ্ধে যান, তবে তারও মরণ থেকে রেহাই নেই এবং যে তাকে মারবে সেও বাঁচবে না, কেননা রাজা গুপ্তহত্যার প্রমাণ রাখবেন না। কৌটিল্য যে 'যোগবৃত্ত' রচনা করেছেন, তা প্রধানত গুপ্তচরদের মাধ্যমে কপট বা গুপ্তহত্যার পরিসর এবং এখানে কৌটিল্য যে-সব উপায় বলেছেন তার মধ্যে অস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে বিষ দেওয়া, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া সবই আছে এবং তার সঙ্গে আছে দূষ্যপক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং রাজার অনুকূল প্রচার। এই অধ্যায়ে কৌটিল্যের কূট-কৌশলগুলি এখনকার গণতন্ত্রের বহু রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়, যদিও প্রচারের কৌশলটাও এখনকার দিনে থাকে গণতান্ত্রিক। অথবা সবই যেন জনগণহিতায়।

নিজের রাজ্যে কূট উপায়ে শত্রুবধ করে নিজের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করাটা যেমন রাজার পক্ষে জরুরি, তেমনই পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে শত্রু-রাজার নানারকম ক্ষতিসাধন করে তাকে দুর্বল করে দেওয়াটাও রাজার পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উপাদান। পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অথবা একই সঙ্গে যে-সব কৌশল প্রয়োগ করতে হয়, সেগুলির পরিভাষিক নামগুলি হল সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। প্রধানত রাজার পরিপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের (স্বরাষ্ট্রে এবং পররাষ্ট্রে) নিজের অধীনে আনার জন্যই ওই চারটি উপায়ের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে বলেছেন প্রাচীন তাত্ত্বিকেরা। এর মধ্যে প্রথম উপায় হল সাম অর্থাৎ মধুর কথা, মধুর ব্যবহার, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া। এতে কাজ না হলে দান-নীতি, অর্থাৎ কিছুটা ছেড়ে দিলে যদি শত্রু

রাজা-অনুকূল হন সেই চেষ্টা করা। তবে দাননীতির অসুবিধে হল— পরিপন্থী শত্রু বা শত্রুরাষ্ট্র যদি পূর্বোক্ত রাজার দানবৃত্তি দেখে সেই রাজাকে দুর্বল ভাবতে থাকেন, তবে শত্রু মাঝে মাঝেই দান গ্রহণ করার চেষ্টা করবে অথচ সে পুরোপুরি অনুকূলও হবে না। এই অবস্থায় ভেদনীতি গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শত্রু-রাজার পরিপন্থী ব্যক্তির সঙ্গে তার সমমনা ব্যক্তিদের বিরোধ তৈরি করে দিতে হবে। পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ভেদনীতির মাধ্যমে শত্রু-রাজার সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীদের, রাজার সঙ্গে সেনাপতির, এমনকী জনসাধারণকেও রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য রাজার সঙ্গে তাদের ভেদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু এই নীতির সমস্যা হল— শত্রু-রাজার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সেই রাজার ভেদসৃষ্টি করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময় দিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বিজিগীষু রাজার নিজের সমস্যা বেড়ে যায়। অতএব সে-ক্ষেত্রে শেষ উপায় হল দণ্ড। আগেও এ-কথা বলেছি।

সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের শেষ অঙ্গ 'মিত্র'শক্তি বা বলা উচিত— সেটাই পররাষ্ট্র নীতি। কৌটিল্য সেইখানেই-ওই চতুরুপায় সাম-দান-ভেদ-দণ্ডের আলোচনা করেছেন সবিস্তারে। তাঁর মতে চতুরুপায়ের শেষতম দণ্ড-প্রয়োগের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত আধার হল বলবান শত্রু। কৌটিল্য মনে করেন— দুর্বল শত্রুকে সামনীতি এবং দাননীতির মাধ্যমেই বশীভূত করা যায়, কিন্তু বলবান শত্রুর দুর্বলতা সৃষ্টি করতে হলে ভেদ এবং দণ্ডের কথাই চিন্তা করতে হবে— সামদানাভ্যাং দুর্বলান্ উপনয়েৎ, ভেদ-দণ্ডাভ্যাং বলবতঃ। পররাষ্ট্রে এখনও যে নাশকতা এবং সন্ত্রাস চালানো হয়, সেগুলি প্রাচীন তাত্ত্বিকদের ভেদনীতি এবং দণ্ডের অন্তর্গত। কেননা প্রবলতর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে যেহেতু সফল হওয়া যায় না, অতএব তার রাজ্যে নাশকতা এবং সন্ত্রাস চালিয়ে তাকে যতটা দুর্বল করে দেওয়া যায়, ততটাই লাভ। ভেদনীতি দুই-তিন রকমের হতে পারে। শত্রুসৈন্যকে দুর্বল করে দেওয়া, শত্রুর মিত্রপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়া, প্রবল-পরাক্রান্ত অন্য কোনও রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা শত্রুর হীনতা বা ছিদ্রগুলিকেই নিজের প্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা। অন্যদিকে দণ্ড, এক কথায় শত্রুকে শাস্তি দেবার ব্যাপার হলেও তারও লঘু-গুরু প্রকার আছে এবং সেইখানেই সন্ত্রাস বা নাশকতার উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাচীন তাত্ত্বিকেরা। শুক্রনীতিসার যদিও তুলনায় খানিকটা অর্বাচীন গ্রন্থ, তবু তার লেখক কৌটিল্যের ভাবনাটা ঠিক ধরেছেন। তিনি বলেন— দণ্ড মানে শুধু

শত্রুরাষ্ট্রকে আক্রমণ করা নয়, এই আক্রমণের অন্য উপায়ও আছে। হয়তো যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যয় এবং লোকক্ষয় রোধ করার সঙ্গে শত্রুকে আগে থেকেই ভয় পাইয়ে দেবার ব্যাপারটা এখানে কাজ করে, অর্থাৎ পররাষ্ট্র সন্ত্রাস, নাশকতা ইত্যাদি কাণ্ডগুলি অনায়াসেই চরম দণ্ড বা আক্রমণের প্রাথমিক উপায় হিসেবে কাজ করতে পারে। নীতিসার বলেছে— শত্রুরাজ্যে দস্যু পাঠিয়ে চুরি-ডাকাতি করানো, রাজকোষ এবং শস্যের ক্ষয় করা, শত্রুর দুর্বলতার স্থানগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া, নিজের সৈন্যশক্তি এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি প্রদর্শন করে পররাষ্ট্রকে ভয় দেখানো এবং যুদ্ধ লাগলে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করা— এগুলি সবই দণ্ডের মধ্যে পড়ে।

নীতিসার বেশ পরিষ্কারভাবে বলেছে— ত্রাসনং দণ্ড উচ্যতে— অর্থাৎ ভয় দেখানো বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটাই দণ্ডের আসল কাজ— যুদ্ধটা একেবারে শেষ অস্ত্র। তবে যুদ্ধ না করে পররাষ্ট্রে যে সব নাশকতা চালানো হয়, সেখানে কৌটিল্য দণ্ড বলতে রাজি হবে না, কেননা এই ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটা ভেদ-নীতির প্রয়োগিক দিক। ভেদনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৌটিল্য শুক্রনীতিসারের চেয়ে অনেক বেশি কুশল। বলবান শত্রুর ওপর ভেদনীতি প্রয়োগের সময় বিজিগীষু রাজা নিজে কাজটা করেন না, তিনি অন্য লোককে কৌশল ব্যবহার করে নিজের কাজ সারেন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করার মতো মানুষেরা হলেন অন্য প্রতিবেশী সামন্ত রাজা, বনাঞ্চল রক্ষায় নিযুক্ত আটবিক পুরুষ— যিনি খুব সহজে শত্রুরাষ্ট্রের অপকার সাধন করতে পারেন, শত্রুর নিজের বংশের শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতি অথবা শত্রু রাজার আশঙ্কিত কোনও অবরুদ্ধ রাজপুত্র।

ভয় দেখিয়ে ভেদসৃষ্টি করাটা কূটনীতি বা 'ডিপ্লোমেসি'-র মধ্যেও আসবে, কিন্তু ভেদসৃষ্টি করার জন্য উপর্যুপরি সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটাই ভেদনীতির আসল উদ্দেশ্য এবং সে কাজটা যথেষ্টই জটিল। এর মধ্যে মিথ্যা রটনা, গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুর রাজ্যে উলটো প্রচার চালানো, নিজের রাজ্য থেকে আশঙ্কিত অমাত্যদের পররাজ্যে নিষ্কাশিত করে শত্রুর অপকার করা— এগুলি তো প্রাথমিক কাজ। কিন্তু এই প্রাথমিক কাজগুলিই যেভাবে করতে হবে তার মধ্যে সন্ত্রাস-সৃষ্টির প্রক্রিয়াটাই প্রধান হয়ে ওঠে, কেননা এই অপকার-সাধনের মধ্যে বিষ দেওয়া, আগুন দেওয়া, অস্ত্রশাস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা— সবই থাকবে— 'অগ্নি-রস-শস্ত্রেণ'।

ভেদনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৌটিল্য যে-সব নীতি-নিয়ম নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে নৈতিকতা খুব একটা নেই এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রবলতর শত্রুকে আয়ত্তে রাখার জন্য সে-সমস্ত অনৈতিক কাজকে অন্যায়ও মনে করেন না কৌটিল্য। ভেদনীতি প্রয়োগের পূর্বাবস্থা হিসেবে কৌটিল্য এটাই চান যে, বিজিগীষু রাজার সঙ্গে শত্রু-রাজার এক ধরনের বিরোধিতা যেন থাকেই। ধরা যাক এ-ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে যদি বিজিগীষু রাজার ধ্রুবক-উদাহরণ হিসেবে ধরি তাহলে প্রবলতর ভারতের সঙ্গে এক ধরনের শত্রুতা সে সব-সময়েই জিইয়ে রাখে। উলটো দিকে ভারতও হয়তো তাই করে। অর্থাৎ কিনা সাময়িক বিদ্বেষই হোক, চিরন্তন বৈরিতাই হোক অথবা অপকারের আশঙ্কা হোক— এই তিনটের একটা যদি সব সময়েই জিইয়ে রাখা যায়, তবেই নৈতিকতাহীন ভেদনীতির প্রশ্ন আসবে।

নৈতিকতাহীন এই ভেদনীতির সবচেয়ে বড় সাধন হল গূঢ়-পুরুষ। আজকের দিনে দেশে-বিদেশে যে-সব গুপ্তচরচক্র চালু আছে যারা একাধারে সংবাদ সংগ্রহ করে এবং অন্যদিকে নাশকতাও চালায়, সেই চক্রান্ত পরিকল্পনার আদি পুরুষ হলেন কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্রে চরদের নাম হল গূঢ়-পুরুষ, রাজকার্যে তাঁদের গুরুত্ব এতটাই যে মন্ত্রী-অমাত্য নিয়োগ করার পরেই রাজাকে গূঢ়-পুরুষ নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। অর্থশাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের গূঢ়-পুরুষ আছে— কৌটিল্য তাঁদের সাধারণ নাম দিয়েছেন সংস্থ— রাজার প্রয়োজনে তারা নিজ-রাজ্যে এবং পর-রাজ্যে এক-একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নাশকতা চালায়। সংস্থগুলির নাম— কাপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহকব্যঞ্জন এবং তাপসব্যঞ্জন। এই পাঁচ প্রকার সংবাদ সংস্থ ছাড়াও আরও একপ্রকার গুপ্তচর-গোষ্ঠীর নাম হল 'সঞ্চার'। সর্বত্র এদের অবাধ গতিবিধি— বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি করা ছাড়াও শত্রুরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় 'সাবোতাজ' করা, রাজা বা মন্ত্রীকে বধ করা— এ-সব 'সঞ্চার' গুপ্তচরদের কাজ। এই 'সঞ্চার' গুপ্তচরদের মধ্যে একটি প্রকার হল 'তীক্ষ্ণ' এবং 'রসদ'— সন্ত্রাসমূলক কাজে তাদের জুড়ি নেই।

'তীক্ষ্ণ' নামটা শুনেই বোঝা যায় এরা নৃশংস পুরুষ। জিনিসপত্র এবং অর্থের লোভ এদের এমনই যে, এরা নিজের জীবনের পরোয়া করে না। স্বরাষ্ট্রে বা শত্রুরাষ্ট্রে অনিষ্ট পুরুষকে হত্যার জন্যই রাজাকে এদের ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। এই হত্যার ব্যাপারে আরও নির্মম হল 'রসদ' পুরুষেরা। 'রস' মানে এখানে বিষ বা প্রাণঘাতী কোনও 'কেমিক্যাল'। মায়া-

মমতা বলে কোনও পদার্থ এই 'রসদ'-পুরুষের মধ্যে নেই, সেই কারণে পররাষ্ট্রে অনভীষ্ট রাজপুরুষকে বিষ দিয়ে মারতে এদের এতটুকু কুণ্ঠা হয় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই তীক্ষ্ণ এবং রসদ গূঢ়-পুরুষদের অবস্থান নির্ণয় করার সময়েই আমরা বুঝতে পারি যে, 'পর' বা শত্রুরাষ্ট্রে পরিকল্পিতভাবে নাশকতা চালানো বা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করাটা কৌটিল্যের পররাষ্ট্র নীতির স্বীকৃত অঙ্গ বলেই পরিচিত।

আমরা কেজিবি, সিআইএ অথবা আইএসআই ইত্যাদি নানা গুপ্ত সংস্থার সংবাদ জানি। যারা বহুতর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালায়। এই সব সংস্থার সঙ্গে কৌটিল্য-কথিত সন্ত্রাসের মিল আছে। তাতে এটা আরও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, রাষ্ট্রের অনুমতভাবেই পররাজ্যে সন্ত্রাস চালানো বা নাশকতার কাজ করাটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এখন যে-সব বিদ্রোহী-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে— যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাকামী অথবা সেই সব বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় দেশ-জাতির স্বাধীনতাকামী— এরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রীয় মতে যে ব্যবহার লাভ করতেন, তা দু'রকম হতে পারে।

যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিচ্ছিন্নতাকামী, তারা মনু-মহাভারত বা কৌটিল্য সবার কাছেই রাজার অনভীষ্ট বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত হতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রথমে এই সব গোষ্ঠীর নেতাদের চরিত্র বিচার করে নেবার কথা। নেতাদের মধ্যে ক্রুদ্ধ, ভীত, লোভী, অপমানিত এবং মানী— এই চার চরিত্রের মানুষ থাকবেই। এদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি কীভাবে করতে হবে তা অর্থশাস্ত্রের সংঘবৃত্তে বলা আছে। সংঘবৃত্তের কথা এইজন্য বললাম যেহেতু আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীরা প্রধানত নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সংহত সুসংগঠিত থাকে। সংহত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা খুব কঠিন— এ-কথা কৌটিল্যই বলেছেন। কিন্তু কঠিন হলেও তা অসাধ্য নয়, অতএব প্রতিকূলাচারী গোষ্ঠীকে ভেদ এবং দণ্ডের মাধ্যমেই শেষ করে দিতে হবে। গোষ্ঠীপ্রধানদের চরিত্র গুপ্তচরদের মাধ্যমে বিচার করে ক্রুদ্ধ নেতাকে নানান কৌশলে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলে, ভীত পুরুষকে আশ্রয়ের ভরসা দিয়ে লুব্ধ পুরুষকে অর্থ, ভূসম্পত্তি এবং কামুকতার আশ্বাস দিয়ে, অপমানিত নেতাকে অন্যের বিরুদ্ধে চালিত করে এবং মানী ব্যক্তিকে সম্মানের আশ্বাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলাটাই কৌটিল্যের পরামর্শ।

কিন্তু ধরা যাক, একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসেবেই চিহ্নিত করা হল, ধরে নেওয়া যাক, পৃথিবীর অনেক রাজশক্তির চোখেই তারা

স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সেক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী যতই ছোট হোক, তাদের ওপরে 'বিজিগীষু' রাজার চরিত্র আরোপ করতে হবে। 'বিজিগীষু' রাজা একটি ধ্রুবকমাত্র, যিনি অন্য রাজার ওপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করে অর্থ, ঐশ্বর্য এবং ভূমিখণ্ডের ওপর অধিকার কায়েম করতে চান। সম্পূর্ণ অর্থশাস্ত্রই এই 'বিজিগীষু' রাজার আত্মপ্রতিষ্ঠাব কাহিনি। অতএব যে গোষ্ঠী স্বাধীনতা চায়, তার মধ্যে যদি রাজতন্ত্রের বীজ না থাকে, সংঘবৃত্তের গুণ বা চরিত্র থাকে, তাকেও কিন্তু প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মবিস্তারেব জন্য ভেদ এবং দণ্ডের আশ্রয়ই নিতে হবে এবং উপায়-কৌশল ভিন্ন হলেও সাধারণ মানটা সেই একই অর্থাৎ শত্রুসৈন্যাকে দুর্বল করে দিতে হবে, শত্রুর মিত্রপক্ষকে দুর্বল করে দিতে হবে, প্রবল পরাক্রান্ত অন্য কোনও রাজশক্তিব আশ্রয় গ্রহণ কবতে হবে এবং শত্রুর দুর্বলতা এবং হীনতাকেই নিজেব প্রতিষ্ঠাব সুযোগ হিসেবে গ্রহণ কবতে হবে।

ভাবতবর্ষের মাটিতে যারা বিচ্ছিন্ন আচবণ করেছেন, তাবা যেহেতু কোনও রাষ্ট্রশক্তি নয় এবং নেহাতই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী— যারা অপর শত্রুরাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে ব্যস্ত, তাদেব অনুকূলে নিয়ে আসা বা তাদেব ধ্বংস কবার ব্যাপারটা, আজকেব দিনে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ওপরেই অনেকটা নির্ভব করে। সেক্ষত্রে প্রবলতব শক্তির একটা ভূমিকা আছে বলেই সন্ত্রাসবাদীবা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন, তাব উত্তরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যবস্থা এবং তদুপরি চরম দণ্ডের একটা ভূমিকাই কিন্তু কৌটিল্যেব মতো রাষ্ট্রনীতিবোদ্ধার পরামর্শ হবে।

দেবভাষায় কটুকাটব্য

পারস্পরিক কলহ এবং সেই সূত্রে গালাগালি— এটি বোধ হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম মৌখিক ব্যায়াম। অল্প হোক বেশি হোক, ঝগড়া সবাই করে; যে বলে, করে না— তারও মনের কোণে এই বৃত্তিটি লুকিয়ে আছে, শুধুমাত্র প্রকাশ এবং লিপিকরের অভাবে পৃথিবীর প্রাচীনতম গদ্যের ভাষাটি আমাদের অজানা রয়ে গেল। প্রথমেই বলি— ঝগড়া দু-রকমের। ঘরে এবং বাইরে। 'চ্যারিটি' যেমন ঘরে আরম্ভ হয়, ঝগড়াও তেমনি প্রথমে আপন গৃহে আশৈশব অভ্যস্ত হয়ে, আস্তে আস্তে বহির্জগতে সঞ্চারিত হয়। কাজেই ঘরে এবং বাইরে— এই দু'য়ের অন্তর্বর্তী সময়টুকু যে যত সুকৌশলে সুব্যবহার করতে পারবে, পরবর্তীকালে সে তত ভাল ঝগড়াটে হয়ে উঠতে পারবে।

ঝগড়া এবং গালাগালির প্রকারভেদ নিয়ে এ যাবৎ কোনও গবেষণা হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। তবে স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে ঝগড়া নানারকমের হয় এবং একই কারণে গালাগালিরও প্রকারভেদ আছে। যাঁরা স্থান, কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে ঝগড়া করতে পারেন, সেই সব অতি শক্তিমান মানুষেরা এই প্রবন্ধের আওতায় পড়বেন না; কেন না কবি যেমন প্রায় নির্বিষয়ক জিনিসের ওপরেও কবিতা লিখে ফেলতে পারেন, এঁরাও তেমনি তুচ্ছ কিংবা বিনা কারণেই অতি আকস্মিকভাবে ঝগড়ার সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদের এই অহৈতুকী শক্তি এবং তাঁদের গলার আরোহন অবরোহন সহযোগে যে বিচিত্র গালাগালি পরিবেশিত হয় তার একটি বর্ণনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা সভ্য-সমাজের কথা বলছি। কিন্তু এই সভ্য সমাজের অন্তঃকলহ যদি নিকৃষ্ট ঝগড়ার রূপ নেয় কিংবা তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে যদি এমন কোনও শব্দ চিত্র পাওয়া যায়, যার অর্থ শালীনতা অতিক্রম করে, তাহলে পাঠক যেন আমাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এও মনে রাখবেন যে আপনিও সেই সভ্য-সমাজের একজন।

যাই হোক, ঝগড়া এবং গালাগালির শত-সহস্র অবান্তর ভেদ থাকলেও আমার আলোচ্য পরিসর হবে খুব ছোট এবং তীক্ষ্ণ বিষয়গুলি। আধুনিক কালের কোনও রকম ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে আমি যাব না, কেন না রাজনীতির কল্যাণে ঝগড়া জিনিসটা এখন সর্বত্রই ঢুকে পড়েছে। তা ছাড়া কাল কলি, এবং কলি অর্থ কলহ। এক সাধু-মহারাজ আমাকে প্রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভাগবত-পুরাণ অনুসারে কলহরূপী এই কলির স্থান নাকি চারটি— অক্ষক্রীড়া, পানশালা, স্ত্রীলোক এবং প্রাণিবধ। এরপর তিনি বললেন— "কলিকাতা মহানগরীকে ডাকবিভাগের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে লেখা হয় 'কলি', তার মানে এই কলিকাতা শহরই হল কলির নিবাস-ভূমি।" কথাটা প্রথমে তেমন করে আমল দিইনি, কিন্তু পরে, যখন দেখলাম সমস্ত কলকাতায় ব্লক-কংগ্রেসের অফিস আর কমিউনিস্টিদের লোকাল কমিটি ছড়িয়ে পড়ল, যখন দেখলাম প্রাইমারি স্কুল থেকে আরম্ভ করে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি একেবারে ছেয়ে গেল, তখন বুঝলাম সাধুজির অভিনব ব্যাখ্যাটি তো মন্দ নয়। সত্যিই তো, কলিকাতা শহর কলি-কলহের আদর্শতম জায়গা। এই শহরের সমস্ত অলিতে-গলিতে যত বিচিত্র রকমের কলহ প্রতিনিয়তই জন্ম নিচ্ছে, তার নিকেশ করা আমার কম্মো নয়। তার থেকে, কলি-কলহের সঙ্গে আমি যে বিদ্যা-শিক্ষার প্রসঙ্গটি টেনে আনলাম তার কৈফিয়ৎ দিই।

সকলেই যেমন জানেন যে, বিদ্যা কিংবা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন বাগ্‌দেবী, তেমনি অনেকেই বোধ করি জানেন না যে, ঝগড়া-ঝাটিরও একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন এবং তিনিও বাগদেবী। সরস্বতীর বরপুত্রদের কথাটা হয়তো তত পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু দেবী ভাগবত পুরাণটি খুলে দেখবেন আমার কথা সত্যি। একসময় নাকি লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা— এঁরা তিনজন ভগবান শ্রীহরির স্ত্রী-রূপে বিরাজ করছিলেন। তিনজনই বড় ঘরের মেয়ে, কাজেই সমান প্রেমের অংশীদার। কিন্তু একদিন হল কি, (এটি নববসন্তের কারণে হতে পারে, "ছোট বউ সোনার দলা"— সে কারণে হতে পারে, কিংবা সতত উচ্ছল জলরাশির মতো তাঁর আপন চঞ্চল স্বভাবের জন্যও হতে পারে) ছোট বউ গঙ্গা একাধিকবার টেরিয়ে টেরিয়ে শ্রীবিষ্ণুর দয়িত-মুখখানি দেখছিলেন। তাঁর ভাবটিও বেশ প্রকটভাবে সকাম ছিল। আর এই সব আকস্মিক এবং ক্ষণিকের ভাববিলাসে ভগবান বিষ্ণু আশৈশব অভ্যস্ত এবং নিপুণ হওয়ায়, তিনিও চোখে চোখেই গঙ্গা-কটাক্ষের উপযুক্ত উত্তর দিচ্ছিলেন। সবাই জানেন - বড় বউ লক্ষ্মী অমৃত মন্থনের আগ পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে বড় হওয়ায় বহির্জগতের কোনও শব্দ তাঁর কানে যেত না। এইরকম একটা বদ অভ্যাসের ফলে পুজোর সময় কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজও তিনি সহ্য করতে পারেন না। আমাদের ধারণা, একই কারণে অনর্থক ঝগড়া-ঝাটি এড়ানোর জন্য গঙ্গাকে ক্ষমা করে দিলেন লক্ষ্মী। কিন্তু সরস্বতী ছাড়বার পাত্র নন। তিনি প্রথমেই ভগবান শ্রীহরিকে সাক্ষেপে বললেন-- "বোঝাই যাচ্ছে, গঙ্গার ওপর তোমার ভালবাসা কতখানি? আর লক্ষ্মীর ওপরেও ভালবাসা প্রায় সমান। সমান-ব্যবহারের জন্য যে সব মণীষীরা তোমাকে সত্ত্ব-স্বরূপ বলে জানেন, তাঁরা আসলে মূর্খ।" আরও কি শুনতে হয় এবং আরও বৃহত্তর কোনও অনর্থ কিছু না ঘটে— এই আশংকায় মনে মনে কী একটা ভেবে ভগবান সভার বাইরে চলে গেলেন— মনসা চ সমালোচ্য জগাম স বহিঃসভাম্। এইবার লক্ষ্মী আর গঙ্গাকে সরস্বতী পেলেন একা। ব্যস্, গঙ্গার চুলের মুঠি ধরে সরস্বতী কিছু একটা করতে যাবেন এমন সময় লক্ষ্মী সরস্বতীর কোমর ধরে ঝুলে পড়লেন। রাগের সময় এইরকম বাধা দিলে যা হয়, সরস্বতী লক্ষ্মীকেই এক সাংঘাতিক শাপ দিয়ে বসলেন।

আগেই বলেছি লক্ষ্মী হলেন অতি ভদ্র এবং স্নিগ্ধা মহিলা। শাপ শুনে তাঁর কিঞ্চিৎ ক্রোধাবেশ হল বটে, তবু তিনি ঈশাপাণির আপাতত ঈশাবদন-হীন

হস্তখানি ছেড়ে দিলেন না। ওদিকে চুলের মুঠিতে টান পড়ায় এবং তাঁরই কারণে লক্ষ্মীর হেনস্থা হওয়ায়, গঙ্গা এবার লক্ষ্মীকে বললেন— "ছেড়ে দাও বড়দি, এই ঝগড়াটে মেয়েছেলেটাকে— দুঃশীলা মুখরা নষ্টা নিতাং বাচালরূপিনী। ও আমার করবেটা কি? ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাই তো কলহপ্রিয়া— বাগধিষ্ঠাত্রী দেবীয়ং সততং কলহপ্রিয়া। দুর্মুখীর কত শক্তি আছে, আর আমার সঙ্গে কত ঝগড়া করতে পারে, আমি আজ তাই দেখব।" অতএব গঙ্গাও শাপাশাপি আরম্ভ করলেন। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির কর্তার মতো নারায়ণ অনেকক্ষণ বাইরে রইলেন বটে, তবে ভেতরে এসে দেখলেন পারস্পরিক শাপ-শাপান্তের পালা শেষ। তিনি প্রথমেই অভিমানিনী সরস্বতীকে টেনে নিলেন বুকে— বাসয়ামাস বক্ষসি। তারপরে অনেক দুঃখে নারায়ণ বললেন— যে বাড়িতে তিনটি বউ এবং সে বউয়ের চরিত্র যদি তিন রকমের হয় তাহলেই বিপদ। ব্যাধির জ্বালা বরং সহ্য হয়, বিষ খাওয়ার জ্বালা— সেও ভাল, কিন্তু — দুষ্টস্ত্রীণাং মুখজ্বালা মরণাদতিরিচ্যতে— ঝগড়াটে স্ত্রীলোকের মুখ-ঝামটা সহ্য করার থেকে মরণ ভাল।

সর্বদর্শী নারায়ণের এই করুণ অভিজ্ঞতার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল, তবে পুরাণ-পুরুষ তাঁর অভিজ্ঞতা-বশে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। তিনি বলেছিলেন— "একভার্যাঃ সুখী" অর্থাৎ একটি বউ থাকলেই স্বামীর সুখ, কিন্তু "নৈব বহুভার্যাঃ কদাচন" অর্থাৎ কিনা একাধিক বউ থাকলেই ঝগড়া লাগবে। কিন্তু হে পুরাণ-পুরুষ! তুমি অজ-জন্মরহিত, তুমি স্বয়ং জগৎ পিতা হওয়ায়, তোমার পিতাও নেই। যদি পিতা থাকত, তাহলে তুমি বুঝতে— এখনকার দিনে গার্হস্থ্য ঝগড়ার জন্য নিজেরই তিনটে বউ থাকার দরকার নেই, পিতার স্ত্রী কিংবা ভ্রাতার স্ত্রী থাকলেই যথেষ্ট, আর যদি নিদেন পক্ষে পিতার কিংবা ভ্রাতার দিক থেকে উপযুক্ত সরবরাহ-ব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্বয়ং স্বামীই এই অভাব পূরণ করে যোগ্য প্রতিপক্ষের কাজ করতে পারেন। কারণ এই ঘোর কলিযুগে (সমস্ত পুরাণ মতেই) মেয়েরা সব পুরুষের মতো আর পুরুষেরা সব— 'স্ত্রীবশঃ পুমান্'। কাজেই মাতা এবং ভ্রাতৃবধূর অভাবে স্ত্রীর যদি স্বামীর ওপর ক্রোধাবেশ হয় তাহলে স্বামী কি বলবেন, সেটি আমি প্রসিদ্ধ আলংকারিক প্রথায় জানাচ্ছি। বলবেন— সুন্দরী! অধম দাসের ওপরে রাগ হলে প্রভু তাকে পাদপ্রহার করেন— এতে কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু সেই প্রহারেও যে স্পর্শটুকু রয়েছে, তাতেই গায়ে দিয়েছিল কাঁটা— পুলকে রোমাঞ্চ।

ভয় হয়, গায়ের সেই রোমাঞ্চ-কণ্টকে তোমার কুসুম-কোমল পাখানিতে ব্যথা লাগেনি তো— উদ্যৎ-কঠোর-পুলকাঙ্কুর-কণ্টকাগ্রে, যদ্ ভিদ্যতে মৃদুপদং ননু সা ব্যথা মে।

অতি কঠিন এবং প্রতিকূল এক সময়ে এইরকম একটি আলংকারিক আত্মনিবেদন— এ বোধকরি সবার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এইরকম একটি লীলায়িত প্রতিবাদে দুনিয়ার সমস্ত স্বামীরা সামিল হবেন কিনা, তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে, সে যত ভদ্র ঘরই হোক, স্বামী-স্ত্রী কেউই কম যান না। অধিকাংশ পুরুষ মানুষেরই অবশ্য মনে মনে ধারণা যে, তাঁর স্ত্রীর মধ্যে পূর্বোক্ত পরমা-প্রকৃতি লক্ষ্মীর অংশ যতখানি তার থেকে নিত্য 'বাচালরূপিণী' সরস্বতীর অংশটাই বেশি। এ ধারণা যে সর্বৈব ভুল, সে কথায় একটু পরেই আসছি, তবে সরস্বতীর এই দুর্নামের কথাটা খুব সোজা। সবাই জানেন কিনা জানি না, এক শ্রেণীর আলংকারিকের মতে, সমস্ত কবিত্ব কিংবা কাব্যের অলংকার মানেই বেশি কথা বলা— অতিশয়োক্তি, অর্থাৎ মুখখানি যে চাঁদের মতো সুন্দর— এ কথা না বললেও পৃথিবীর কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হত না। তবু কাব্য আছে, অলংকারও আছে, অপি চ সমস্ত কাব্যালংকারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যদি বাক্-স্বরূপা সরস্বতীর ওপর নির্ভর করে, তবে ঝগড়া কিংবা বাদানুবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও সরস্বতীই বটে, কেন না ঝগড়া মানেও বাড়তি কথা বলা।

এখন সরস্বতী যেহেতু স্ত্রীলোক তাই পৃথিবীর তাবৎ স্ত্রীলোকের কিছু স্বাভাবিক বাক্-সিদ্ধি থাকলেও থাকতেও পারে, তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ একেবারেই ঠিক হবে না। বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যে এমনও প্রাচীন শ্লোক পাওয়া যায় যেখানে শুধুমাত্র রান্না না হওয়ার অপরাধে স্বামীদেবতা আপন স্ত্রীকে 'মহাপাপিনী' বলে সম্বোধন করেছেন। স্ত্রীও কম নন, তিনি বললেন— "পাপী আমি নই, পাপী তোমার বাবা।" আর যায় কোথা, স্বামী বললেন— বদ্ মেয়েছেলে কোথাকার, খুব যে কথা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে? গিন্নী ততোধিক ঝেঁজে বললেন— বদ্ মেয়েছেলে আমি? বদ্ হল তোমার মা-বোনেরা— তবৈব জননী রণ্ডা রণ্ডা ত্বদীয়া স্বসা। কর্তা বললেন— "বেরোও আমার বাড়ি থেকে।" গিন্নী বললেন— মজা নাকি, বাড়িটি কি তোমার, যে বললে, আর বেরিয়ে যাব। কর্তা এবার আর্তস্বরে ভগবানের কাছে মরণ ভিক্ষা চাইলেন, এবং ভাবলেন বুঝিবা তাঁর বাড়িতে উপপতির ভাগ্য খুলে গেছে— হা হা নাথ মমাদ্য দেহি মরণং জারস্য ভাগ্যোদয়ঃ। (মহাসুভাষিত সংগ্রহ)

এই যে ঝগড়া, এ সব সময়, সর্বত্র দেখা যায় না এবং যাও বা দেখা যায়, তাও খুব ভাল ঘরে নয়। তবে বড় মানুষের বড় ঘরেও যে এমন ঝগড়া চলে না, তা নয়, তবে তাতে থাকে আধুনিক পালিশ, শব্দ কিছু কম, কিন্তু যন্ত্রণা আরও বেশি।

আমি আগেই বলেছি, ঝগড়ার ক্ষেত্রে স্থান কাল এবং পাত্র— এই তিনটিই বড় জরুরি। বিশেষত অন্তর-মহলে যে ঝগড়া চলে, বহির্জগতে তা চলে না। যে নিন্দা-বাদ আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে চলে, সেই নিন্দাবাদই নতুন চেহারা নেয়, যখন তা বৃহত্তর জগতে ব্যবহার করি। তবে ঝগড়া কিংবা গালাগালির কথা যেহেতু আমি অতি লঘুভাবে আরম্ভ করেছি, তখন লঘু কথাগুলি আগেই সেরে নিই। ঝগড়াঝাটির ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অশিক্ষিত-পটুত্বের অভিযোগ থাকায় কালচার্ড অথবা বিদগ্ধা মহিলাদেব সম্বন্ধেও দু-এক কথা আগেভাগেই জানানো প্রয়োজন। গাথাসপ্তশতীর কবি হাল বলেছেন যে, ভাল ঘরের মহিলারা নাকি ভর্ৎসনা করেন হেসে, পীড়ন করেন অতি যত্ন করে আর কলহ করেন চোখের জল ফেলে। 'সুমহিলা'দের সম্বন্ধে আমাদের মনেও এইরকম উচ্চ ধারণা আছে বটে, তবে কার্যক্ষেত্রে শুধুমাত্র চোখের জলে আমাদের দেশের পুরুষ-পুঙ্গবদের মন ভুলবে কিনা, বলা শক্ত। বিশেষত, পুরুষের ধারণা— পুরুষ-মানুষেরা একদম ঝগড়া করতে চায় না, ঝগড়া বাধায় মেয়েরা।

এখনকার কালের কথা বলতে পারব না, তবে সেদিনের মেয়েদের ওপর এই দোষ চাপালে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে। কেন না এ-কালের নব-বধূ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সেকালের পুরুষ-শাসিত সমাজের কোনও তুলনা হয় না। প্রথমত খাতায়-কলমে, মনুর নিয়মে সেকালের মেয়েদের ঝগড়া করাব কোনও উপায় ছিল না এবং ঝগড়া করার শাস্তিও ছিল বড়ই কঠিন। কাজেই চোখের জল ফেলে ঝগড়া করার আদত যদি সুমহিলাদের জানা থাকে, তবে অন্যদেরও চোখের জল ফেলতে হত ঝগড়া করার অক্ষমতার জন্য। সেকালের শাস্ত্রমতে নারী-পুরুষ একবার সাত পাকে বাঁধা পড়লে আর খেয়াল-খুশিমত বিবাহ-বিচ্ছেদ করা চলত না। কিন্তু মজার কথা হল, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে পুনর্বিবাহের নিয়ম ছিল— তার মধ্যে অন্তত একটি হল, স্ত্রী যদি কলহকারিণী হয়, তবে তাকে উপেক্ষা করে— 'আবার মোরে পাগল করে দিবে কে'— এই নিয়মে দ্বিতীয় বিবাহ করা চলত। কিন্তু এ তো গেল নিয়মের কথা। আমরা জানি, বউ ঝগড়া করুন আর নাই করুন, নতুন মুখের আবেশ পুরুষ মানুষের

গা-সওয়া ছিল, কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর শ্লোক বাঁধা হয়েছে যার সারমর্ম হল— কলহকারিণী ধর্মপত্নী থেকে মুক্তি চাই— পরং প্রচণ্ডা কটু বাক্যবাদিনী, বিবাদশীলা পরগেহগামিনী। মোখর্য-যুক্তা চ পতীষ্টনাশিনী, ত্যজেত ভার্যা দশপুত্রপুত্রিণী॥

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই যে সাধারণীকরণ— এ নির্ঘাৎ পুরুষ মানুষের সৃষ্টি। একজন তো সুন্দর কায়দা করে স্ত্রীলোকের তুলনা করেছেন চুলকানির সঙ্গে। তিনি বলেছেন— প্রথমে সে সযত্নে ধরেছিল আমার হাত, তারপর আমার জঘন এবং কটি দেশে তার উপস্থিতি টের পেলাম, আমারও ভাল লেগে ছিল, তাই আমিও ব্যবহার করেছি আমার নখাগ্রভাগ— আপনারা ভাবছেন বুঝি বা ব্যাকুলা রমণী হবে কোন, কিন্তু না, এটি আসলে চুলকানি রোগ। সংসারেব চক্রে, ঘাত প্রতিঘাতে স্ত্রীলোকের রণরঙ্গিনী মূর্তি আমাদের অচেনা নয়, কিন্তু সমস্ত দোষ মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে ঝগড়াটে অপবাদ দেওয়া, এটা আমাদের প্রাচীন এবং পুরুষালি ট্র্যাডিশন। মনু মহারাজের আপন স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা কেমন ছিল জানি না, বিশেষত ফ্রয়েড সাহেবকে দিয়ে তাঁর যে কোনও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাব, সে উপায়ও নেই; কিন্তু এও সত্যি স্ত্রীলোকেব ব্যাপারে মনু একেবারে এক চোখো এবং একলাষেড়ে। তাঁর মতে মেয়েরা নাকি স্বভাবতই 'পুংশ্চলী', মানে পুরুষ মানুষ দেকলেই নাকি তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এক অর্থে, মনুব ভাগ্য খুবই ভাল, কেন না আমাদের আমলে মেয়েদেব স্বভাব একেবারে পাল্টে গেছে। বরঞ্চ পাড়া এবং রাস্তার মোড়ে, এমনকী ট্রামে বাসে পর্যন্ত, পুরুষদেরই এখন 'স্ত্রীচল' অবস্থায় দেখা যায়। মনুর ধারণা— স্বামীর ব্যাপারেও মেয়েরা এতটুকু নরম নয়, বরঞ্চ নিঃস্নেহতার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধ আচবণ করে। তাছাড়া মেয়েরা নাকি ভীষণ ঘুমোয়, কেবল বসে থাকে, ভীষণ সাজগোজ করে, অতিরিক্ত ক্রোধী এবং সুযোগ পেলেই বাবা-মা এবং স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া করে।

শুধু মনু নয়, প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রকারদের এবং আধুনিকপন্থী ভুক্তভোগীদের অনেকেরই এমন ধারণা হতে পারে। এমনকী কারও ওপর রাগে, অবহেলায় কিংবা অনাদরে আজকের দিনে যেমন 'যন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করি (একখানি যন্ত্রর বটে!) ঠিক তেমনি করেই বলেছেন কবি ভর্তৃহরি— স্ত্রী-যন্ত্রং কেন সৃষ্টম্— স্ত্রীলোক নামক যন্ত্রটিকে যে কে তৈরি করেছে! তবে হ্যাঁ, ভর্তৃহরির আত্মজ্ঞান ছিল এবং ছিল জগৎ সম্বন্ধেও কিছু বোধ, যার জন্যে সত্য স্বীকার করে

বলেছেন— যন্ত্র বটে, তবে সেটি 'বিষম্ অমৃতময়ম্'— অর্থাৎ 'বিষামৃতে একত্রে মিলন'। আমরা বলি, এ তো সংসারের চিত্রই, ভালবাসার রূপও তো প্রায় ওইরকম, অন্তত মধ্যযুগীয় কবি প্রেম বর্ণনার ক্ষেত্রেই তো ওই পদটি ব্যবহার করেছেন— 'বিষামৃতে একত্রে মিলন'। তবে বিষের ভাগটা শুধু মেয়েদের দান করে অমৃতের ভাগটুকু মুখে পুরে অমৃতনিষ্যন্দী ভাষায় পুরুষ মানুষ মেয়েদের কীই না বলেছে!

আমি মনুর কথা কিংবা ভর্তৃহরির কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, এঁরা কেউ কিন্তু অন্দর-মহলে ঝগড়া করছেন না, অথচ অকপটে এবং বিনা দ্বিধায় সমস্ত জগৎবাসী স্ত্রীলোককে ধরে গালাগালি দিয়েছেন। এগুলোও কি ঝগড়া নয়? তাছাড়া আমি একটুও সায় দিতে পারি না মনুর কথায়, যে, মেয়েরাই শুধু ঝগড়াটে, পুরুষেরা নয়। পাঠক! দশরথের কথা স্মরণ করুন। তিনি নিজেই একসময় প্রেমে গলে গিয়ে বর দিতে চেয়েছিলেন কৈকেয়ীকে। তারপর যেই কৈকেয়ী বর চাইলেন অমনি যদি কৈকেয়ীব বংশ তুলে দশরথ বলেন— এমন কথা বলতে তোর দাঁত খসে খসে পড়ছে না— ন নাম তে কেন মুখাৎ পতন্ত্যধো, বিশীর্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা— তাহলে কি বলব দশরথ ঝগড়াটে নন? তার ওপরে দেখুন, 'ভদ্দরলোকের' ঘরে স্ত্রীলোককে গালাগালি দেওয়ার ভাষাও যে খুব পরিশীলিত ছিল তাও নয়। 'মাগী-মিনশে'র উতোর চাপান ছেড়েই দিলাম, পুরুষ মানুষ কিঞ্চিৎ কুপিত হলেই 'দাসীত্র-পুত্রীত্র' মানে দাসী পুত্রী কিংবা গর্ভদাসী— এ ছিল বাঁধা গৎ।

অনেকেই জানেন, কিংবা জানেন না যে, সেকালে স্ত্রী ঋতুমতী হলে, সেই তিন-চার দিনের জন্যও পুরুষ মানুষের একটি দাসীর প্রয়োজন হত এবং প্রয়োজন যখন হত তখন পুত্রও জন্মাত— স্বয়ং মহাত্মা বিদুরই এই জাতের ছেলে, ধৃতরাষ্ট্রেরও শতাধিক একটি বেশ্যা-পুত্র ছিল, যুযুৎসু। সে যাই হোক, দাসীদের দেখা হত প্রায় গণিকার প্রতিনিধি হিসেবে, কাজেই দাসীপুত্রী কিংবা গর্ভদাসী— ভদ্রলোকের গালাগালি নয়, তবু ভদ্রলোকেরাই এই শব্দগুলি ব্যবহার করতেন। কিংবা ধরুন, কোনও পুরুষ মানুষ যদি কোনও স্ত্রীলোককে বলেন 'ভ্রমর টেন্টে' অথবা 'টেন্টাকরালে' তাহলে প্রথমত শব্দ-মাধুর্যেই সেই স্ত্রীলোকের পিত্তি চটে যাবে, তার পরে সে যদি বোঝে 'ভ্রমরটেন্টা' মানে প্রায় গণিকা, আর 'টেন্টাকরালে' মানে জুয়োচোর, তাহলে কোন স্ত্রীলোক ঝগড়া না করে থাকবে? অথচ রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতে ঠিক এই ভাষায়ই রাজার

পরিচারক বিদূষক গালাগালি করেছে রানির পরিচারিকা বিচক্ষণাকে। প্রত্যুত্তরে বিচক্ষণা কটু কথা ব্যবহার করেননি। যদি বলেন বিদূষক 'হাই সোসাইটির' কোনও প্রতিনিধি নয় এবং তার কথাই অমনিধারা; তাহলে পৌরবকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ দুষ্যন্তের ভাষণটি দিতে হয়।

মনে রাখবেন, ইনি কালিদাসের দুষ্যন্ত নন, ইনি মহাভারতকার ব্যাসের দুষ্যন্ত। এখানে দুর্বাসার শাপ-টাপের বালাই নেই। বরঞ্চ শকুন্তলা দুষ্যন্তেব শ্রম লাঘব করে ছেলেকে বেশ খানিকটা বড় করে নিয়ে এসেছেন কন্বমুনির আশ্রম থেকেই। দুষ্যন্ত দেখেই চিনতে পেরেছেন তাঁর স্ত্রীকে, কিন্তু সভাসদ পরিজনবর্গের সামনে পূর্বকামুকতা প্রকাশের ভয়ে শকুন্তলাকে ডেঁটে বললেন— কে হে তুমি দুষ্ট তাপসী? শকুন্তলা সরল মনে আত্ম-পরিচয় দিলেন। মা মেনকা, বাবা বিশ্বামিত্রের পরিচয়ও দিলেন। রাজা বললেন— দেখ, ওসব ছেলে-টেলের খবর আমি জানি না, মেয়েরা ভীষণ মিথ্যে কথা বলে— অসত্যবচনা নার্য্যঃ। আর তোমাব মার কথা আর বোল না, সে তো একটা কুলটা-বেশ্যা— বন্ধকী জননী তব। তোমাকে পূজাব নির্মাল্যের মতো ছুঁড়ে ফেলেছিল হিমালয়ের কোলে। বাপও তোমার কামলুব্ধ। পুংশ্চলীর মতো কথা বোল না, কোথা থেকে একটা 'শালস্তম্ভে'র মতো বিরাট ছেলে ধরে নিয়ে এসে, বলে কিনা, আমার ছেলে। সাধুবেশে আমাকে ভাঁড়ানোব চেষ্টা কোর না, তুমি এখন এস।

তাহলে পুরুষ মানুষও ঝগড়া করতে জানে। তবে এর উত্তরে শকুন্তলা যে ঝগড়া করেননি তা মোটেই নয়, সুমহিলাদের চোখের জল ফেলে ঝগড়া করার কায়দা তিনি রপ্ত করতে পারেননি। বিশেষত এই ব্যাপারে ঝগড়া করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে। তবে স্ত্রীলোকের কলহ-স্থানগুলি উল্লেখ করে আমি এই প্রবন্ধকে দাম্পত্য-কলহের রূপ দিতে চাই না। বরঞ্চ পুরুষ মানুষের ঝগড়ার বিবরণ দিতে পারি শতখানেক, যদিও তাতেও আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তার চেয়ে গাথাসপ্তশতীর নিপুণ কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা সেই বিদগ্ধা মহিলার প্রতি সমব্যথী হই, যিনি বলেছিলেন— ঠাকুর তোমার পায়ে নমো নমঃ, আমার দয়িত স্বামীটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও অন্য কোনও মহিলার। কেন না যেসব পুরুষ মানুষ একজনেরই রস পায়, তারা কোনটা দোষ কোনটা গুণ, কোনটা মন্দ, কোনটা ভাল— সে বিচার জানে না।

দুই

এতক্ষণ যা বলেছি তাতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, আমি এখনও অন্দর-মহলের চত্বর থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে পারিনি। তবে অন্দর-মহলের যে চিত্রটুকু আমি দিয়েছি, তাতে পাঠককুল অন্তত এটুকু বুঝেছেন যে, ভদ্রলোকেরাও যথেষ্ট সুন্দর ঝগড়া করতে পারে এবং অতি নিচু মানের গালাগালিও অপরকে দিতে পারে অবলীলাক্রমে। কথাটা যদি বেশ একটু মনোবিজ্ঞানীর কায়দায় বলতে পারতাম, তাহলে ভাল হত। কিন্তু আমার অনধিকার চর্চার সীমা অতদূর যায়নি। আমি বরঞ্চ সাধারণভাবে বলতে পারি— ঝগড়া কিংবা গালাগালির প্রক্রিয়া শুরু হয় এক ধরনের অহংবোধ থেকে কিংবা অভিমান থেকে। এই কারণে এক সুন্দরী আরেক সুন্দরীকে সহ্য করতে পারে না, এক নামী সার্থকনামা পুরুষ আরেক নামী পুরুষকে, এক ধনী অন্যতর ধনীকে সহ্য করতে পারে না। কবি, সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত মানুষেরাও এর গণ্ডি থেকে বাইরে যেতে পারেননি। পাঠকের মনে পড়বে— অতিধীর রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীর কাছে বনে যাবার প্রস্তাব শুনে সীতাদেবীকে সব জানিয়ে বলেছিলেন— আমাকে বনে যেতে হচ্ছে, কাজেই তোমাকে যদি ভরতের কাছে থাকতে হয়, তবে তাঁর অনুকূল ব্যবহার করেই থাকতে হবে, কেন না তোমাকে ভরণ-পোষণ করা ভরতের অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। বিশেষত তুমি যে ভরতের সামনে আমার গুণ গেয়ে গেয়ে বিলাপ করবে, তাতে কোনও সুবিধে হবে না, কেন না সমৃদ্ধ পুরুষেরা অপর গুণি-জনের প্রশংসা সহ্য করতে পারেন না— ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।

অতএব পাঠক! ঝগড়া এবং গালাগালি— পণ্ডিত, মনীষী, সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার নমুনা শুনবেন। অমন যে শঙ্করাচার্য যিনি সারা বেদান্তভাষ্য আর উপনিষদ্ ভাষ্য জুড়ে 'অহং-মম' ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি নৈয়ায়িকদের গালাগালি দিয়ে বলেছেন— নৈয়ায়িকরা হল 'শিং আর ল্যাজ্-ছাড়া বলদ'। রামানুজই বা কম কিসে, তিনি একই কথা ফিরিয়ে দিয়েছেন অদ্বৈতবাদী শঙ্করকে, বলেছেন— অলাঙ্গুলশৃঙ্গা বলীবর্দাঃ। দার্শনিক দৃষ্টিতে রামানুজ, মধ্বাচার্য— এঁরা হলেন দ্বৈতবাদী, আর শঙ্কর হলেন অদ্বৈতবাদী। বহুকাল পরে, বহু যুগ টপকে নিজের মনের মতো আপন জন একটিই পেতে পারতেন শঙ্কর, তিনি হলেন মধুসূদন সরস্বতী। মধ্বাচার্যকে

তিনি বলেছেন— বোকা, ছেলেমানুষ এবং নীতিভ্রষ্ট। আরও বলেছেন তত্ত্ববাদী মাধ্বপন্থীরা যদি প্রলাপ বকে, তার উত্তর কি বিদ্বান মানুষ দেবে? গাঁয়ের কুকুর যদি ঘেউ ঘেউ করে চেঁচায়, তার উত্তরে কি আমাদের মতো অদ্বৈতবাদী সিংহেরা প্রতিবচন দিয়ে ডাক ছাড়বে— ন হি রুতমনুরৌতি গ্রামসিংহস্য সিংহঃ।

মধ্বাচার্যের মতো দার্শনিক মধুসূদনের হাতে পড়ে 'গ্রাম সিংহ' মানে কুকুর হয়ে গেছেন। নৈয়ায়িকেরাও মধুসূদনের হাত থেকে রক্ষা পাননি। এক নৈয়ায়িক, তাঁর নামও শঙ্কর— তিনি কাজের মধ্যে 'ভেদরত্ন' বলে একখানা বই লিখেছিলেন। ব্যাস্, আর যায় কোথা, মধুসূদন তাঁকে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে শোলোক লিখেছেন এবং সে ভেঙানো এমনই যে, শঙ্করের শব্দগুলিই এদিক-ওদিক করে বসানো, যদিও তার মানেটা মধুসূদনের পক্ষে যাবে। গ্রন্থশেষে নৈয়ায়িক শঙ্করকে একেবারে কাঠগড়ায় তুলেছেন মধুসূদন। প্রায় নাটক করে শঙ্করকে আসামীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন; এবং তাঁকে দিয়েই বলিয়েছেন— "যদিও আপনার দয়া করে অদ্বৈতবাদ নিরূপণ করেছেন অতি সুষ্ঠুভাবে, তবুও আমার হৃদয় যেন মানছে না, কি করি?' মধুসূদন নাটকেই উত্তর দিয়েছেন— তুমি হলে বুড়ো ষাঁড়, আর তোমার হৃদয়টা হয়ে গেছে পাথর। কাজেই শৈলসাব হৃদয়ে কিছুই ঢুকবে না। শঙ্কর বললেন— আমাকে বুড়ো ষাঁড় বলছেন কেন? মধুসূদন তার কারণ দেখিয়ে বলেছেন তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই বুড়ো ষাঁড় বলেছি। আমরা তো আর তোমার মতো নয়, বৎস। শঙ্কর আবার বলেছেন— আমাকে 'বৎস' বলে সম্বোধন করছেন কেন, আমি বুড়ো মানুষ। মধুসূদন মেজাজ দেখিয়ে বলেছেন— চুল পাকলেই কি বুড়ো হয়, পড়াশুনো করে যাঁরা কৃতবিদ্য হয়েছেন, তাঁরাই আসলে বুড়ো, তোমার তো সে সবের বালাই নেই কাজেই... ভাবখানা এই যে, 'বৎস' বলে সম্বোধন করেছি, বেশ করেছি।

নিজেরই কল্পিত নাটকের শেষে, মধুসূদনের থেকে বহু অংশে প্রাচীন এই নৈয়ায়িককে শেষ পর্যন্ত করজোড়ে মধুসূদনের উপদেশ মেনে নিতে হয়েছে, কেন না ধরাধাম ত্যাগ করে বহু আগেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রের মায়া কাটিয়েছেন। মহা-মহা-পণ্ডিতদের মধ্যে অপরকে লক্ষ্য করে 'কুকুর', 'ষাঁড়', 'বলদ' ইত্যাদি গালাগালি দেবার প্রবৃত্তি যত হীনই হোক, তবু দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত, সমালোচকদের মধ্যে আরেক ধরনের ঝগড়া হোত বিষয় ধরে। কূট, দার্শনিক তথ্য সন্নিবেশ করে সেই সব ঝগড়া সাধারণ্যে প্রকাশ করা আমার পক্ষে কষ্টকর, তবু একটু নমুনা দিই। যেমন ধরুন— নৈয়ায়িকেরা পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়

মানেন— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। সাংখ্য দর্শনের পণ্ডিতেরা আবার অতিরিক্ত আরও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় মানেন। অর্থাৎ সাংখ্যদের ধারণা জগতে যত বস্তু আছে তার সবগুলিই শুধুমাত্র চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক— এই পাঁচটির দ্বারা গ্রহণ কিংবা অনুভব করা সম্ভব নয়। অতএব আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করলেই আর কোনও ঝামেলা থাকে না।

এইবার নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের পালা। মোটামুটি দশম শতাব্দীর পূর্বের এই নৈয়ায়িক বিষয় ধরে গালাগালি দেওয়ার ব্যাপরে একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাংখ্য-দার্শনিকের গুষ্ঠির তুষ্টি করে তিনি এক জায়গায় বললেন— হায়, পৃথিবীর যত মূর্খতা— তা সবই সাংখ্যদের হৃদয়ে এসে বাসা বেঁধেছে। আবার অন্য জায়গায় সাংখ্যদের এই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বাদ সহ্য করতে না পেরে জয়ন্ত বললেন— এতই যখন বলছ, তা অতিরিক্ত শুধু ওই পাচটা কেন, কর্মেন্দ্রিয় তো আরও আছে। এই ধর কণ্ঠনালী, সেও তো অন্ন গ্রহণের কাজ করে, অতএব ওটি একটি কর্মেন্দ্রিয়। আবার ধর বক্ষ— সেও স্তন-কলশাদির আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করে, অতএব বক্ষও একটি কর্মেন্দ্রিয়। কাঁধ-দুটি ভাব-বহন করে, ও দুটিও কর্মেন্দ্রিয়। ওহে সাংখ্য-পণ্ডিত, যদি বল এই কাজগুলি তোমাদের বলা ওই অতিরিক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক, পানি, পাদ— ইত্যাদির দ্বারাই সম্ভব, তাহলে জিজ্ঞাসা করি,— তোমাদের ভাত-খাওয়া, জলপান— এসব কর্ম কি হাত দিয়ে চলে না পা দিয়ে; না কি মলদ্বার দিয়ে চলে— কিংনু ভবান্ অন্ন-পানং পানিপাদেন নিগিরতি, পায়ুনা বা। অতএব দেখা যাচ্ছে কণ্ঠনালী, বক্ষ কি কাঁধ— এগুলোর যথেষ্ট কাজ থাকা সত্ত্বেও, যদি এগুলোকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার না কর, তাহলে ওই বাক, পানি, পাদ— এই অতিরিক্ত পাঁচটাও স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা— এইগুলিই যথেষ্ট, নইলে, যা বলেছি— অগুনতি ইন্দ্রিয় স্বীকার করতে হবে।

দার্শনিকদের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। কাজেই বিষয় ধরে প্রতিপক্ষের পক্ষশাতন করা এবং সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ কটু রসোদগার করা— এ তাঁদের বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল। এই কটুত্বের তীব্রতা কখনও ব্যক্তি বিশেষকে রসাতলে পাঠিয়ে দিত, কখনও বা সম্পূর্ণ সম্প্রদায় অন্যপক্ষের দূষণ-চিহ্নে কলঙ্কিত হতেন। সম্প্রদায় হিসেবে বৌদ্ধরাই বোধ হয় সবচেয়ে গালাগালি খেয়েছেন অন্য পক্ষের দার্শনিকদের কাছে। অবশ্য বৌদ্ধরাও ছাড়েননি। কিন্তু পারস্পরিকভাবে এই প্রচণ্ড বাদানুবাদ এবং প্রখর গালাগালির মধ্যেও দার্শনিকদের মধ্যে এমন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল, যাতে দু'পক্ষই লাভবান হয়েছেন। অবশ্য আপাতত আমি যেহেতু মাছির মতো দূষণ-ক্ষতের চিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই গালাগালির কথাতেই আসি।

এসব দশম শতাব্দীর পূর্বের কথা। নৈয়ায়িক শঙ্কর মিশ্রকে বৌদ্ধাচার্য জ্ঞানশ্রীমিশ্র কোনও এক সময় বলেছিলেন 'বাচাল'— শঙ্করোহপি বাচাটতয়া কিমপি নাটয়তি। অবশ্য নৈয়ায়িক শঙ্কর ধোয়া তুলসী পাতা নন, তিনিও পূর্বতন বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্ত্তিকে ধূলিসাৎ করেছিলেন। কিন্তু সেই অপরাধের ফলে স্বয়ং জ্ঞানশ্রীমিশ্র শঙ্করকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি কড়া কথা শুনতে হয়েছে জ্ঞানশ্রী-শিষ্য রত্নকীর্ত্তির কাছে। তিনি বলেছেন— আমাদের গুরুকে অপমান করা। বেটা পশুর পশু, ঠকবাজ, তুমি আমাদের কৃপার পাত্র— অতএবাত্র প্রস্তাবে ভগবতঃ কীর্ত্তিপাদান্ (ধর্মকীর্ত্তি) অবমন্যামানঃ শঙ্করঃ পশোরপি পশুরিতি কৃপাপাত্রম্ এবৈষ জাল্মঃ। (রত্নকীর্ত্তি, স্থিরসিদ্ধিদূষণ)। নৈয়ায়িকেরাও ছাড়েননি। তাঁরা একেবারে সম্পূর্ণ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে বলেছেন— বেটারা এদিকে বলে সব শূন্য আর ওদিকে শিষ্যদের বোঝাচ্ছে— বুদ্ধায় দেয়ং, ধর্মায় দেয়ং, সংঘায় দেয়ং— বুদ্ধকে দাও, ধর্মকে দাও, সংঘকে দাও এইভাবে লোকের সঙ্গে প্রতারণা করে নিজেরা শিষ্য এবং অনুগামীদের দেওয়া অন্নপানে পেট-মোটা করছে— যত সব ধূর্ত্ত এসে জুটেছে। (ভাসর্বজ্ঞ, ন্যায়ভূষণ)

এ তো গেল সমস্ত সম্প্রদায়ের নামে কলঙ্ক-রোপন। কিন্তু জ্ঞানশ্রী এবং রত্নকীর্ত্তি, গুরু-শিষ্য মিলে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ হেনেছিলেন নৈয়ায়িক শঙ্করের বিরুদ্ধে, তার বদলা নিলেন উদয়নাচার্য, যিনি একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন এবং নব্যন্যায়ের সন্ধিযুগে বৌদ্ধদের জর্জরিত করেছিলেন। একে তো মাঝে মাঝেই বৌদ্ধদের তর্ক ধূলিসাৎ করে উদয়ন বলেছেন— এই আমি এবার বৌদ্ধদের মাথায় ডাণ্ডস্ মারলাম— বৌদ্ধস্য শিরশি এষ প্রহারঃ, এরপর উদয়ন একজায়গায় জ্ঞানশ্রী আর রত্নকীর্ত্তিকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন। অবশ্য শিষ্য রত্নকীর্ত্তির থেকে গুরু জ্ঞানশ্রীর ওপরেই তাঁর রাগটা বেশি এবং উদয়নের ধারণা, জ্ঞানশ্রীর জন্যই রত্নকীর্ত্তির এত বাড় বেড়েছে। উদয়ন যুক্তিতর্ক দিয়ে গুরুর উদ্দেশ্যে বললেন— তোমাদের এক কথার সঙ্গে আরেক কথা মেলে না, উদ্ভট তোমাদের কথাবার্তা। আর শিষ্যও করেছ যেমন, একেবারে জড়বুদ্ধি। কোন চেতন মানুষকে তোমাদের যুক্তিতর্ক বোঝানো যাবে না, যেমনটি তুমি তোমার

শিষ্য রত্নকীর্তিকে বুঝিয়েছ, এখন আমার ঠেলা সামলাও— ত্বয়ৈব গ্রাহিতঃ শিষ্যঃ। ন চৈবং চেতনঃ গ্রাহয়িতুং শক্যতে, স্ববাগ্‌বিরোধস্য উদ্ভটত্বাৎ।

জ্ঞানশ্রী রত্নকীর্তির তুলনায় এ গালাগাল অতি ভদ্র। বিশেষত তখনকার দিনে শিষ্যের যুক্তি যদি শিথিল হত তাহলেই তার গুরুকে কিঞ্চিৎ গালাগাল দেবার রেওয়াজ ছিল। যেমন ধরুন চৈতন্য মহাপ্রভুর আগের যুগে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের কথা। কলাপ ব্যাকরণের টীকা লিখতে বসে তিনি কেবলই তাঁর পূর্বতন শ্রীপতিদত্তকে নিন্দা করেছেন এবং কোনও এক সময় শ্রীপতির ওপর এতই চটে গেছেন যে পুণ্ডরীকাক্ষ বলেই ফেললেন— বাজে গুরুর কাছে শিক্ষে নিলেই মাথার মধ্যে এইরকম দুর্বুদ্ধির সম্পদ গজায়— তদ্ অসদ্ উপাধ্যায়-সেবা-বিজৃম্ভিত-দুর্বুদ্ধি-বৈভবাদেব।

দার্শনিক যুক্তিতর্ক প্রচার করতে গিয়ে মতের অমিল ঘটলে প্রতিপক্ষীর সঙ্গে তার গুরুকেও এক হাত নেওয়া— এ অতি ভদ্র ব্যবহার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনও যুক্তিবাদী দার্শনিক যদি শিথিল যুক্তি নিয়ে পূর্বোক্ত জয়ন্ত ভট্টের যুক্তিজালে আবদ্ধ হন তবে তাঁকে কোনও না কোনও সময় এমন কথা শুনতে হবে, যা আমাদেরও শুনতে লাগবে চমৎকার। যেমন ধরুন মীমাংসাশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বললেন— জগতে সাদা রঙ একটাই; পাঁচটি সাদা ফুল থাকলে, পাঁচটি সাদা রঙ স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নৈয়ায়িকের চুলচেরা বিচারে পাঁচটি সাদা ফুলে পাঁচরকমের সাদা রঙ আছে; সাদা রঙগুলি সদৃশ হতে পারে কিন্তু ভিন্ন বটে। অতএব নৈয়ায়িক জয়ন্ত, কুমারিল ভট্টের উদ্দেশে চরম রসিকতা করে বললেন— অহো রসমারূঢ়ো ভট্টঃ— ভট্ট মশাইয়ের ভারি রস হয়েছে— এবার বল, জগতে কর্মও একটা, বুদ্ধিও একটি, গুণও একটিই আছে এবং তা হল সাদা। এসব কথা কিরকম জান? "স্ত্রী-গৃহে কামুকোক্তয়ঃ"— প্রেমিকার ঘরে বসে কামুক লোকেরা যেমন হালকা চালে হাজারো ভাব-ভালবাসার কথা বলে, সেইরকম লঘু আলাপনের রস চেগিয়ে উঠেছে ভট্ট কুমারিলের। (জয়ন্তভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী)

এইরকম করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার চাতুর্য সবার হয় না। জয়ন্ত ভট্ট যখন মেজাজে থাকেন তখন রসিকতার সঙ্গে ঝাঁঝ মেশে। কিন্তু তাঁর মেজাজ ভাল না থাকলে রসিকতা যায় হারিয়ে, পরপক্ষের জন্য টিকে থাকে শুধু ঝাঁঝটুকুই। যখন প্রভাকর মিশ্রের অনুগামী মীমাংসক পণ্ডিতদের কিছুতেই নিজের যুক্তি-তর্কগুলি বোঝাতে পারছেন না, তখন জয়ন্তের বিরক্তি চরমে

ওঠে, ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠেন— আঃ কুণ্ডশেখর— কুণ্ড মানে হাঁড়ি, ঘট অর্থাৎ মাথাটা তোমার একেবারে নিরেট হাঁড়ির মতো, ঘটে কিছুই নেই, এতবার করে বলছি তাও মাথায় ঢুকছে না— "আঃ কুণ্ডশেখর! কথম্ অসকৃদ্ অভিহিতমপি ন বুধ্যসে।"

আমি জানি, পণ্ডিত এবং মনীষীদের এই প্রবন্ধের মধ্যে টেনে এনে আমি ঘোর অন্যায় করেছি। একে তাঁদের যুক্তি-বুদ্ধি মানুষকে বোঝানো দুষ্কর, তার ওপরে এ হল আরেক প্রান্ত, যা আমাদের পূর্বকথিত অন্দর-মহল থেকে অনেক দূরে। সভ্যতার দুই বিরুদ্ধে কোটির এক কোটিতে যদি সাধারণ মানুষ থাকেন তবে অন্য কোটিতে আছেন পণ্ডিতেরা, অথচ সময় মতো এঁদের ভাষার কি মিল! অন্তত আর একটি উদাহরণ না দিলে আমি পাঠকের কাছে ঋণী থাকব, তাই বলেই ফেলি। ইনি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। মূলত ইনি প্রবন্ধকার, আলংকারিক, তবে কবিও বটে। অল্প-বয়সেই পণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় জগন্নাথের কাঁচা বয়েসটি কেটেছে সম্রাট শাজাহানের সভাপণ্ডিত হিসেবে— দিল্লীবল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। জগন্নাথের ধারণা ছিল— নিম্নমানের কবিরা বড় কবির কবিতা থেকে পদ চুরি করেন, ভাব চুরি করেন এবং একটু এদিক-ওদিক করে কবিতা বানিয়ে ফেলেন। তাই জগন্নাথ নিজে যে কবিতা রচনা করতেন, তা একেবারে নতুন, অন্য কবিদের থেকে বিলক্ষণ। কবিদের চুরির ব্যাপারটা তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়ায়, তিনি লিখলেন— "যতসব দুশ্চরিত্র, বেজম্মা— অন্যেরা চুরি করবে ভয়েই আমি আমার একান্ত আপন পদ্যরত্নগুলি একটি পেটিকায় ভরে রেখেছি— দুর্বৃত্তা জারজন্মানো হরিষ্যন্তীতি শঙ্কয়া। মদীয় পদ্যরত্নানাং মঞ্জুষৈষা কৃতা ময়া।" জগন্নাথের কীর্তি আছে অনেক। তাঁর কাছে সোজাসুজি অপরাধ না করলেও কোনও পণ্ডিত যদি এমন কথা বলেন, যা তাঁর রুচিমত নয়, তাহলেই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের হাতে তাঁকে মার খেতে হবে। ঠিক এইরকমই ঘটেছিল যখন মহা বৈয়াকরণ ভট্টোজি দীক্ষিত 'প্রৌঢ়-মনোরমা' বলে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। জগন্নাথ আর কিচ্ছু করেননি, কটূক্তি নয়, গালাগালি নয়, শুধু নিজে আরেকখানা বই লিখে ফেললেন এবং তার নাম দিলেন 'মনোরমা-কুচ-মর্দিনী'।

মহাপণ্ডিতের কলম থেকে যে কুকথাগুলি বেরোল তার কারণ আছে। পণ্ডিতে-পণ্ডিতে বিবাদ হওয়ারও নীতিগত, আদর্শগত এবং সম্প্রদায়গত কারণ থাকে। কিন্তু গালাগালি দেওয়ার ব্যাপারে ঘরে এবং বাইরে সর্বত্রই এক ধরনের

সঙ্গতি আছে। আমার ধারণা— সভ্যতা, ভব্যতা এই সব গালভরা শব্দের সঙ্গে এই গালাগালির কোনও সম্বন্ধও নেই; দরকার হলে, সময় বুঝে মানুষ দেখে এই সব গালাগালি আপনার তাগিদে স্বতঃই উৎসারিত হয়। কখনও বা এই উৎসারণ এতই সহজ যে, গালাগালি দেওয়ার কারণও ভাল করে থাকে না, তবু চলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড। এই জিনিসের সবচেয়ে বড় উদাহরণ জাত তুলে, কিংবা দেশ তুলে গালাগালি। আপাতত সমাজবিজ্ঞানীরা এইসব গালাগালি নিয়ে দেশ এবং কাল সম্বন্ধে নানা তথ্য বার করার চেষ্টা করছেন। আমার বুদ্ধি কম, আমি শুধু এইটুকু বলি, দুনিয়ায় এমন জাত নেই, যে অন্যের কাছে গালাগালি খায়নি। সে শুধু বামুন-কায়স্থ নয়, গুরু থেকে আরম্ভ করে স্যাকরা— তাঁদের আপন কর্ম দোষে অন্যের মুখ-ঝামটা খেয়েছেন। আজকের যুগে বাংলা প্রবাদমালার কল্যাণে, বাংলা ভাষায় এসব গালাগালি অনেক জানি, তবে এর শুরু যে কবে থেকে, সেই কথাটাই জানাতে চাই।

আজকের দিন থেকে পূর্বতন দিনে সভ্যতার বোধ উন্নততর ছিল কিনা জানি না, তবে এখন কেউ বরিশালের লোককে তাঁর দেশ নিয়ে কড়া কথা বললে, কিংবা অশান্তিপুরের মানুষকে শান্তিপুরের ভদ্রতার কথা জানালে মনে দুঃখ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও অন্যায় হয় না; কিন্তু তখনকার দিনে কড়া শাস্তি হত। মুস্কিল হয়েছে, এখনকার বুদ্ধিজীবী থেকে কমিউনিস্ট সবাই মনু-মহারাজের ওপর বড় খাপ্পা, কিন্তু মনু-যাজ্ঞবল্ক্য না হলে তখনকার সমাজ জানব কি করে? মনু যদিও বড় বেশি ব্রাহ্মণ-ভক্ত, তবুও তিনি সকলের জন্য আইন জারি করে বলেছেন— কেউ যদি কারও দেশ, জাতি কিংবা কর্ম নিয়ে নিন্দা করে, তার দুশো পণ দণ্ড হবে। আইন যে কিছু ছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠ অংকে। মৎস্যজীবী ধীবর যখন মাছের পেট থেকে রাজার নাম লেখা আংটি বার করেছে, তখন রাজার শালা দুটি পুলিশ নিয়ে সেই ঘটনা পরখ করতে এসেছেন। শালা বললেন— তুই করিস কি? মানুষটি বলল— আমি শক্রাবতারে থাকি, আমি জেলে, মাছ মেরে কুটুম্ব-ভরণ করি। রাজার শালা টিপ্পনী কেটে বলল— দারুণ শুদ্ধ তোর জীবিকা। জেলে হলে কি হবে, অতি শক্তিমান রাজকর্মচারীর সামনে একটুও লজ্জা না পেয়ে, এই ব্যাঙ্গোক্তির প্রতিবাদ করে জেলে বলল— ওরকম কথা বলবেন না মশায়! যা আমার জাত-ব্যবসা, তাই করি। রাজার শালা, প্রচণ্ড রাজপুরুষও এতে লজ্জা পেলেন।

তাই বলি, মনুর আইন একেবারে মিথ্যে নয়। তবে মনুর অর্থদণ্ডের পরিমাণ থেকে অনুমান করতে পারি যে, এই ধরনের গালাগালি বেশ চালু ছিল, যদিও ইন প্রিন্সিপল্ সবাই জানত, যেমন এখনও সবাই জানে, যে এই ধরনের গালাগালি দেওয়া বড়ই গর্হিত। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুর আইনটিকে একটু ক্ল্যারিফাই করার চেষ্টা করেছেন। যেমন ধরুন, কেউ হয়তো ব্রহ্মাবর্তের বামুন, তাকে বলা হল— বেটা একেবারে বাহ্যক অর্থাৎ বাহীক-জাঠ। এরকম যদি কেউ আবার ক্ষত্রিয়কে বামুন বলে গালাগালি দেয়, তাহলে সেটাও কিন্তু গালাগালি এবং সেটা জাত তুলে। কেউ বলতে পারেন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নামে ক্ষত্রিয়কে সম্বোধন করলে ক্ষতি কি? আমরা বলব, সমস্ত জাতের লোকেরই জাতিগত কিছু দোষ থাকে এবং জাত তুলে গালাগালি দেবার সময় মানুষ এই দোষগুলিকেই উদ্দেশ করে। স্বয়ং ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে আপন স্ত্রীর কাছে শুনতে হয়েছিল— অত শান্তি শান্তি কোর না, শান্তবৃত্তি বামুনকেই মানায়, রাজাদের নয়— শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো, ন ভূভৃতঃ। তোমার যদি অত ইচ্ছে থাকে, তাহলে বনে চলে যাও, আর মাথায় জটা রেখে মুনিদের মতো আগুনে আহুতি দাওগে যাও— জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কোন বীর্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়কে বামুন বললে, সে ভাবে— হয়তো কেউ ব্রাহ্মণের মতো চাল-কলা-ছাঁদা-বাঁধা, অতি ব্রত-পার্বনশীল নিবীর্য মানুষটিকে উদ্দেশ করছে। অতএব এটি গালাগালি।

মনু-যাজ্ঞবল্ক্য খেয়াল করেননি, বামুনকে ক্ষত্রিয় কিংবা ক্ষত্রিয়কে বামুন- এরকম একের বৃত্তি অন্যতরের ঘাড়ে চাপিয়ে গালাগালি দেওয়ার প্রয়োজন নেই; কোনও মানুষকে তার আপন জাতি, আপন দেশ আপন কর্ম ধরেই গালাগালি দেওয়া যায়। কেন না জাতি-দোষ, দেশদোষ কিংবা বৃত্তিদোষই এক্ষেত্রে গালাগালির জন্য যথেষ্ট এবং সভ্য মানুষেরা সেইগুলিকেই উদ্দেশ্য করেন। অনেকেই মনে করেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের সম্বন্ধে যে অপভাষাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, তা বামুনদেরই তৈরি। আমি এ কথা মানি না, কেন না, জাতি বিষয়ক অপভাষাগুলি একেবারে লোকস্তরে নেমে এসেছে এবং বামুনদের নিয়েও ছড়ার কমতি নেই— তবু সে কথা পরে।

প্রাচীন সাহিত্যে জাতি বিষয়ক যত গালাগালি আছে, তাতে কায়স্থেরা বোধ হয় সবার প্রথমে যাবে। কায়স্থের বুদ্ধিমত্তা অন্য মানুষের চোখে ধূর্ততা এবং কুচুটেমি ছাড়া কিছু নয়। একটি প্রচীন শ্লোকে বলা হয়েছে— কায়স্থেরা মায়ের

পেটে থাকা সত্ত্বেও যে মায়ের মাংস খেয়ে ফেলে না, তার কারণ এই নয় যে, কায়স্থেরা বড় করুণ-হৃদয়। আসলে গর্ভস্থ অবস্থায় তাদের দাঁত থাকে না বলেই মায়েরা বেঁচে যায়—

কায়স্থোঽপি কায়স্থো মাতুর্মাংসং ন খাদতি।
ন তত্র করুণা হেতুস্তত্র হেতুরদন্ততা।।

এই ধরনের প্রবাদ বাংলাতেও আছে, তবে হলফ করে বলতে পারি, সেটি এই প্রাচীন শ্লোকের অনুবাদমাত্র, লোকস্তরে সহজ পরম্পরায় আসা কোন প্রবাদ নয়। ছড়াটি হল— "দাঁত থাকে না বলে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না।" সহজে আসা ছড়া যদি এমন হয় যে 'কাক ধূর্ত্ত আর কায়েত ধূর্ত্ত' তাহলে বলব— কাকের সঙ্গে যুক্ত করে এক কবি কায়স্থদের প্রশংসা করছেন, আরেকজন করেছেন নিন্দা। মহাসুভাষিত সংগ্রহে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে— কাক-কুক্কুট-কায়স্থাঃ সজাতি-পরিপোষকাঃ। মানে, কাক, মুরগি এবং কায়স্থ— এরা আপন জাতের লোককে পোষণ করে। অন্যদিকে, সজাতি-পরিহন্তারঃ সিংহাঃ শ্বানো দ্বিজা গজাঃ। এক সাম্রাজ্যে দুই সিংহ থাকে না, এক পাড়ার কুকুর সহ্য করে না অন্য পাড়াতুতো কুকুরকে, এক পুরোহিত পছন্দ করেন না তাঁর যজমানের বাড়িতে অন্য পুরোহিত প্রবেশ করুক, এক দলের হাতির সঙ্গে বনিবনা হয় না অন্য কোনও হস্তি-যূথপের।

কায়স্থের সঙ্গে কাকের তুলনায় অন্যজন কিন্তু বড়ই রূঢ়। তাঁর মতে কাকের কাছ থেকে লোভ— কাকাল্লোল্যং, যমের কাছ থেকে ক্রুরতা আর স্থপতির কাছ থেকে স্থির পদার্থের ওপর আঘাত হানার শক্তি নিয়েই কায়স্থের জন্ম হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা এ সব শ্লোকের ওপর নজর দিয়েছেন কিনা জানি না, তবে এটা মনে রাখা দরকার, কায়স্থেরা ছিলেন লিপি-বিশারদ এবং হিসেব-লিখিয়ে। সেই কারণে রাজা-জমিদারের মন ভোলানোর জন্য অপকর্মও কিছু করতে হত। সপ্তম শতাব্দীর নাটক মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মহামন্ত্রী রাক্ষসের বন্ধু ছিলেন শকট দাস। প্রতিপক্ষের অনেকের মধ্যে তার নাম যখন চাণক্যের কানে উঠল, তখন তাকে উল্লেখ করা হয়েছিল 'কায়স্থ শকট দাস' বলে। অনেক কায়স্থের থেকেও কুটিলমতি কৌটিল্য অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছিলেন শকট দাসের জাতি-মাহাত্ম্য, বললেন— কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা— অর্থাৎ কায়স্থ! এ তো নগণ্য ব্যাপার, ও তাহলে বুদ্ধিতে আমার থেকে অনেক লঘু।

কিন্তু লঘু হোক আর গুরু হোক, রাজকর্মের সুবাদে, বিশেষত সে কর্ম যদি হিসাব লেখার মতো গুরুতর ব্যাপার হয়, তাহলে সাধারণের কোপ গিয়ে পড়ে তার ওপরেই। তাছাড়া মুষ্টিমেয়ের দোষও কখনও সমগ্র জাতির কলঙ্ক তৈরি করে। কাশ্মীরের কবি (১১শ শতাব্দী) ক্ষেমেন্দ্রের চোখে কায়স্থদের রূপ হল 'সেক্রেটারী' বা 'চিফ্ ক্লার্কের' মতো, যাকে তিনি বলেছেন 'দিবির'। ক্ষেমেন্দ্র কায়স্থদের দু'চোখে দেখতে পারেননি এবং তাঁর ধারণা— 'মোহ' নামে যে জিনিসটা মানুষের বুদ্ধি হরণ করে, তা আরও গূঢ় আকারে বাস করে কায়স্থদের মুখে এবং লেখায়। চন্দ্রকলার মতো ক্রম-বিবর্তিত যে শষ্য-সম্পদ— সেও যদি কায়স্থের চোখে পড়ে, তবে তা এক মুহূর্তে উবে যাবে। এরা যেন কালপুরুষ, সমস্ত লোকের উপর চাপিয়ে দিয়েছে অর্থদণ্ড। যে জিনিসের হিসেব করা উচিত নয়, সেটির হিসেব করে এবং যেটির করা উচিত, সেটির হিসেব না করে এই পিশাচেরা কাগজ উঁচিয়ে বেড়ায় এবং সমাজকে যেন দেখায়— সব লেখা আছে— গণনাগণন-পিশাচ্য শ্চরন্তি ভূর্জধ্বজা লোকে। নেহাৎ যমের পাশ গলায় বাঁধা না থাকলে, কেউ কি এই যম-মহিষের বাঁকানো শিঙের মতো কুটিল কায়স্থকে বিশ্বাস করবে? ক্ষেমেন্দ্রের মতে— কায়স্থদের কলমের মুখ দিয়ে নির্গত হয় যে মসীবিন্দু, সে যেন রাজলক্ষ্মীর কাজলকালো চোখের জল। কায়স্থ-লুণ্ঠিতা রাজলক্ষ্মী এইভাবেই কাঁদেন।

পরিষ্কার বোঝা যায়, মুষ্টিমেয় রাজকর্মচারীর স্বভাব দোষ সরলমতি মানুষের মনে ক্ষোভ জাগাত এবং তা সম্পূর্ণ জাতির গায়ে মাখিয়ে দিত নিন্দাপঙ্ক। তাদের গুণও হয়ে যেত দোষ। তাদের বিচিত্র, বঙ্কিম, অপূর্ব অক্ষর-চিত্রগুলিও তাই তুলিত হয়েছে কালসর্পের সর্পিল ভঙ্গির সঙ্গে। আর হিসাব লেখায় বিষম অংক-সংখ্যার বিন্যাস— সে যেন মায়াবনিতার আলুলায়িত চূর্ণকুন্তলের মতো বাঁকা। কে আছে জগতে যে এই আংকিক রেখাবলীর দ্বারা প্রতারিত হয়নি।

আমার কায়স্থ পাঠক-কুল! যেন একটুও বিব্রত বোধ না করেন, মনে রাখবেন, গালাগালি সব জাতের ওপর সমানভাবে বর্ষিত। কোন জাতই আরেক জাতের প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। তবে কর্ম-গুণে কিংবা কর্মদোষে নিন্দার অনুপাত হয়েছে কম আর বেশি। শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ— একশোটা রুগী মরলে তবে বৈদ্য হওয়া যায়— এর মধ্যে কোন নিন্দাই নেই। অসুখ করলে ডাক্তারের প্রয়োজন যেমন বেশি, বৈদ্যদের সম্বন্ধে নিন্দাও তেমনি ভয়-মাখানো, ঠাট্টা-মেশানো বক্রোক্তি। প্রাচীনের মতে, রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে

বিত্ত হরণ করা— আতুরাদ্ বিত্ত-হরণম্— আর রোগী মরলেই পালানো— মৃতাচ্চ প্রপলায়নম্— এই হল বৈদ্যের বৈদ্যত্ব। সবাই জানে বৈদ্য ভগবান নয়, তবে ডাক্তার বাড়িতে যাবে, পয়সা নেবে না; আবার রোগী মারা গেলে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বসে বসে কাঁদবে— এই বা কেমন আবদার! তবু এটা কোন গালাগালিই নয়, বরঞ্চ আমাদের পুরাতন সহায় ক্ষেমেন্দ্র কথঞ্চিৎ কঠিন শব্দ ব্যবহার করে অন্যদের সঙ্গে বৈদ্যদেব সমতা রেখেছেন। ক্ষেমেন্দ্র বললেন— এই অসহ্য ভিষক-বৈদ্যগুলো মরেও না। গ্রীষ্মকালে মানুষ যে অনুপাতে উগ্র এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে, ঠিক সেই অনুপাতে এবা জলের পরিবর্তে ধন শোষণ করে। একের পর এক ওষুধ পালটে, নানা যৌগে-অনুপানের ব্যবস্থা দিয়ে, নানা জিজ্ঞাসায় হাজারটা রুগী মেরে— পশ্চাদ্ বৈদ্যো ভবেৎ সিদ্ধঃ।

এরপর আসেন বৈশ্য অর্থাৎ বণিক এবং ব্যবসাদারেরা। প্রাচীন কথকঠাকুব ব্যঙ্গ করে বলেছেন— চোরের আবার ধর্ম, দুর্জনের আবার ক্ষমা, বৈশ্যের আবার স্নেহ। তা, এখন যদি ব্যবসাদারেরা সস্নেহে ব্যবসাপাতি আরম্ভ করেন তাহলে অর্থনীতি মাথায় উঠবে। ব্যবসা করব, লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা করব না, তা তো হয় না। কবি বললেন, "করুন চিন্তা, কিন্তু আমার বক্তব্যটা আপনার ব্যবসা নিয়ে নয়, আপনার 'অ্যাটিচুড্' নিয়ে। যে বণিক দোকানে আরামসে বসে আছে, তাকে যদি ক্রেতা এসে দাম শুধোয়, তাতে সে যদি কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়ার হিসেব করে পাঁচ-টাকা, কি একশো টাকা দাম বলে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই; কিন্তু যখন উত্তাল ঘূর্ণিঝড়ে আপাতাল ঘূর্ণিত হচ্ছে, হাওয়ার বেগে ডুবে যাচ্ছে নৌকো, তখনও যে ক্রয়মূল্য আর বিক্রয়মূল্যের হিসেব কষে যায়— বুঝতে হবে সেই বণিক— মজ্জত্যামপি নাবি মুঞ্চতি ন যস্তামেব মূল্যস্থিতিম্।"

ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক বিদ্রূপ নির্মল হাস্যরসাশ্রিত। সমালোচক কবির চোখে, ব্যবসায়ীরা হল কামুক পুরুষের পুরুষাঙ্গের মতো— প্রথমে নম্র, তারপর স্তব্ধ (স্বয়ং স্টার্নবার্ক-এর অনুবাদ করেছেন স্টাবর্ণ ইন্ আপ্রোচ্), কাজের সময় এবা একেবারে নিষ্ঠুর, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় নম্র— আদৌ নম্র স্ততঃ স্তব্ধঃ কার্যকালে চ নিষ্ঠুরঃ। কৃতে কার্যে পুনর্-নম্রঃ শিশ্নতুল্যো বণিগ্জনঃ।।

এই ধরনের রসিকতা আর বাড়তে দিতে চাই না। বরঞ্চ অনেকেরই ধারণা যে, কটূক্তির ব্যাপারে বামুনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আসি। কেউ যদি নারায়ণ ভট্টের বেণীসংহার নাটকটি খোলেন, তাহলে দেখবেন

সেখানে কর্ণ আর দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে কিছু বাক্য বিনিময় করছেন। কর্ণের ধারণা, প্রিয়পুত্রের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনেও দ্রোণাচার্যের অস্ত্রত্যাগ করা উচিত হয়নি। দুর্যোধন রীতিমত ব্যঙ্গ করে বললেন, "স্বভাব যায় না মলে— প্রকৃতির্দুস্ত্যজেতি— তিনি শোকের তাড়নায় ক্ষত্রিয়ের প্রতিবাদী বৃত্তি ত্যাগ করে বামুনের স্বভাবসুলভ দীনতার আশ্রয় নিয়েছেন।" কথায় কথায় এই মন্তব্যগুলি কিঞ্চিৎ পরিশীলিত হয়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার কানেও উঠল। তিনি প্রথমেই বংশ তুলে গালাগালি দেওয়া আরম্ভ করলেন কর্ণকে, কেন না সূতপুত্রের ওইখানেই ছিল দুর্বলতা। কর্ণও ছেড়ে কথা বললেন না, তিনি বললেন— 'বেটা বাচাল বামুন, বৃথাই তোদের অস্ত্র, কাজের সময় কাজে লাগে না।' কথাটা যেহেতু অশ্বত্থামার বাবার গায়েও লাগে, তাই তিনি 'রাধাগর্ভ-ভারভূত' কর্ণকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাঁ পাখানি মাটিতে ঠুকে বললেন— এই পাটা তোর মাথায় রাখলুম, পারিস তো সরা। কর্ণ বললেন— বেটা জাতিতে বামুন, তাই অবধ্য। নইলে তোর পাটা এতক্ষণ ধড় থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে লুটাত। অশ্বত্থামা বললেন, তবে রে হতভাগা, আমি জাতিতে বামুন বলে আমার বীরত্বের অপমান করছিস, এই নে আমি জাতি ত্যাগ করলুম। এই বলে অশ্বত্থামা পৈতেখানাই ছিঁড়ে ফেললেন।

তাহলে দেখুন বামুনকে বামুন বললেও সে রেগে যায়। আসল কথা হল বৃত্তি। একই বৃত্তি বংশানুক্রমে পালন করতে থাকলে, তার কতগুলো দোষ গজায়। একসময় শিষ্য-যজমানের বাড়ি থেকে দান প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল এবং দরিদ্র থাকাটাও ব্রাহ্মণের কাছে অমর্যাদাকর ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দারিদ্র্য এবং প্রতিগ্রহই ব্রাহ্মণকে অভাবে এবং স্বভাবে লোভী করে তুলল। বিভূতিভূষণের ইছামতীতে নালু পালের ঘরে লুচি-সন্দেশ খাওয়া বামুনের কীর্তি, পাঠকের স্মরণ আছে কি না জানি না; কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ বহুকাল আগে থেকেই যে এই ব্রাহ্মণদের ব্যঙ্গ করেছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, হাজারো নাটকে বিদূষকের চরিত্রটি। প্রাচীন নাটকের বিদূষক প্রায়ই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে ব্রাহ্মণকেই বিদূষক সাজানো— এ বড় কম রসিকতা ছিল না। বিদূষককে সবসময়ই দেখানো হয়েছে ঔদরিক ব্রাহ্মণ হিসেবে, যে সবসময়ই খেতে চায়। এমনকী কোনও মদনিকা কিংবা চূতলতিকা যদি তাকে কবিতার-কলি দীপদীখণ্ডের তালিম দিতে চায়, তবে সে খণ্ড মানে চিনি কিংবা মিছরিই বোঝে এবং লোভাতুর হয়ে বলে— তা, এই খণ্ড দিয়ে কি মোয়া হয়, লাড্ডু হয়— কিম্ এদিনা খণ্ডেন মোঅআ করীয়ন্তি, লড্ডুআ বা?

পাঠক কিংবা সমালোচক বলতে পারেন, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র দিয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণের বিচার করা ঠিক হবে না। আমি বলব, ব্রাহ্মণ যেদিন থেকে অযাচক-বৃত্তি ছেড়েছে, ত্যাগ এবং শুচিতার মূল্য যেদিন ব্রাহ্মণের কাছে অনর্থক হয়েছে, সেদিন থেকেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির কাছে হেয় হয়ে গেছে। বিদ্যা শিক্ষা— এসব আর সমাজের চোখে তেমন করে বড় হয়ে ওঠেনি, বেশি করে চোখে পড়েছে এইটুকুই যে, ব্রাহ্মণ অন্য জাতির দান প্রতিগ্রহ করে, অতএব সে লোভী। সবাই জানেন বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের ভালো চোখে দেখতেন না, যে কারণে ধর্মকীর্তির মতো বৌদ্ধ দার্শনিক ব্রাহ্মণদের খোঁচা দিয়ে বলেছেন— আরে এ যে দেখছি ফলারে বামুনের মতো ভোজন-দক্ষিণা চাচ্ছে? কিং পর্বব্রাহ্মণবৎ অয়ং মূল্যং মৃগয়তে?

পর্ব-ব্রাহ্মণ কোনও বিশেষ পর্বদিনে গৃহস্থের ঘরে বসে আচ্ছাসে খেয়ে আবার কেমন করে দক্ষিণা নেন— এই জিনিসটি একটু বিশদ করে দেখাবার লোভ সামলাতে পারেননি টীকাকার অর্চট। তিনি বললেন— পর্বব্রাহ্মণের কায়দাটা কেমন জানেন— এই এক একটা করে লুচি খাব, আর এক একবার করে দক্ষিণা দিতে হবে— ঘৃতপূরং ঘৃতপূরং মে দক্ষিণা প্রদাতব্যা। ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দু গ্রন্থে অর্চটের (হেতুবিন্দু টীকা) এসব কথা নবম/দশম শতাব্দীর। ব্রাহ্মণের উদর নিয়ে বাংলার প্রবাদ আছে বিস্তর, বিশেষ করে কমলাকান্ত শর্মা যেদিন থেকে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণকে পেশা হিসেবে নিয়েছে, সেদিন থেকেই জানি এই ঔদরিক ব্রাহ্মণের মূল অনেক গভীরে এবং সে কাল যদি খ্রীস্টের জন্ম-সময়ের আশে-পাশে হয় তাতেও আশ্চর্য কিছু নেই।

শোনা যায় মৃচ্ছকটিক নাটকের ভিত্তি নাকি ভাসের চারুদত্ত, তা ভাস খ্রীস্টের প্রায় সম-সাময়িকই বটে। নাটকের আরম্ভেই সূত্রধার নাটক নামাতে গিয়ে বাড়ির গিন্নিকে ডাকছে প্রতঃরাশের আশায়। গিন্নি বললেন— আজ আমার উপোস, তুমি আমাদেরই মতো একটা গরিব বামুন ধরে আন নেমন্তন্ন করে, সেই সঙ্গে তোমারও খাবার জুটবে। সূত্রধার বেরোলেন এবং চারুদত্তের বন্ধু ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে ধরে বললেন— মৈত্রেয়মশাই, আপনার নেমন্তন্ন। খাবার একেবারে রেডি— ঘি, গুড়, দই সবই আছে। তাছাড়া দক্ষিণাও মিলবে কয়েক টাকা। মৈত্রেয়মশায়ের খাবার খুব পছন্দ, অথচ ওপরে একটা ভারিক্কি দেখিয়ে বললেন— যান, যান মশাই, অন্য কাউকে ধরুন, আমি এনগেজড়্। সূত্রধার আবারও রসিয়ে রসিয়ে বললেন— দেখুন মশাই বেশ গরম গরম ঝোল,

তরকারি, চাটনি। ঘি, গুড়, দই দিয়ে ভাত। আপনাকে পরিবেশনও করা হবে পরম আদরে। খেতে পারবেন যথেষ্ট।

নাটকের কারণে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে মৈত্রেয়মশাই বড়ই পীড়িত এবং তিনি স্বগতোক্তি করে বলেছেন— ইস্ আমাকে বারবার লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বলল, তবু আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। আবার বলছে, কয়েক টাকা দক্ষিণাও দেবে। যদিও মুখে এসব প্রত্যাখ্যান করেছি, তবুও হৃদয় আমার এর পেছনেই ঘুর-ঘুর করছে— এষ বাচা প্রত্যাখ্যাতো হৃদয়ে নানুবধ্যমানো গম্যতে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই করুণ অবস্থাই চাণক্যনীতিতে প্রবাদ তৈরি করেছে— 'আমন্ত্রণোৎসবা বিপ্রাঃ।' 'তৃপ্তাস্তি ভোজনে বিপ্রাঃ'। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন-বাড়িতে কোন খাবারটি বেশ ভালো এবং বেশি খাওয়া উচিত এবং কোনটি হেয় এবং না খাওয়া উচিত— সেই সম্বন্ধে ছেলেকে উপদেশ দিতেন। আর সেই বৃদ্ধের নিজের অবস্থাটি ভারি করুণ করে বর্ণনা করেছেন আমাদের মৈত্রেয়মশাই। তিনি বললেন— আমার পেটও আমার অবস্থার ভালমন্দ বোঝে। অল্প একটু কিছু পেটে দিয়ে দাও তাতেও সন্তুষ্ট, আবার প্রচুর পরিমাণে খাবার এই পেটে ভরাতে থাক, দেখবে স্বচ্ছন্দে জায়গা করে নিয়েছে — অল্পেনাপি তুষ্যতি, বহুকম্ অপি ওদনভরং ভরিষ্যতি দীয়মানম্। আমার পেট না দিলে চায় না, দিলে ফেলে দেয় না। (ভাস, চারুদত্ত)

দিনের পর দিন খাওয়া এবং না-খাওয়ার অভ্যাসে যাঁরা পেটকে এই পরিমাণ ইলাস্টিক করে ফেলতে পারেন তাঁদের লোকে বলবেই— বামুন খাবার পেলেই নাচে। মজার ব্যাপার হল, আজকের দিনের মহা মহা সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা যে ব্রাহ্মণ-মাত্রেই ছিল সুবিধাভোগীর জাত। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ যাঁরা বিত্তশালী পরিবারে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কিছু সুবিধে নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু পরের দান-প্রতিগ্রহ করে যাদের জীবন কাটত এবং সে প্রতিগ্রহও যেহেতু নিম্নবর্ণের বাড়ি থেকে করা যেত না, সেখানে সাধারণ উদরপূর্তির জন্যই এঁদের যথেষ্ট চিন্তা করতে হত। এ-ব্যাপারে অন্তত আমি নিঃসন্দেহ। ঠিক এইজন্যই সূত্রধারের গৃহিণী সমব্যথী হয়ে এমন একজন ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করতে বলেছেন, যে তাদের মতোই গরিব। সে ধরেওছে তাই গরিব চারুদত্তের গরিব বন্ধু মৈত্রেয়মশাইকে। গুড়, দই আর ভাত— বার বার বামুনঠাকুরকে লোভাতুর করে তুলেছে, আর তারই জন্যে নবীন তপস্বিনীতে এককালের ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে শুনতে হয়েছে— ব্রাহ্মণের উদর, ছিটেবেড়ার ঘর। এমনকী তারা

যে হৃষ্টচিত্তে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে পেরেছে তাও যে ওই খাবার গুণেই নয়, তাই বা হলফ করে বলি কি করে! শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিকের বিদূষক যখন বসন্তসেনার আট মহলা বাড়িতে ঢুকেছে, তখন সপ্তম মহলে সে দেখল খাঁচার শুকপাখিও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছে। বিদূষক ব্যঙ্গ করে বলল, আরে! এ যে দেখছি দই-ভাতে পেটমোটা বামুনটির মতো বেদমন্ত্র পাঠ করছে।

সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে দইভাত আর পায়সান্ন সহযোগে জনগণের গালাগালি খেতে খেতে একসময় ব্রাহ্মণেরা হারিয়ে গেলেন, আর ঔদরিকের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেলেন কতগুলি পুরুত-মশাইকে, যিনি পূজার সময় কলা-মুলো নিয়ে, শ্রাদ্ধের সময় কাপড় আর ছাতা নিয়ে যজমানের সঙ্গে ঝগড়া করেন। মানুষ বলে— পুরুতগুলো হতচ্ছারা। মন্ত্র পড়ে ঠিক ভূতের মতো, আর চাল-কলা নিয়ে ঝগড়া করে। আমি বলি— পূজা, শ্রাদ্ধ, এসবের দরকার কি। যদি বলেন সংস্কার, তাহলে বলি, পূজা-শ্রাদ্ধ যে-সংস্কারে বিশ্বাস করতে হয়, পুরুতকেও সেই সংস্কারে বিশ্বাস করতে হয়। আর মন্ত্র! এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বিয়ে হচ্ছিল, সে পুরুতের মন্ত্র উচ্চারণ শুনে নববধূর সামনে নিজের এলেম দেখিয়ে বলল— এই কি মন্ত্র! না ভূতের তন্ত্র। এ বিয়েই তো অসিদ্ধ। পুরুত ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন— এই মন্ত্র পড়েই তোর বাপেরও বিয়ে দিয়েছি, তাহলে তোর বাপের বিয়েও অসিদ্ধ এবং ফলগতভাবে তুইও অসিদ্ধ।

তবু পুরুতমশাইদের ওপর বিরক্তি আমাদের কমেনি এবং তাদের সম্বন্ধে আমরা যা বলি তার চতুর্গুণ বলেছেন প্রাচীন মানুষেরাই। তাদের নিয়ে যে নির্মম শ্লোক বাঁধা হয়েছে তাতে অনেকেই ক্ষোভ মেটাতে পারবেন। শ্লোকটি বলে— পুরীষস্য চ রোষস্য হিংসায়াস্তস্করস্য চ। আদ্যাক্ষরাণ্যেতেবাং পুরোহিত ইতি স্মৃতঃ। অর্থাৎ পুরীষ (মানে মল)। রোষ, হিংসা এবং তস্কর— এই চারটি শব্দের আদ্যক্ষরগুলি নিয়েই পুরোহিত। শ্লোককর্তা যে শব্দগুলির কথা বলেছেন তার গুণগুলিও পুরোহিতের মধ্যে আছে বলেই না এমন একটি শ্লোক তৈরি হয়েছে, অন্তত শ্লোক-রচয়িতার তো তাই ধারণা।

সবার সম্বন্ধেই বললাম শুধু শূদ্রের কথা বললাম না। বললাম না এই জন্য যে, তাঁরা গালাগালির ওপরেই ছিলেন চিরকাল। আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়াগোড়ায় বসে, তাঁদের সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত অপভাষাগুলির পুনরুক্তি করে কী ধরনের প্রায়শ্চিত্ত করব? বরঞ্চ কঠিন কথার পরে কিঞ্চিৎ এমন প্রসঙ্গ টানা উচিত, যাতে কারও গায়েই লাগে না। যেমন ধরা যাক গুরু।

আমাদের বিদ্যাও গুরুমুখী ধর্মও গুরুমুখী, কাজেই সমাজে গুরুর প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুরুনিন্দাও তৈরি হচ্ছিল। একজন বলেছেন— হাজারো গুরু আছে, যারা শুধু শিষ্যের টাকা ঝেড়েই খালাস; এমন গুরু দেখলাম না যে শিষ্যের সন্তাপ হরণ করতে পারে— গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। তং তু গুরুং ন পশ্যামি শিষ্য-সন্তাপহারকম্।। বেশির ভাগ গুরুর সম্বন্ধে এই আক্ষেপ ভালোই খেটে যায়, তবু যাঁরা অতিবিক্ত গুরুভক্ত তাঁরা যেন আমার পরের কথাগুলি মনে না রাখেন। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র সুন্দর গুরুর মুখ দেখেননি নিশ্চয়, গুরুদের মুখগুলি তাই তাঁর কাছে— কৃষ্ণাশ্ব-শকৃদ্‌বর্ত্যা— কালো ঘোড়ার পাছার মতো। ব্যাঙের নাড়িভুঁড়ি মাখা মানুষও কেমন করে অপ্সরাদের প্রেমাস্পদ হয়ে পড়বে— এই স্বপ্ন দেখান গুরুরা। অল্প পরিচয়েই দীক্ষা দেন আর মুগ্ধচিত্ত পুরুষের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেন। কোনও কোনও গুরু আবার হাত দেখে ভাগ্যও বলেন— তোমার হাতের ধনরেখাটি তো বেশ বড়, তবে তোমার স্বামীর মন যেন একটু চঞ্চল— এই ধরনের কথা বলে, বেটা ধূর্তগুরু, কুলবধূদের কুসুমকোমল হাতগুলি বসে বসে টেপে— মৃদ্‌নাতি কুলবধূনাং কমল-কোমলং পাণিম্।

ক্ষেমেন্দ্র পর্যায়ক্রমে অনেকেরই শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন এবং হাত দেখার কথায় মনে পড়ল, জ্যোতিষীদের সম্বন্ধেও ক্ষেমেন্দ্রর ধারণাটি চমৎকার। তিনি বলেন— হতভাগা জ্যোতিষীগুলো, বসে বসে কখন গগনের চাঁদ বিশাখা নক্ষত্রের সঙ্গে সমাগম করছে, তার খবর রাখে; কিন্তু বেটা জানে না, যে তার নিজের বউই কতগুলি রসিক-কামুকের সঙ্গে উপগত হল— গণয়তি গগনে গণক শ্চন্দ্রেণ সমাগমং বিশাখায়াঃ। বিবিধ-ভুজঙ্গ-ক্রীড়াসক্তাং গৃহিণীং ন জানাতি।

রসিকতার কথা থাক। রসিকতা-মাখানো গালাগালির পর্যায়ে, ছেলে থেকে আরম্ভ করে শ্বশুরগৃহের 'দুগ্ধলুব্ধ বেড়ালে'র মতো জামাই সবাই আছে। তার থেকে যেকথা বলা হয়নি, তাই বলি। আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞামত একটা কথাই বলা হয়নি, তা হল দেশ ধরে গালাগালির কথা। একটি দেশ কিংবা প্রদেশ আরেকটি দেশ কিংবা প্রদেশ সম্বন্ধে কোনওকালে ভাল ধারণা পোষণ করেনি। এক্ষেত্রে যে মানুষ যে দেশের লোক, সেই দেশের যদি সর্বজনবিদিত কোনও দোষ থাকে, তবে অন্যজনে তা গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের সারথি হিসেবে শল্য একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে কর্ণকে বিরত করতে চাইছিলেন শল্য। অনেক উতোর-চাপানের

পরেও শল্য যখন থামলেন না, কর্ণ তখন শল্যের মাতৃভূমি মদ্রদেশের দফা রফা করে ছাড়লেন। কর্ণ বললেন— মদ্রদেশের লোক তুমি, তোমার আর কত বোধ থাকবে? বহু দেশ ঘুরে এসে এক বামুন ঠাকুর আমাকে জানিয়েছেন— কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য কোশল এসব দেশের লোকেরা সব ভাল মানুষ। আর বাহীক, মদ্রক কিংবা পঞ্চনদীর দেশটি হল একেবারে বাজে লোকের আড্ডা।

মনে রাখবেন শল্যের জন্মভূমি সম্বন্ধে কর্ণ যা খবর পেয়েছেন, তা তীর্থ পর্যটক ব্রাহ্মণের কাছে। আরেক ব্রাহ্মণও কর্ণকে সাবধান করেছেন— আরট্ট, বাহীক, মাহিষক, কলিঙ্গ কেরল— এসব দেশ সম্বন্ধেও। পরিষ্কার বোঝা যায়, দেশ সম্বন্ধে নিন্দা ছড়ায় তখনই, যখন কোন পর্যটক ব্যক্তিগত কারণে খারাপ ব্যবহার পায়। কিন্তু শোনা কথাতেই কর্ণ শল্যকে শুনিয়ে বলেছেন— ওরে মূর্খ! মদ্রদেশের লোকেরা সব ভীষণ ঝগড়াটে, মানুষের অধম আর মিথ্যেবাদী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত দুষ্কর্ম করা যায়, মদ্রকেরা সব করে। আর মদ্রদেশের মেয়েরা স্বেচ্ছায় পুরুষের সঙ্গে রতিবিলাস করে। শুধু তাই নয়, মদ খেয়ে আবার স্ট্রিপটিজ্ নাচে— বাসাংসি উৎসৃজ্য নৃত্যন্তি, স্ত্রিয়ো যা মদ্যমোহিতাঃ। তার ওপর যাদের দেশের মেয়েরা উট আর গাধার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করে— যাস্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রমেহন্তি— শল্য! তুমি হলে তাদের ছেলে। তোমাদের দেশেব মেয়েদের কাছে যদি সুবীরক, মানে, টক আমানি (এক ধরনের টকসে মদ) চাওয়া যায়, তবে তার পাছায় চাঁটি মেরে বলে— স্বামী-পুত্তুর দিয়ে দিতে পারি, টক-আমানি দেব না।

মহামতি কর্ণ কিংবা তাঁর কানে মন্ত্র দেওয়া ব্রাহ্মণটি এই স্ত্রীলোকদের কাছে টক আমানি চাখতে চেয়েছিলেন কি না জানি না, তবে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, তথাকথিত ভদ্রসমাজের বহু মানুষই অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে কারও মাতৃভূমি সম্বন্ধে এমন কথা বলেন। আমরা আরও কষ্ট পাই, কেন না খোদ বাংলাদেশের সম্বন্ধেও আমরা কম শুনিনি। খ্রীস্ট জন্মাবার আগে সশিষ্য মহাবীর জৈন নাকি বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর মতে রাঢ়দেশের লোকেরা একেবারে আচার-বিচারহীন আর বঙ্গদেশের লোকেরা অখাদ্য-কুখাদ্য— সব খায়। একেইতো মহাবীর জৈনের এমন ধারণা, তার মধ্যে আবার বাঙালিরা নাকি তাঁর পেছনে 'ছু-ছু' শব্দ করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। (আচারাঙ্গ সূত্র) আমরা আর জৈন সন্ন্যাসীদের মন ফিরে পাইনি।

আপাতত বেশি বিস্তারে যাব না, শুধু এইটুকু বলব, ভিন্‌প্রদেশের লোকেরা আমাদের কেউ ভাল চোখে দেখেননি। বাঙালিরা বেদের ক্রিয়াকলাপ জানে না, কি বেদ উচ্চারণ জানে না— এসব কঠিন কথা তো অনেক শুনেছি এবং তা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু দেখুন, ভাষা, যা মানুষের জীবনের এবং জন্মের অধিকার, সেটি নিয়ে রঙ্গ করলে বড় দুঃখ লাগে। অথচ রাজশেখর আমাদের অর্ধমাগধী প্রাকৃত শুনে ব্রহ্মার মুখসম্ভবা সরস্বতীকে পাঠিয়েছেন জগৎপিতা ব্রহ্মার কাছে এবং তাঁর আর্জি হল— পিতা! আমার দ্বারা গৌড়দেশের ভাষা চালানো সম্ভব নয়, তার চেয়ে, গৌড়ের লোকের জন্য পৃথক একটি সরস্বতীর অর্ডার দিন অথবা গৌড়ীয়রা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করুক— গৌড়স্তজতু বা গাথাম্ অন্যা বা অস্তু সরস্বতী। মনে রাখা দরকার, দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি এবং ভূগোল সম্বন্ধে রাজশেখরের জ্ঞান ছিল টনটনে; কাজেই গৌড়দেশের উচ্চারণ বলতে যে একেবারে বাঙাল দেশের উচ্চারণ বোঝাব, তার উপায় নেই, যদিও বাঙলাদেশের খানিকটা অবশ্য তখন গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজশেখরের কথার সূত্র ধরে বলতে পারি, বাঙলাদেশের লোকেরা চিরকালই তাঁদের ভাষার জন্য কথা শুনেছে; সিনেমা-বায়োস্কোপে বাঙাল-ভাষাভাষী একটি চাকরের ভূমিকা নতুন হাস্যরসের জোগান দিত। বাস্তবিক পক্ষে বাঙালদের সম্বন্ধে যদিও বা প্রাচীন সংস্কৃতে দু-একটি শ্লোক পাওয়া যায়, ঘটিদের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কোনও প্রাচীন শ্লোক আমার নজরে আসেনি। যদিও বা থাকে, তা আমার জানা নেই। ধরেই নেওয়া যায়, বাঙালদের সম্বন্ধে যে শ্লোকগুলি বানানো হয়েছে তা ঘটিদেরই বানানো। যেমন ধরুন— কখনও আশীর্বাদ নিও না পূর্ববঙ্গীয় মানুষের কাছ থেকে, কেন না তাঁরা যদি বলেন 'শতায়ু হও', তাহলে শোনাবে যেন 'হতায়ু হও'— আশীর্বাদং ন গৃহ্ণীয়াৎ পূর্ব বঙ্গ নিবাসিনম্। শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতি বাদিনাম্।। এ তো গেল সাধারণ রসিকতা। আমার এক শিক্ষকের কল্যাণে নবদ্বীপ-নিবাসী এক মহাপণ্ডিতের হাতে লেখা পুঁথি দেখতে পাই, যে পুঁথিখানি অন্তত ১৬/১৭শ শতাব্দীর। ন্যায় শাস্ত্রের বিষয় নিয়ে লেখা, সেই পুঁথির একটি পত্রে একই হাতের লেখা একটি শ্লোক ছিল। শ্লোকটির মানে হল— বাঙালরা নাকি জায়গাবিশেষে সিংহের মতো পরাক্রমশালী কিন্তু যুদ্ধ করতে গেলে একেবারে হরিণের মতো— স্থানে সিংহসমাঃ রণে মৃগসমাঃ। পালানোর ব্যাপারে বাঙালরা একেবারে শেয়াল। চেহারাটা একেবারে বাঁদরের মতো। তার ওপরে মুখের

গড়ন— একেবারেই বিড়ালবদন— রূপে মর্কটবৎ বিড়ালবদনাঃ; স্বভাবে ক্রুর, খল এবং নির্দয়; বাঙালরা খাবার জোগাড় করবে বকের মতো ধ্যান দিয়ে, তবে খেতে পেলে, যাই খেতে দাও, কাকের মতো খাবে, আর খাওয়ার ভঙ্গিটা ঠিক যেন শূয়রের মতো। স্ত্রী-পুরুষের মৈথুন কর্মে বাঙালরা ঠিক যেন ছাগল— আহারে বক-কাক-শূকর-সমাঃ ছাগোপমা মৈথুনে। কবির শেষ আক্ষেপ হল— হায় এইরকম বাঙালরাও যদি মানুষ হয় তবে প্রেতাত্মা ভূতগুলো সব কেমন হবে— বাঙ্গালা যদি মানুষা হরে হরে প্রেতাস্তদা কীদৃশাঃ।

বাঙালদের সম্বন্ধে এই নির্মম পরিহাসোক্তি শুনেও আমার তত দুঃখ হয় না, কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভু, যাঁর পাঁচশো বছর পুরে গেল এই সেদিন, তিনিও যখন বাঙালদেব নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন, তখন বুঝি— গালাগালির প্রবৃত্তি বড়ই সার্বজনীন। অনেকেই জানেন চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন অর্থের খোঁজে এবং অর্থও তিনি ভালই পেয়েছিলেন। ফিরে এসে সমস্ত কিছুর মায়ের চরণে নিবেদন করে, তিনি যখন আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল বাঙালদেব নকল কবে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে কথা বলা— "বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া। বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।।" বাঙালভাষার রকমারি টান শুনে পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষেব প্রাথমিক এই প্রতিক্রিয়া হয়তো অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর পরে যখন মহাপ্রভুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে, গুরু হিসেবে বিদ্যাদানও চলছে, তখন বাঙাল দেখলে, বিশেষত শ্রীহট্টের লোক দেখলে, মহাপ্রভুর মুখ সুড়সুড় করে উঠত— "বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া। কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া।" ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে এমন অত্যুক্তি করা শুধু পরিহাসেই শেষ হত না, অপর পক্ষের ধৈর্যেব সীমাও লঙ্ঘন করত। কদাচিৎ তাঁরাও মহাপ্রভুকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন, কেন না মহাপ্রভুর বাপ-পিতামহ শ্রীহট্টেরই লোক ছিলেন। তাই শ্রীহট্টিয়ার প্রতি প্রভুর বিদ্রূপ শুনে—

> ক্রোধে শ্রীহট্টিয়া-গণ বোলে 'অয় অয়' (হয়, হয়)।
> তুমি কোন দেশী তাহা কহতো নিশ্চয়।।
> পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
> বোল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার।।
> আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
> তবে ঢোল কর কোন যুক্তি ইথে হয়।।

শ্রীহট্টিয়ার পক্ষে, দলে টানার এই চেষ্টা সফল হয়নি। সমস্ত লোকের চৈতন্য সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের একটুও মায়া হয় না। "যত যত বোলে প্রভু প্রবোধ না মানে। নানা মত কদর্থেন সে-দেশী বচনে।। তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর। যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর।।"

চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস এসব ঘটনাকে প্রভুর 'চাপল্য' বলে উল্লেখ করেছেন। সত্যি কথা এইরকম ভাষা নকল করে অন্যকে ততক্ষণই বলে যেতে থাকুন, যতক্ষণ সে না রেগে যায় এবং শেষে আমরা বলব শুধু 'আপনি বড় চপল'। চপলই বটে, তবে একের চপলতা অন্যের মনে যদি আঘাত দেয়, তবে সেটি বোঝে সেই মানুষটি, যার মাতৃভাষা অন্যের মুখে বিকৃত হয়, ধর্ষিত হয়। তবু এ সবই সভ্যতার অঙ্গ; সভ্য মানুষ বলেই সভ্যেতর অপশব্দ প্রয়োগ করার অধিকার নেই— এমন তো নয়। একজনের জাতি, একজনের বৃত্তি, কিংবা তার দেশ অথবা তার ধর্ম— সে যত সমৃদ্ধ অথবা হীনই হোক, তবু অন্য মানুষ তাকে করুণা করেনি। সভ্যতা এবং ভব্যতার পরিসর কত বড় জানি না এবং সম্ভবত তার পরিসর অন্য কোথাও হবে, আমি শুধু এইটুকুই জানি এবং এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা, যে সভ্য মানুষের এই গালাগালির পরিসর থেকে কোনও সভ্য মানুষই বাদ যায়নি।

[এই প্রবন্ধে এমন কিছু শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে, যার রচয়িতার নাম জানা যায় না। কিছু শ্লোক পাওয়া যায় এল স্টার্নবাক সম্পাদিত মহাসুভাষিতসংগ্রহ গ্রন্থে। অন্য শ্লোকগুলি অতি প্রাচীন বৃদ্ধদের পরম্পরাক্রমে পণ্ডিতদের মুখে প্রচলিত।]

পুরাণের সমাজ

আমাকে একটু পড়িয়ে দেবেন? ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন দেবর্ষি নারদ।

সনৎকুমার বললেন— আগে কতদূর পড়াশুনো করেছ, কি কি পড়েছ, সব বলে যাও। তারপর আমি বলব— ততস্ত ঊর্ধ্বং বক্ষ্যামি। বাধ্য ছেলের মতো নারদ কর গুনে গুনে বললেন— আমি ঋগ্বেদ পড়েছি, যজুর্বেদ পড়েছি, সামবেদ, অথর্ববেদ— তাও পড়েছি। পড়েছি জনসমাজে পঞ্চম বেদ বলে স্বীকৃত ইতিহাস এবং পুরাণ— ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমম্।

নারদ এর পরে ভূতবিদ্যা থেকে আরম্ভ করে তিনি যে নাচা-গানা পর্যন্ত সব জানেন, সেটাও বললেন। এ সংলাপটা ছান্দোগ্য উপনিষদের, পণ্ডিতের কূটবিচারে যে লেখা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম/অষ্টম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। আমাদের বক্তব্য খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম

শতাব্দীতেই তাহলে ইতিহাস-পুরাণের একটা ধারণা ছিল। পণ্ডিতেরা ছান্দোগ্যের ভাষা-টাসা দেখে, ওটাকে আর টেনেটুনে খ্রিস্টজন্মের লাগোয়া কোন শতাব্দীতে ফেলতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা ছাড়বার পাত্র নন। তাঁরা বললেন— তোমরা যেমনটি মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ দেখছ— এমনটি মোটেও ছিল না ছান্দোগ্যের যুগে। হ্যাঁ এ কথাটা আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ পুরাণ-লিখিয়েরাই স্বীকার করেছেন যে, বহুকাল আগে পুরাণ ছিল একটি এবং সেই পুরাণে শ্লোক ছিল নাকি এক কোটি।

পুরাণকারেরা সবাই আমাদের পিতামহের মতো। একেবারে কলিকালের শিশুদের কাছে পুরনো গল্প বলার সময় পুরাণ-পিতামহেরা যে একটু বাড়িয়ে বলবেন, তাতে হয়েছেটা কি? গবেষকদের এই এক দোষ, তাঁরা পিতামহ-মাতামহদের মন বোঝেন না, গল্প বলার রসও বোঝেন না। আরে, নাতির নাতি পুতি সেদিনের কলিকালের ছেলে পরীক্ষিতের কাছে নিজের কালের গল্পো বলার সময়, সম্পর্কে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কি একটুও বসিয়ে বলবেন না? আমাদের ঠাকুরদাদারা পর্যন্ত নেমন্তন্ন বাড়িতে ভুরি-ভোজনের পর তেত্রিশটি রসগোল্লা খেলে, বলতেন— তিয়াত্তরটা খেয়েছি। আর যদি ঘটনাক্রমে তিয়াত্তরটাই খেয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বলতেন— একশ তিয়াত্তরটা খেয়েছি। আসলে কৃতিত্বের কথায়, ভয় দেখানোর কথায় অথবা নিদেনপক্ষে নোংরা কথায়, পরচর্চায় অতিকথন এবং অতিরঞ্জন এসেই যায়। এটা দোষ নয়, গল্প বলার মজা। কিন্তু এই বাড়িয়ে বলার মধ্যেও সত্য কথাটা ঠিক লুকিয়ে আছে, ঠিক যেমন আমাদের ঠাকুরদাদার গল্পে এ কথাটা অবশ্যই বোঝা যাবে যে, তিনি বেশি খেতে পারতেন। অপিচ অন্যের, পরের দশজন ঠাকুরদাদার জবান শুনলে বোঝা যাবে যে, তাঁদের যুগে খাবার প্রাচুর্য ছিল। সমাজতাত্ত্বিকের টিপ্পনীটা পড়ে ঠিক এইখানেই। কাজেই পুরাণ যখন বলবে যে, অলক রাজা ছেষট্টি হাজার বছর কিংবা কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন, তখন অতিকথনের অংশ ছেড়ে দিয়ে নিদেনপক্ষে ছেষট্টি বছর কি পঁচাশি বছরও রাজত্বকাল বুঝব না; বুঝব তাঁরা অনেককাল ধরে রাজত্ব করেছিলেন। ঠিক একইভাবে পুরাণ যখন বলবে যে, শূদ্র বেদ পড়লে তার মুখে গরম তেল ঢেলে দিতে হবে, কিংবা শূদ্র ব্রাহ্মণের মতো বড় বড় বাণী দিলে তাকে মেরে ফেলতে হবে, তখন বুঝতে হবে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণ

সমাজের 'অ্যাটিচুড'টা মোটেই ভাল ছিল না। গবেষক যদি স্ত্রী-শূদ্রের ওপর সমস্ত শাস্তির বিধানগুলি একত্রিত করে প্রমাণ দিয়ে বলেন— আক্ষরিক অর্থে এই অত্যাচারগুলি হতো, তাহলে আমি বলব পুরাণের অন্যান্য কথাগুলিও আক্ষরিক অর্থে ধরা উচিত। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। আমরা তাই পিতামহ-সমান পুরাণকারদের গল্প থেকে, হাজারো অতিকথন থেকে তাঁদের কালের স্বাদ-গন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করব। তবু যদি আমাদের কথাতেও অতিবাদ এসে যায়, তবে বুঝবেন পুরাণের রস পরিবেশনের জন্যই সেই অতিবাদ ইচ্ছাকৃত।

আসলে পুরাণে সব আছে। আপনি পুত্রের জন্য, কি নিজের বিয়ের জন্য মেয়ে পছন্দ করতে চান, পুরাণের ঠাকুরদাদা পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন কেমন মেয়ে আপনার পছন্দ করা উচিত। আপনি বাজার থেকে শাড়ি কিনে এনেছেন, কিন্তু দু-দিন গেলেই আপনার মনে হল— শাড়িটা ঠিক পছন্দসই নয়, কিংবা পরলে বেমানান হবে। আপনি শাড়ি পাল্টাবেন। শাড়ি কেনার পর আপনার যে এই দ্বন্দ্ব— একে পুরাণকার বললেন— 'অনুশয়'— অনুতাপ। তা এখনকার গড়িয়াহাটের দোকানদার আপনার শাটিকা-তপ্ত হৃদয় শান্ত করার জন্য সাত দিনের মধ্যে শাড়ি পাল্টাবার অনুমতি দেবেন। কিন্তু পুবাণকার আপনাকে আরও তিন দিন বাড়িয়ে দশ দিন সময় দিতেন। কিন্তু দশ দিনের পরে গেলে পুরাণের দোকানদার মুচকি হেসে বলতেন— এখন আর পাল্টাপাল্টি হবে না, কেননা নিয়ম আছে— পরেণ তু দশাহস্য নাদদ্যান্নৈব দাপয়েৎ। আবার ধরুন— আপনি বাড়িতে কাজের মেয়ে ঠিক করলেন। সে 'কাল থেকে নাগব' বলে, এল না। রাত্রে রাখা বাসন আপনাকেই মাজতে হল। এ রকম হলে পুরাণের কালে আপনি কাজের মেয়েকে 'আট কৃষ্ণল' (মুদ্রামান) 'ফাইন' করতে পাবতেন। আর যদি কাজের মেয়েকে দু মাসের জন্যে রেখে, তাকে যদি দু দিনেই আপনি তাড়িয়ে দেন, তাহলে সেকালে আপনাকেও সমপরিমাণ খেসারতি গুনতে হতো রাজার ঘরে। পাঠক! আপনি যদি স্ত্রীলোক হন, তাহলে পুরাণের কালে অবশ্যই রান্নাবান্না, টাকাপয়সার হিসেব রাখতে হতো আপনাকে, কিংবা সামলাতে হতো ঘর-গেরস্থালি। ঠিক আছে, কিন্তু আপনি ধরুন, ট্রামে-বাসে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন এবং একটি লীলাময় পুরুষ এসে আপনার গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে ইতিকর্তব্য পালন করতে আরম্ভ করল। এক্ষেত্রে

আজকের দিনে অসন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া আপনার কিছুই করার নেই। কিন্তু এ যদি পুরাণ-প্রভুদের দিন হতো, তাহলে যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে স্ত্রীলোকের কোমরে হাতের ছোঁয়া লাগাত কিংবা স্পর্শ করত উত্তমাঙ্গের আবরণ, জঘনদেশ, কিংবা শুধুই চুল, অথবা বারণ করা সত্ত্বেও যে পুরুষ যেখানে-সেখানে আলাপ করতে চাইত মেয়েদের সঙ্গে— এই পুরুষদের তখনকার আন্দাজে দুশ পণ করে দণ্ড দেওয়া হতো।

হ্যাঁ, এসব সাধারণ টুকিটাকি কিংবা চমকপ্রদ খবর তো পুরাণে পুরাণে হাজার হাজার আছে। সেগুলি সব আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কিছু সামাজিক ব্যবহার আমাদের জেনে নিতে হবে বিভিন্ন পুরাণের ব্যাসেদের ধরে ধরে। অনেক পণ্ডিত বলেন— ব্যাস একটি নয়, ব্যাস অনেকগুলি। আমরা বলি— এটা আর নতুন কথা কি। এ তো পুরাণকারেরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। বিষ্ণুপুরাণের কথক-ঠাকুর পরাশর মুনিই তো অন্তত আটাশ জন ব্যাসের নাম বলে দিয়েছেন। এমনকী তার মধ্যে রামায়ণের কবি বাল্মীকিও নাকি একজন ব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সারথি-জাতের এক শিষ্য ছিল, যাঁর নাম রোমহর্ষণ। রোমহর্ষণ— কেননা, তাঁর গপ্পো বলার ঢঙই এমন যে, শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে— লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর এই লোমহর্ষক কথকতার এতই নাম ছিল যে তিনি ব্যাসের শেখানো মূল পুরাণকথায় নতুন একটি রূপ দিয়ে তার একটা আধুনিকগন্ধী নাম রেখেছিলেন— 'রোমহর্ষণিকা', ঠিক যেমন চয়নিকা, সঞ্চয়িতা। রোমহর্ষণের তিন শিষ্য অকৃতব্রণ, সাবর্ণি আর সাংশপায়ন। এঁরা আবার তাঁদের গুরুর লেখা ভিত্তি করে নিজেরা এক একটি করে পুরাণ রচনা করেন। এই তিন শিষ্যের পুরাণ এবং রোমহর্ষণিকা— এইগুলি থেকেই পরবর্তীকালে আরও আরও পুরাণ লেখা হতে থাকে। এঁরা সবাই ব্যাস, কিন্তু এক এক পুরাণ যেহেতু এক এক সময়ে বিভিন্ন ব্যাসেদের হাতে তৈরি, পুরাণ সমাজের কথাও তাই কোনও এক সময়ের কথা নয়। পুরাণের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের দেবতা-বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন সামাজিক রীতি, ভিন্ন আচার, ভিন্ন বেশবাস এবং ততোধিক ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস। আমরা মধুকরবৃত্তিতে একটু একটু করে সে সব কথা বলব, যদিও আমাদের বাচনভঙ্গিতে লোম খাড়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা একেবারেই কম।

প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। পুরাণকথায় আপনারা যে দেবতার পরিচয় পাবেন, তাঁদের ব্যবহার কিন্তু মানুষের মতোই। মানুষের মতোই তাঁদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ— সবই আছে। মানুষ যেমন বুড়ো হলে নিজের মৃত্যু-চিন্তায় অবসন্ন হয়, বায়ুপুরাণ লিখেছে, তেমনি দেবতারাও কালবশে নিজেদের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তির কথা জেনে কাতর হন— অবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ বুধ্বা পর্যায়মাত্মনঃ। এমনকী আমরা যেমন কাজকর্ম করি, কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, পুরাণের দেবতারাও তাই। পুরাণের দেবতাদের অবস্থা দেখে পরবর্তীকালের এক কবি তো হেসেই কুটিকুটি। তিনি বলেছেন— এই ব্রহ্মাটা ঠিক কুমোরের মতো। কুমোর যেমন ঘটের মাথা-মুণ্ডু জোড়া দিতে সদা ব্যস্ত, তেমনি ব্রহ্মাও এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডটাকে নিয়ে কুমোরের কাজ করে চলেছেন। আবার এই যে বিষ্ণু! আমাদের সমাজে, পরিবারে যেমন বিপদে পড়লেই বড় মানুষকে মাথা গলাতে হয় সঙ্কটমোচন করতে, তেমনি বিষ্ণুকে বার বার দশ অবতার সেজে কী সঙ্কটেই না পরতে হয়েছে মাঝে মাঝে— বিষ্ণু র্যেন দশাবতারগহনে ক্ষিপ্তঃ সদা সঙ্কটে। কবির ধারণা— এ সব কিছুই ঘটছে কর্মের ফেরে, নইলে রুদ্র শিবকে প্রতিদিন ভিক্ষের বাটি হাতে করে ভিক্ষে করতে বেরোতে হয়, নাকি দিনের পর দিন কামাই না দিয়ে সূর্যকে ওঠা-নামা করতে হয়! কাজেই নমস্কার যদি করতে হয়, তো দেবতাকে নয়, নমস্কার সেই কর্মকে যার জন্য দেবতাদেরও এত শাস্তি— তস্মৈ নমঃ কর্মণে।

দেবতাদের সম্মানার্থে পুরাণকারেরা পৃথিবীতে তাঁদের বাসস্থান নির্ণয় করতে পারেননি; করেছেন স্বর্গ নামক এক কাল্পনিক লোকে। কিন্তু স্বর্গবাসী দেবতাদেরও ইহকালের সময় ফুরালে পরলোকের চিন্তা এবং বিষাদ— দুই-ই তাঁদের পেয়ে বসে— ইত্যোৎসুক্যবিষাদেন। অন্য দিকে এতকাল যেখানে ছিলেন তার জন্যেও তাঁদের মায়া হয়, মনে মনে— ইহস্থানাভিমানিনঃ। এই রকম চিন্তা-বিষাদগ্রস্ত যে দেবতারা, তাঁদের যে চেহারাও হবে ঠিক মানুষেরই আদলে, তাতে আশ্চর্য কি। মানুষের না-দেখা দেবতার রূপ-কল্পনায় চার হাত, কি সহস্রবাহু যতই লাগুক না কেন, পুরাণকারেরা বেশ জানতেন দেবতার চেহারা মানুষের মতোই। বায়ুপুরাণ তাই পরিষ্কার জানিয়েছে— দেবতাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর সংস্থান— সব মানুষের মতো। ঋষিদের তত্ত্ববোধ এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই রকমই— মানুষস্য শরীরস্য সন্নিবেশস্তু যাদৃশঃ। তল্লক্ষণং তু দেবানাং দৃশ্যতে

তত্ত্বদর্শনাৎ।। তাহলে দেবতায় আর মানুষে তফাত কি রইল? তফাত আছে, দেবতাদের বুদ্ধি বেশি, মানুষের বুদ্ধি কম— বুদ্ধ্যাতিশয়যুক্তত্বঞ্চ দেবানাং কায়মুচ্যতে। সত্যি কথা বলতে কি, বুদ্ধি আর ক্ষমতার জোরেই মানুষ দেবতা হয়ে যায়। আধুনিক সমাজে যাঁদের বুদ্ধি বেশি, ক্ষমতা বেশি, তাঁরাই যেমন সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তেমনি সেকালের সমাজেও যাঁদের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি বেশি ছিল, তাঁরাই দেবতা হয়ে গেছেন। ভাল করবার ক্ষমতা যেমন তাঁদের বেশি, মন্দ করবার ক্ষমতাও তেমনি।

আচ্ছা, মনুষ্য-ব্যবহারের বিচারে আমরা যদি দেবতাদের উত্তমোত্তম মানুষ বলি, তাহলে ক্ষতি কি! এখনও সমাজে উত্তমোত্তম তাঁরাই, যাঁরা সাধারণের ভাগ্য বিধান করেন কিংবা যাঁদের হাতে দণ্ড। পৌরাণিক দৃষ্টিতে আধুনিক প্রলেপ দিয়ে আমরা কি দেবতাদের রাজা বলতে পারি? বৈদিক ঋষিরা তো অনেককেই রাজা বলেছেন। আরও একটা জিনিস পুরাণ-ইতিহাসে লক্ষ করার মতো। সেটি হল, স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর রাজাদের যে দারুণ যোগাযোগ ছিল। মনুষ্যলোকে যখনই কোনও শক্তিশালী রাজা অসুবিধেয় পড়েছেন, দেবতারা অনেকেই তখন নেমে এসেছেন যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত ভূমিতে, তাঁরই সাহায্যকল্পে। দেবতাদের রাজার প্রতীক ইন্দ্রকেই তো কতবার দেখা গেছে, মনুষ্য রাজার ধ্বজ-পতাকার অন্তরালে। মর্ত্যলোকে গুণী রাজার উপাধিই তো ইন্দ্র-রাজেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র। আবার উল্টোদিকে, স্বর্গের দেবতারা যখন শত্রুপক্ষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না, তখনই দেখি মানুষ রাজা ছুটছেন স্বর্গের দিকে, স্বয়ং দেবরাজের রথ আসছে তাঁকে নিতে। দশরথ স্বর্গে গেছেন যুদ্ধ করতে, মুচুকুন্দ গেছেন, খট্বাঙ্গ গেছেন, দুষ্যন্ত গেছেন। আরও কত রাজা স্বর্গক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের পর দেবস্থানের ধন্যধ্বনি শুনতে শুনতে স্বর্গের মন্দারমঞ্জরী এনে গুঁজে দিয়েছেন রাজ-রানির খোঁপায়। আবার দেখুন, যখনই পুরাণকাহিনিতে বিষ্ণুর অবতার নেমে এসেছেন ভুঁয়ে, তখনই তাঁর সাহায্যকল্পে স্বর্গের দেবতারা এসে জন্মেছেন মনুষ্যলোকে রাজরানিদের গর্ভে। মনে রাখা দরকার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজরানির গর্ভে, ঋষিপত্নীর গর্ভে নয়।

কি পশ্চিমী পুরাণকাহিনির মধ্যে, কি প্রাচ্য পুরাণকথায় এটা প্রায় দেবলোকের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে যে, তাঁরা মনুষ্য রমণীর গর্ভ উৎপাদনে বড়োই দক্ষ। আমাদের ঘরের দেবতারাও সোজাসুজি এসে মনুষ্য রমণীর গর্ভাধান

করেছেন নির্দ্বিধায়। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কর্ণের কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতবর্ষের বানরীও বাদ যায়নি দেবতার রতিগ্রাস থেকে, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাও বানর ঘরের রানি। পুরাণে, ইতিহাসে আবার এ-ও দেখা যাবে যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ— এই সমস্ত শক্তিশালী দেবতার অংশেই রাজার জন্ম। যে কোন রাজাই তাই। আমরা তাই পৌরাণিক দেবতাদের যেমন রাজার জাত বলব, তেমনি মর্ত্যভূমির রাজাদেরও দেবতার জাত বলব। তাহলে আমাদের আগেকার সিদ্ধান্তটা একটু ঘষামাজা করে দেবতা এবং রাজাদেরই আমরা উত্তমোত্তম মানুষ বলব। উত্তমোত্তম এইজন্যে যে, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নিরিখে মুনি-ঋষিদের 'উত্তম' উপাধি দিতেই হবে। মধ্যম বলব সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের— যাঁরা সমাজের সাধারণ সুবিধেগুলি সব সময়ই পেতেন এবং যাঁদের একাংশ সাধনা, তপস্যার মাধ্যমে ঋষি মুনির পর্যায়ে চলে যেতেন এবং অন্যাংশ ক্ষমতা এবং বুদ্ধির জোরে রাজপদবি লাভ করতেন। আর সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ যে 'পাবলিক', তারা যেমন গণতন্ত্রের যুগেও কার্যত অধম অবস্থায় আছে, পৌরাণিক রাজতন্ত্রের যুগেও তাই ছিল। কাজেই 'পাবলিক'-কে অধম বলতে কোনও অসুবিধে নেই।

এ-কথা অবশ্য মানতেই হবে পৌরাণিকেরা আমাদের মতো কুটিল ছিলেন না। এখনকার দিনে সমাজের অধম সাধারণ মানুষকে মৌখিকভাবে গণতান্ত্রিক মূল্য দিয়ে মনে মনে তাদের পাঁঠা ভাবা হয়, পুরাণের যুগে কিন্তু এমন ছিল না। যাদের তাঁরা অধম ভাবতেন, তাদের তাঁরা সামনাসামনিই অধম বলতেন। শূদ্রদের তাঁরা অধম ভাবতেন এবং সামনাসামনিই অধম বলতেন। স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না, ত্যাগ কর তাকে। আবার যাকে পছন্দ হল, তার সঙ্গফল অবধারিত রতিক্রিয়া। এই সোজাসুজি দৃষ্টি থাকার ফলে তাঁরা এ-ও বুঝেছিলেন যে, সমাজের উচ্চকোটির মানুষ যাঁরা, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষমতা এবং মানসিক বলের সঙ্গে দোষও কিছু থাকে। এই সহজ কথাটা সহজে বুঝেছিলেন বলেই পৌরাণিকেরা দেবতা, মুনি কিংবা রাজাদেরও চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাতে লজ্জাবোধ করেননি।

প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই যে বিষয়টি আরম্ভ-সর্গগুলি অধিকার করে আছে, তা হল সৃষ্টি। আমরা জানি যে-কোন সৃষ্টির মূলে আছে কাম। পণ্ডিতের ভাষায় biological motivating force; মৎস্যপুরাণ জানিয়েছে— ব্রহ্মা যখন

বেদাভ্যাসে রত ছিলেন, সেই অবস্থায় তাঁর দশটি মানস পুত্র জন্মায়। এঁরা সবাই মাতৃহীন, অযোনিজ এবং স্থিতধী মুনি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মজা হল, এই সম্ভ্রান্ত মুনিকুল সৃষ্টির পরেই ব্রহ্মা তাঁর বুক থেকে ধর্ম সৃষ্টি করলেন, হৃদয় থেকে কাম এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে লোভ, মোহ, অহঙ্কার। তার মানে কি সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জীবনে ধর্ম যেমন প্রয়োজন, কামও তেমন প্রয়োজন। সময় বিশেষে লোভ, মোহ, অহঙ্কারও যে জীবনের শক্তি জোগায় এটা বোঝানোর জন্যই বোধহয় এরা ব্রহ্মার পুত্র বলে স্বীকৃত। পৌরাণিক বলেছেন এই পুত্রগুলির সঙ্গে একটি কন্যাও আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই কন্যা জন্মের প্রসঙ্গেই পৌরাণিকেরা এমন একটি জীবন-সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন, যা তাঁরা চিরকাল প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন।

প্রজা সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা নাকি চতুর্বেদের সার সাবিত্রী-মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করে জপে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর পবিত্র দেহ ভেদ করে অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক স্ত্রী জন্মাল। অর্ধেক মানে এই নয় যে, এরা একটি পুরুষেরও অর্ধেক কিংবা একটি নারীরও অর্ধেক। স্বরূপত, যে কোনও একটি পুরুষ কিংবা যে কোনও একটি নারী সৃষ্টি রহস্যের অর্ধাংশমাত্র। এরা মিলিত হলে তবেই না সম্পূর্ণ মানুষটা। আমার বক্তব্য কিন্তু এখানে নয়। পৌরাণিকেরা বলেছিলেন— ব্রহ্মার ভাবটা ছিল যেন, সব তাঁর মন থেকেই তৈরি হচ্ছে— মানসপুত্র— তার মধ্যে কামগন্ধের ছিটেফোঁটাও নেই যেন। তাঁর শরীর ভেদ করে এইমাত্র যে কন্যাটি জন্মাল, তাঁকে তিনি 'আত্মজা' বলে ডেকেছেন, তাঁর নামকরণ করেছেন সাবিত্রী বলে, সরস্বতী বলে, শতরূপা বলে। ঠিক যেমন সুন্দরী রমণীকে প্রথম দেখে আমরা ভাবি— এ আমার হৃদয়ের ধন, মানসরূপিণী, এর সঙ্গে আমার কাম-সম্বন্ধ নেই কোনও; সোচ্ছ্বাসে তার নামকরণ করি প্রিয়া বলে, প্রণয়িনী বলে, মানসী বলে। কিন্তু হঠাৎ করে হৃদয়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে কীট আর ঠিক ব্রহ্মার মতোই তখন বলে উঠি— আহা কি রূপ, কি রূপ— অহো রূপম্ অহো রূপমিতি চাহ প্রজাপতিঃ। কন্যার রূপ দেখে বিভু ব্রহ্মা কামনায় পীড়িত হলেন।

ব্রহ্মার মন থেকে আগে যে সব মুনিরা জন্মেছিলেন সেই বশিষ্ঠ প্রমুখ মানসপুত্রেরা পিতার অঙ্গজাত কন্যাকে 'বোন, বোন' বলে ডাকতে থাকলেন। কিন্তু ব্রহ্মা খালি কন্যার মুখটি দেখেন আর বলেন— 'অহো রূপম্ অহো

রূপম্'। প্রণাম-নম্রা সেই কন্যা ব্রহ্মার চারদিকে ঘুরে প্রদক্ষিণ করল, কিন্তু ব্রহ্মার কেবলই ইচ্ছে হতে লাগল নারীরূপ দেখার। লজ্জা! লজ্জা! মানসজাত পুত্রদের সামনে এ কি হল, লজ্জা— পুত্রেভ্যো লজ্জিতস্য— অতএব ব্রহ্মার তপোরুক্ষ মাথার দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয় একটি হলদে রঙের মুখ বেরোল— ভাল করে রূপ দেখার জন্য। পশ্চিম দিক থেকে যে মুখটি বেরোল, সেটি তো কন্যার রূপ দেখে বিস্ময়ে স্ফুরিতাধর। বাঁদিক থেকে চতুর্থ মুখ যেটি বেরোল, সেটি একেবারে 'কামশরাতুরম্'। ঠিক এমন অবস্থাতেও আরও একটি মুখ দেখা গেল ব্রহ্মার এবং সেটিও নাকি তাঁর কামাতুর অবস্থার জন্যই। কথাটা কেমন হল? একটি কামাতুর মুখ, আবার কামাতুরতার জন্য আরও একটি। আসলে মানুষ রূপ দেখে, বিস্মিত হয়, কামনাও জাগে। কিন্তু কামনা জাগার পরে মানুষের যে মুখটি প্রকট হয়ে ওঠে, সে মুখটি তো আর মানুষের মতো থাকে না। কাজেই ব্রহ্মার কামদিগ্ধ মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও একটি মুখ— যার লজ্জা নেই, ভাবনা নেই, শুধুই সে নগ্নতার কুতূহলী— আলোকন-কুতূহলাৎ। সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করার জন্য ব্রহ্মার এতদিনের তপস্যা নিজের কন্যার সম্ভোগ বাসনায় সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে গেল। ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্রদের প্রজা সৃষ্টির আজ্ঞা দিয়ে নিজে শতরূপাকে বিয়েই করে ফেললেন। তারপর! তারপর কমলকলির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। শতরূপার সঙ্গে একশ বছর কেটে গেল— সলজ্জাং চকমে দেবঃ কমলোদরমন্দিরে।

এই গল্পটার মধ্যে নাকি রূপক আছে। চতুরানন ব্রহ্মার চারটে মুখ থেকে চতুর্বেদের জন্ম। বেদসার গায়ত্রী অথবা সাবিত্রী তাই ব্রহ্মার অঙ্গজা। বেদের সঙ্গে গায়ত্রীর সম্পর্ক মিথুনের মতো, বেদস্বরূপ ব্রহ্মার সঙ্গেও তাই— বিরিঞ্চি র্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী। কিন্তু ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর রূপকের সম্পর্ক যাই হোক আমরা শুধু পৌরাণিকের বাস্তব দৃষ্টিটুকু বোঝাতে চাই। কামনার সূত্রই যে জীবনের প্রথম ইন্ধন— এ কথাটা পিতামহের ব্যবহারে প্রমাণ করে দিয়েই পৌরাণিক যেন আধুনিক উপন্যাস সমালোচনার প্রথম কথাটি বললেন। তাঁদের এই বাস্তববোধ ছিল যে, সংঘাত ছাড়া, 'টেনশন' ছাড়া মানুষের জীবন চলে না। এ বোধ যে কত বড় বোধ তা বলে বোঝাতে পারব না। ব্রহ্মার আদেশমতো তাঁর মানসপুত্রেরা যখন জরা-মরণ-হীন সিদ্ধদের জন্ম দিচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা বললেন— দেখ বাপু! এই জরা-মৃত্যুবর্জিত কতকগুলি স্থাণু সৃষ্টির মধ্যে কোনও

রহস্য নেই— নৈবংবিধা ভবেৎ সৃষ্টি জরামরণবর্জিতা। জীবনের মধ্যে শুধু নিরঙ্কুশ শুভই থাকবে— তাহলে জীবনের কোনও অর্থ থাকে না। শুভের সঙ্গে অশুভের সংঘাত হবে বার বার, তবেই না সৃষ্টির মজা— শুভাশুভাত্মিকা যা তু সৈব সৃষ্টিঃ প্রশস্যতে। এই শুভ এবং অশুভের গতি অনুসারেই পৌরাণিক সমাজ-জীবনের ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে। দেবতা, ঋষি, রাজা এবং সাধারণ মানুষ— সকলের জীবনেই কাজ করছে এই শুভাশুভের সংঘাত।

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, এখনকার সমাজের সূক্ষ্ম অনুভূতির নিরিখে পৌরাণিক সমাজের নীতি-নিয়ম বিচার করা যায় না। কারণ তখনকার সমাজ ছিল শিথিল, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাও নির্ভর করত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ওপর, ইচ্ছার তীব্রতার ওপর। ধরুন আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, আপনি ঘুমোনোর আগেই সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, আপনি সরস চুম্বন করলে সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চুম্বিত স্থানটি পুছে দেয়— চুম্বিতা মার্ষ্টি বদনং, আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলে এমন ভাব করে, যেন পাড়ার মুদি মিন্‌সে আসছে— এ রকম বউকে আপনি কি করবেন? আজকের দিনের সামাজিক নীতিবোধে আপনি তো তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনি তাকে অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু একেবারে ফেলে দিতে পারেন না, দায়িত্বও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই রকম স্ত্রীর ব্যাপারে আপনি যদি পুরাণজ্ঞ ঋষির পরামর্শ চান, তিনি সহজভাবে বলবেন— ওটাকে বাদ দিয়ে আর একটা বিয়ে কর বৎস, যে তোমাকে ভালবাসবে— তাং ত্যক্তা সানুরাগাং স্ত্রিয়ং ভজেৎ। পুরাণের কালে সেই সানুরাগা রমণীটি স্বামীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করত জানেন? স্বামীকে দেখামাত্রই সে খুশি-খুশি হয়ে উঠতে, কিন্তু স্বামী তার দিকে সানুরাগে তাকালেই তার মুখে ফুটে উঠত লজ্জা-লজ্জা ভাব— দৃষ্টেব হৃষ্টা ভবতি বীক্ষিতে চ পরাঙ্মুখী। লজ্জা-লজ্জা ভাব থাকলেও সে রমণী কিন্তু ফাল্লুক-ফুলুক করে তাকাবে। ওদিকে বুকের আঁচল সরে গেলে একটু-আধটু খুলেও রাখবে আবার কুৎসিত দেখা গেলে গোপন অঙ্গ ঢাকা দেবে। স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে বাচ্চা ছেলের গালে চুমো খাবে— তদ্দর্শনে চ কুরুতে বালালিঙ্গনচুম্বনম্। এই ছেলেখেলার ফলাফলে উত্তেজিত স্বামী যদি সেই রমণীকে একবার স্পর্শ করে, তাহলেই তিনি পুলকে, আবেগে একেবারে ভেঙে ভেঙে পড়বেন— স্পৃষ্টা পুলকিতৈরঙ্গৈঃ স্বেদেনৈব চ ভজ্যতে।

পুরাণের এই বর্ণনা মিলিয়ে সেই মনোহরা রমণীটি আপনি পাবেন না, যদি বা পান দেখবেন বিয়ে করার উপায় নেই তাকে। কিন্তু পৌরাণিককালে আপনার স্ত্রী বর্তমান থাকতেও পুরাণের সুলক্ষণা রমণীটিকে আপনি ঘরে আনতে পারতেন। কারণ, আগেই বলেছি, নীতি-নিয়মের বোধটা ছিল অন্য রকম। পুরাণের ঋষিরা অবশ্য তাঁদের কালের সমস্ত দুষ্কর্ম কিংবা অন্যায়গুলির দায় চাপিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যৎকালের ওপর। ঠিক এই কারণেই প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন পুরাণেই কলিকালে কি ঘটবে তার একটা বর্ণনা আছে। অথচ কলিকালে যা ঘটবে বা যা এখন ঘটছে, তার অনেক কিছুই ঘটত সেই দেবতা, ঋষি বা রাজাদের যুগে। পৌরাণিকেরা একদিকে তত্ত্বগতভাবে এক আদর্শ সমাজের কথা বলছেন, অন্য দিকে আখ্যান এবং উপাখ্যানের মাধ্যমে তাঁরা যা জানাচ্ছেন তাতে ফুটে উঠছে আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা। বিভিন্ন উপাখ্যানের সঙ্গে তাদের উপদেশের মিল থাকছে না। বস্তুত পৌরাণিক ঋষিদের যুগে যা ঘটছিল এবং যা তাঁরা ঘটুক বলে চাইছিলেন না, তারই ছায়া পড়েছে তাঁদের কলিকালের ভবিষ্যৎবাণীতে। অনীপ্সিত এই কলিযুগ আসলে তাঁদেরই কালের ক্রটিবিচ্যুতির প্রতিবিম্ব। পৌরাণিক যুগের কথা বলতে গিয়ে পুরাণ বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা তাই লিখেছেন— The Puranic chapters on the Kali age are the records of the state of society during the period with which we are concerned here. প্রধান তথা পুরনো পুরাণগুলির মধ্যে বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, কূর্ম, ব্রহ্মাণ্ড এবং ভাগবত পুরাণের মধ্যে কলিকালের ধর্ম, আচার, আচরণ ব্যাখ্যা করা আছে। ভারত ইতিহাসের অন্যান্য পুঁজি এবং উপাদানগুলি নিপুণভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব সমাজের যে ছন্দোভঙ্গ এই কলিধর্মে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অনেকটাই পৌরাণিক সমাজের প্রতিচ্ছবি। পৌরাণিক সমাজের টুকিটাকি জোগাড় করতে গেলে এই কলিকালকে বাদ দিলে মোটেই চলবে না।

আশি বছরের বুড়ি ঠাকুমা যদি নাতনিকে মিনি-ম্যাক্সি পরতে দেখেন তাহলে প্রথমে চমকে যান, তারপর অনুযোগের সুরে বলেন— কালে কালে কত কি দেখছি, আর কত কিই বা দেখতে হবে। ঠিক একইভাবে পুরাণ-যুগের কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়তো সেকালের কোনও আধুনিকা নাতনিকে চুলের কায়দা করতে দেখেছিলেন। ফলে অবধারিত মন্তব্য শোনা গেছে— কলিকালের মেয়েরা

শুধু চুলের কায়দা দেখাবে— কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলংকৃতাঃ। সেই যুগে হয়তো সেই প্রথম মেয়েদের চুলে কাঁটা গুঁজে খোঁপা করার চল উঠেছিল। ব্যাস, বৃদ্ধা নাক সিঁটকে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন— কলিকালের মেয়েগুলো সব মাথায় লোহার কাঁটা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, ঢঙ কত— প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। বৃদ্ধ স্থবিরের কাছে তাঁদের কালের আধুনিকতাই আশঙ্কার রূপ ধরে কলিকালের ধর্মে ঢুকে পড়েছে। পুরাণে বর্ণিত কলিকাল অতএব তাঁদেরই কলি।

আগে বলেছি— কলির সর্বগ্রাসী হাঁ-মুখটাকে মাত্র পাঁচ জায়গায় সীমায়িত করতে পেরে এবং একপেয়ে ধর্মকে আপাতত বাঁচাতে পেরে পরীক্ষিৎ খুব খুশি হলেন বটে কিন্তু অনভিজ্ঞ পরীক্ষিৎ 'কলির সন্ধ্যা' কথাটির অর্থ বোঝেননি। তিনি বোঝেননি সকালবেলায় রাত্রিদিনের সন্ধিক্ষণে দিনের ভাগ যতটুকু থাকে, রাতের ভাগও ততটুকুই থাকে। তিনি বোঝেননি যে কলি-মহারাজকে চাক্ষুষ দেখাটাই কলির আরম্ভ নয়— গোলমালটা আরম্ভ হয়েছে দ্বাপর যুগ থেকেই। এমনকি তিনি এ-ও বোঝেননি যে, তাঁর বাপ-পিতামহেরাও ছিলেন কলির পোষ্য। একটা কথা জনসমাজে চালু আছে যে, কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের লোক। মোটেই নয়। কৃষ্ণ আমাদের মতোই কলিযুগের মানুষ, একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'কলির কেষ্ট'। হরিবংশে লক্ষ করবেন— দানবরাজ কালযবনকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মুচুকুন্দের সামনে নিয়ে এসেছেন। কালযবন মথুরাবাসীর অবধ্য ছিল এবং মুচুকুন্দের ওপর দেবতাদের আশীর্বাদ ছিল যে, তাঁর ঘুম ভাঙালেই তাঁর চোখের সামনে যে আসবে, সেই পুড়ে যাবে। কৃষ্ণ ঘুমন্ত মুচুকুন্দের আলো-আঁধারি গুহায় প্রবেশ করলেন, পেছন পেছন কালযবন। কৃষ্ণ মুচুকুন্দের চোখ এড়িয়ে দূরে দাঁড়ালেন। এদিকে কালযবন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করে তাঁর ঘুম ভাঙালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মসাৎ। কিন্তু এবারেই হল আসল মজা। ঘুম ভেঙে মুচুকুন্দ কৃষ্ণকে দেখে ভাবলেন— ব্যাপারটা কি? এরকম একটা খুদে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে— বাসুদেবমুপালক্ষ্য রাজা হ্রস্বং প্রমাণতঃ। মুচুকুন্দ বললেন— আপনি কে? আপনি কি বলতে পারেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কতদিন কেটেছে? কৃষ্ণ বললেন, আজ্ঞে, আমি যদুবংশের ছেলে, আমার নাম কৃষ্ণ বাসুদেব। আপনি সেই ত্রেতা যুগ থেকে ঘুমোচ্ছেন— এখন কলিযুগ চলছে, এবারে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি— ইদং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে।

ঘুমচোখ ঘষে মুচুকুন্দ গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন কলিযুগের প্রকৃতি দেখবার জন্য। দেখলেন পৃথিবী বেঁটে আর ক্ষুদে মানুষে ভরে গেছে— ততো দদর্শ পৃথিবীম্ আবৃতাং হ্রস্বকৈ নরৈঃ। তাদের উৎসাহ, শক্তি, পরাক্রম সবই কেমন কম কম। তিনি আর এই স্বল্পবল পৃথিবীকে বাসযোগ্য মনে করলেন না, চলে গেলেন হিমালয়ে। অবতারবাদী সংরক্ষণশীলেরা মনে করেন এই যে কৃষ্ণের মুখে পষ্টাপষ্টি কলিযুগের কথা শোনা গেল এটা নাকি দ্বাপর-কলির সন্ধিলগ্ন। আমরা বলি 'ইদং কলিযুগং' বললে কি কোনও সন্ধিলগ্ন বোঝায়? তাছাড়া প্রমাণ তো আরও রয়ে গেছে। স্বনামধন্য পরশুরাম বিষ্ণুপুরাণের যে অংশ অবলম্বনে 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পটি লিখেছিলেন, সেখানেও রেবতীর বাবা ব্রহ্মার আসরে নাচ-গান শুনে এসে দেখেন পৃথিবীতে কলিকাল এসে গেছে— আসন্নো হি তৎ কলিঃ। তাঁর অবস্থাও হয়েছিল মুচুকুন্দের মতোই। বেশ কিছুদিন 'স্পেসে' কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে রৈবত কুকুদ্মী দেখলেন— তিনি একেবারে একা হয়ে গেছেন আর পৃথিবী অল্পশক্তি ক্ষুদে মানুষে ভরে গেছে— দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষান্ অশেষান্/অল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্যান্।

তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি কৃষ্ণ, বলরাম, পাণ্ডব, কৌরব— এরা সবাই আমাদের মতো বেঁটে-খাটো কলিযুগের মানুষ এবং পুরাণের ইতিহাস মানে প্রায় কলিযুগেরই ইতিহাস। নৃতাত্ত্বিকেরা কী বলবেন জানি না, তবে পুরাণজ্ঞ ঋষিদের ধারণা ছিল— মানুষের চেহারা ক্রমেই বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। তবে বেঁটে-খাটো হলে হবে কি, এদের বুদ্ধি কম ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— এই চতুর্যুগের ভাবনা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই— অন্যত্র ন কচিৎ। তবে নিবিষ্ট মনে পুরাণগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি— আসলে মনুষ্যত্বের ক্রম-ক্ষীয়মাণ ইতিহাস অথবা উল্টোদিক দিয়ে জটিলতার ক্রম-বর্ধমান ইতিহাস। আমাদের কালের প্রাচীনদের কাছে প্রায়ই শুনি যে, তাদের যুগটা ছিল অন্য রকম। লোকের ধর্মভীতি ছিল, শৌচ, আচার ছিল, আর মেয়েরা ছিল-সব দারুণ ভাল। আমাদের পৌরাণিকেরা ঠিক একইভাবে বলেছেন যে, সত্যযুগে যেমন সুদিন ছিল, ত্রেতাযুগে তা ছিল না, দ্বাপরের অবস্থা বেশ খারাপ আর কলিকালের তো কথাই নেই।

পুরাণকাহিনিতে সত্যযুগের কল্পনায় যে অনন্ত মাহাত্ম্য আছে তাতে মনে হয় যে সমাজটা ছিল একেবারে বিকারহীন, একেবারে নিরেট। মানুষ ভাল,

মন ভাল, আচার আচরণ সব ভাল। শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট, লোভ-মাৎসর্য, ধর্মাধর্ম কিছুই নেই। এই কাল্পনিক সমাজ খুব ভাল হতে পারে, তবে বিকারহীনতা জড়তারই নামান্তর। সত্যযুগের এত মাহাত্ম্যের মধ্যেও কূর্মপুরাণ লক্ষ করেছে যে, সে যুগের মানুষেরা ছিল নির্জনতাপ্রিয় এবং তাদের বাসস্থান বলে সঠিক কিছু ছিল না— অনিকেতাঃ। সমুদ্রতীর আর পর্বতের গুহাই ছিল তাদের থাকবার জায়গা— পর্বতোদধিবাসিন্যঃ। পুরাণের মতে, সমস্ত জটিলতার সূত্রপাত ঘটে ত্রেতা যুগে। এই জটিলতার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক কারণের যোগ ছিল, সেটাও কূর্মপুরাণ লক্ষ করেছে। আগে হাজার হাজার গাছই মানুষকে জীবন ধারণে সাহায্য করত, কিন্তু হঠাৎ তাদেব মধ্যে কামনা আর লোভ দেখা গেল— কামলোভাত্মকো ভাব স্তদা হ্যাকস্মিকো ভবৎ। কূর্মপুরাণ বলেছে, এই কামনা আর লোভের ফলেই মানুষের সমস্ত বৃক্ষাবাসগুলি নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এ হল সেই যুগ, যখন বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীরা এক বনের খাবার শেষ করে আরেক বনে পৌঁছচ্ছিলেন। কারণ পুরাণের বার্তামতো মানুষের অনুতাপে আবার বনবৃক্ষেরা তাদের ঘরবাড়ি দিয়েছে, খাবার ফল দিয়েছে, দিয়েছে লজ্জাবস্ত্র— বল্কলবাস। গাছের 'পুটকে পুটকে মধু'— ভালই ছিল প্রজারা। কিন্তু পুরাণ বলছে— কালক্রমে আবার মানুষের মধ্যে লোভ দেখা গেল। মানুষেরা জোর করে যে গাছ থেকে যত মধু পাবার নয়, তার চেয়ে বেশি মধু সংগ্রহ করা আরম্ভ করল— বৃক্ষাংস্তান্ পর্যগৃহ্নন্ত মধু চামাক্ষিকং বলাৎ। এ-মধু মধুমক্ষিকা সংগৃহীত নয়, অমাক্ষিক মধু। খাবার।

যতটুকু ব্যবহারে গাছ জীর্ণ হয় না, তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করার ফলেই বনগুলির মরণদশা উপস্থিত হচ্ছিল। আর এই যে বারবার গাছেরা জন্মাচ্ছে, লুপ্ত হচ্ছে, আবার জন্মাচ্ছে— এই বর্ণনা পশুপালী যাযাবর আর্যজাতির আরণ্যক স্মৃতিমাত্র। কূর্মপুরাণ বুঝিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র গাছের ছায়া আর বনের ফলের অপ্রতুলতার জন্যই মানুষ পাকাপাকিভাবে বাড়িঘর বানানোর প্রেরণা পেল; শীত, বর্ষা আর রোদের কবল থেকে বাঁচতে এবার তারা আবরণ চাইল এবং তা বানিয়ে দিল গাছেরাই— চক্রুবাবরণানি চ। বায়ুপুরাণ বলেছে— মানুষ আগে গাছের আশ্রয়ে থাকত বলে গাছের কাছেই তারা বাড়ি তৈরির কায়দা শিখেছে। গাছের ডাল যেমন একটা সামনে, একটা পেছনে, একটা এপাশে, একটা ওপাশে বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেই বুদ্ধিতেই মানুষ

বাড়ি বানানো শিখেছে। গাছের শাখার শিক্ষা থেকে বাড়ি তৈরি হয় বলেই বাড়ির নাম 'শালা'— বুদ্ধ্বাদ্বিয্যাংস্তথা ন্যায়ো বৃক্ষশাখা যথা গতাঃ। তথা কৃতাস্তু তৈঃ শাখাঃ...। গাছগুলি একের পর এক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— এই বিনাশের আশঙ্কার মধ্যেই জন্ম নিল কৃষিকর্মের সুপরিকল্পিত ভাবনা, পশুপালনের চিন্তা— বার্ত্তোপায়মচিন্তয়ন্। তবে ত্রেতা যুগের প্রথম কৃষিকর্মে নাকি লাঙল লাগত না, বীজও লাগত না— অফাল-কৃষ্টাশ্চানুপ্তা। আসলে পৌরাণিকের রূপকথায় লাঙল ব্যবহারের চেষ্টা, অপচেষ্টা এবং অবশেষে সার্থকতার ইতিহাসটুকু বেমানান। তাই লাঙল আর বীজ ছাড়াই সেখানে কৃষিকর্ম সম্পন্ন হয়।

ঠিক এই রকম একটা সময়েই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তির চেতনা জন্মাল। কেননা পুরাণ বলেছে— ত্রেতাযুগের কালধর্মে মানুষের মধ্যে আবার লোভ জন্মাল এবং তারা জোর করে নদী, পাহাড়, জমি, গাছপালা, ওষধি— একের পর এক দখল করতে লাগল— ততস্তে পর্যগৃহ্নন্ত...প্রসহ্য তু যথাবলম্। ঠিক এই গোষ্ঠীগত অধিকারের পালা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখনই বোধহয় সেই মানুষটা জন্মালেন, যাঁর নাম পৃথু। এঁর নাম থেকেই এই মর্তভূমির নাম পৃথ্বী অথবা পৃথিবী। বস্তুত পৃথুই ভারতবর্ষের প্রথম রাজা, যিনি সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন এবং পৃথিবীর গর্ভ থেকে শস্য বার করে নিয়ে আসেন।

ত্রেতাযুগের যে সময়টাতে মানুষ ভীষণ লোভী হয়ে উঠেছিল এবং যে সময়ে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করতে এবং শস্য উৎপাদন করতে শিখে গেল, এই সময়টার সঙ্গে পৃথু মহারাজের অবশ্যই একটা যোগ আছে। একটা কথা বোঝা দরকার, পৃথুর কথা সমস্ত নামি পুরাণগুলিতে পাওয়া যাবে। কেননা তিনিই স্বেচ্ছাচালিত দখলদারির মধ্যে প্রথম শৃঙ্খলা এবং সভ্যতা নিয়ে আসেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, পুরাণগুলি যেখানে পৃথুকে ভগবানের অবতার বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি সেই অবতারপুরুষ আদি ধর্মরাজের জন্ম কিন্তু প্রায় জীবন্ত এক অধর্মপুরুষের দেহ থেকে। পৃথুর বাবার নাম বেণ, যাঁর প্রথম পরিচয় ছিল তিনি ধর্ম মানতেন না। স্বেচ্ছাচার এবং লোভই ছিল তাঁর একমাত্র বিলাস— স ধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামাল্লোভে ব্যবর্ত্তত। ঠিক এই ব্যবহার আমরা সম্পত্তিগ্রাসী মানুষগুলির মধ্যেও পেয়েছি। নদী, পাহাড়, জমির দখলদারি নিয়ে যে চরম অবস্থা হয়েছিল তার একটা প্রতীকী আচরণ আছে এই বেণের মধ্যে।

বেণ নাকি বলতেন— আমার চেয়ে বড় আবার কে আছে, আমি ছাড়া আর কেই বা আছে যাকে আরাধনা করা যায়— মত্তঃ কো'ভ্যধিকো'ন্যোস্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ। সমস্ত যজ্ঞে পুজো করতে হবে আমাকেই— অহমিজ্যশ্চ পূজ্যশ্চ। এটা বুঝতে হবে যে, সভ্যতার প্রথম লগ্নে বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বলশালী তাঁর কাছে এই ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। দু-একটি পুরাণ বলেছে প্রথম রাজা হওয়ার কৃতিত্ব নাকি বেণেরই, পৃথুর নয়। তবে সব পুরাণই এ ব্যাপারে এককাট্টা যে, বেণের স্বেচ্ছাচার চরমে উঠলে ঋষিরা সব একজোট হলেন। আমরা অবশ্য ঋষিদের কথা বলি না, বলি, শুভকামী মানুষেরা সংঘবদ্ধ হলেন। একথা বলি এইজন্যে যে, সব পুরাণের মতোই পৃথুর পূর্ববর্তী সময়ে কোনও সভ্যতা ছিল না। এমনকী পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত ছিল অসমান— বিষমাসীদ্ বসুন্ধরা। পৃথুর আগে গ্রাম-শহরের কোনও বিভাগ ছিল না, ছিল না কৃষিকর্ম। শস্য কিংবা পশুপালন। ব্যবসাবাণিজ্যের তো কথাই নেই— ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষি র্ন বণিকপথঃ। ঠিক এই অবস্থায় কোথায় বা যজ্ঞ, কোথায় বা ঋষি। তাই বলেছি শুভকামী মানুষেরা একজোট হলেন। পৌরাণিকেরা বলেছেন ঋষিরা বেন-রাজাকে শাপদগ্ধ করে জীবন্ত অবস্থাতেই তাঁর বাহু দুটি মন্থন করতে থাকলেন। বাঁ হাতটি মন্থনের ফলে জন্মাল নিষাদেরা, আর ডান হাত মন্থনের ফল হলেন পৃথু।

জনসাধারণের বিপ্রতীপ স্বার্থপর আচরণের প্রতীক বেণ তো ধ্বংস হলেন। পৃথুও ব্রহ্মার আদেশে গোরূপা পৃথিবী দোহন করে তাকে শস্যশালিনী করে তুললেন। কিন্তু মুশকিল হল, এতে সবার অন্ন-পানের ব্যবস্থা হলেও জমি নিয়ে ঝগড়াটা বোধহয় চলছিলই। কূর্মপুরাণের পরবর্তী বচন থেকে সেটা বোঝাও যায়; সম্পদ এবং তার মালিকানা নিয়ে যে অর্থনৈতিক অভিসন্ধির কথা পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেন তার মূল বোধটা এসেছিল বোধহয় জমি আর স্ত্রীলোক নিয়েই। পুরাণের অন্যত্র সমস্ত স্ত্রীলোকেরাই অবশ্য এক ধরনের জমি বলেই স্বীকৃত। পৃথু মহারাজের জমানায় পৃথিবী দোহন করে অন্ন-বস্ত্র পাওয়া গেলেও স্ত্রীলোক আর ধনসম্পত্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকী যাদের স্ত্রী এবং ধনসম্পত্তি দুই-ই ছিল, তারাও ছিল এই লড়াইতে সমান অংশীদার। তারা পরস্পরের জমি এবং বউ নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করেছিল— ততস্তা জগৃহুঃ সর্বা হ্যন্যোন্যং ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ। আত্মদারধনাদ্যাস্তু বলাৎ কালবলেন চ॥

পুরাণ লিখেছে— ঝগড়াটা হচ্ছিল কালবশে, গা-জোয়ারি করে কিন্তু আমরা বলব ঝগড়ার মূলটা মহাকালের গভীরে নয়, মালিকানার তত্ত্ববোধে। ঠিক এই কারণেই দুটো নিয়ম করতে হল এবং তা করতে হল স্বয়ং ব্রহ্মাকে।

প্রথম বিধান অবশ্যই স্ত্রীসংক্রান্ত। সৃষ্টির আরম্ভেই প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যাগমনের সংবাদে যদি কোনও রূপকই থাকে, তবুও সভ্যতার আদিতে সাধারণের মধ্যে যে মৈথুন সংক্রান্ত কোনও বিধি-বিধান ছিল না, বরঞ্চ দারুণ শিথিলতা ছিল, এটা ভাবাই স্বাভাবিক। পৌরাণিকেরা বলেছেন ব্রহ্মার দেহটি দু-ভাগ হয়ে একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীরূপ তৈরি হল। ঠিক এই অবস্থায় দ্বিধাভিন্ন অর্ধেক মানুষ হয়ে জন্মাবার ফলে এদের পারস্পরিক মিলনের টান তাই রয়েই গেল, রয়ে গেল সম্পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছে। দুইয়ের এই পারস্পরিক মিমীলিষা বা মিলনের ইচ্ছেই হল কাম, যে কামনা রূপ ধারণ করেছে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পায়।

পুরাকালে বিবাহ বলে কোনও সামাজিক বন্ধন ছিল না। যা ছিল তা অথর্ববেদের কায়দায়— এ মেয়েমানুষ, এ পুরুষমানুষ, একজন যুবক, অন্যজন যুবতী— এও যৌন মিলন করেনি, অন্যজনও নয়— ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। দুজনে মিলনের জোড় বাঁধলেই মিথুন এবং তাদের মিলনকর্ম মৈথুন। ব্রহ্মা নিজকন্যা সরস্বতীর সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ করে— হ্যাঁ মিলন সম্পূর্ণ করেই— মিলনের দেবতাকে শাপ দিয়ে বললেন— তুমি শিবের চোখের আগুনে ভস্ম হবে। কাম বললে— সে কি কথা! আপনিই না আমাকে এরকম করে স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয় ক্ষোভ জন্মাতে বলেছেন। আপনি আমাকে বলেননি— পুরুষ আর রমণী হলেই হল— স্ত্রীপুংসোরবিকারেণ— দুজনের মন একেবারে উথাল-পাথাল করে দেবে— ক্ষোভ্যং মনঃ প্রযত্নেন ত্বয়ৈবোক্তং পুরা বিভো! এখন আপনিই আমাকে দুষছেন? সত্যিই তো সৃষ্টির আদিতে কামনার দেবতা কী করে মনুষ্য সম্পর্কের কথা বুঝবে! মাতা, কন্যা, পিতা, পুত্র— এ সব সামাজিক সম্পর্ক অনেক পরের ব্যাপার। পৌরাণিকদের বিশ্বাস ছিল পুরাকালে ব্রহ্মা নাকি জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষ তৈরি করেছিলেন। তাদের মনে নাকি অদ্ভুত এক আনন্দ হওয়ায়— ততো বৈ হর্ষমানাস্তে— তারা কামনায় পরস্পর মৈথুনে প্রবৃত্ত হল— অন্যোন্যা হৃচ্ছয়াবিষ্টা মৈথুনায়োপচক্রমে। তাদের সুবিধে ছিল বিরাট। তারা যত মৈথুনই করুক, তাদের ছেলেপুলে হত না, কারণ তখন

নাকি রমণীদের মাসে মাসে ঋতুকাল ছিল না। কাজেই প্রচুর মৈথুনের পরেও— সবিতৈরপি মৈথুনৈঃ— রমণীরা পুত্র-কন্যা প্রসব করত না। সেই মিথুনজাত মানুষেরা নাকি আয়ুশেষে একেবারে আরও একটি যুগল ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়ে স্বর্গত হত।

তবে এ সব সত্য যুগের কথা। ত্রেতা যুগেই লোকজন প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় পৌরাণিকেরা বুঝতে পেরেছেন— মাসে মাসেই স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ঘুরে আসে আর মাসে মাসে মিলনের ফলেই— মাসি মাস্যুপগচ্ছতাম্— গর্ভোৎপত্তিও হয়। কিন্তু এই গর্ভোৎপত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা আসেনি তখনও। সমাজে বিবাহ বস্তুটা কি অথবা নিদেনপক্ষে মৈথুন-বদ্ধ পুরুষ কিংবা নারী পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ কিনা— সেই সামাজিক সমস্যা তখনও তৈরি হয়নি। পুরাণকারেরাও প্রায় কোথাও নির্দিষ্ট করে বলেননি, যে, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনে শৃঙ্খলা ব্যাপারটা কী করে এল। তবে হ্যাঁ, খোদ মহাভারতের মধ্যে পৌরাণিক কথাবার্তা কিছু আছে। আমরা যদি সেখান থেকে স্ত্রী-পুরুষের প্রাথমিক ব্যবহারের একটা হদিশ পাই, তাতে পুরাণের মর্যাদা কিছু কমে না।

মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডু যখন 'ছেলে হল না, ছেলে চাই' বলে পাগলপারা হয়ে উঠলেন, তখন কুন্তী অনেক ধর্মকথা শোনালেন। দোষের মধ্যে পাণ্ডু বলেছিলেন— একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে একটি পুত্র জন্মের সাধন কর, কুন্তী। কুন্তী বড় দুঃখিত হয়ে এক পতিব্রতার কাহিনি শোনালেন বটে, তবে ভুলেও তাঁর কুমারীকালের সূর্য-সম্ভোগ বর্ণনা করলেন না। পাণ্ডু তখন ভাল মানুষের মেয়ে কুন্তীকে বললেন— দেখ বাপু, তুমি কি জান যে, এককালে মেয়েদের দুয়োর ছিল সবার জন্য খোলা— অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে। তারা ছিল স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাবিহারী। তারা যে কোনও পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারত এবং তাতে কোনও অধর্ম ছিল না, বরঞ্চ সেইটাই ছিল ধর্ম— স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ। পাণ্ডু বললেন— কুন্তী তুমি হয়তো আমার কথা মানতে চাইবে না, কিন্তু প্রমাণ দিলে তো তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ— এখনও উত্তরকুরু দেশে এমনি প্রথাই চালু আছে— উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষু অদ্যাপি পূজ্যতে। তবে হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করতে পার, কবে থেকে এসব নিয়ম চালু হল যে, মেয়েরা স্বামীর ঘরেই থাকবে।

পাণ্ডু বলতে থাকলেন। পাণ্ডু যা বললেন, তা তাঁর কালের পুরাণ কথা। অবশ্য পাণ্ডু যে সময়ের কথা বললেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তখন স্ত্রীলোক

একটি পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধা আরম্ভ করেছে। পাণ্ডু বললেন— মহর্ষি উদ্দালকের ছেলে হলেন শ্বেতকেতু। পাঠক! এই দুজনেই উপনিষদের নাম-করা মুনি, কাজেই পাণ্ডু হয়তো উপনিষদের যুগের বৃত্তান্ত বলছেন, তাও হতে পারে। পাণ্ডু বললেন— পুত্র শ্বেতকেতু একদিন দেখলেন, তাঁর মাকে তাঁর বাবার সামনেই আরেক বামুন এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বামুন এসে তাঁর মার হাত ধরে বলল, চল, আর মাও চললেন। জোর করে নয়, এমনিই। কিন্তু পুত্র শ্বেতকেতুর মনে হল যেন জোর করেই তাঁর মাকে নিয়ে গেল ওই বিটলে বামুনটা— নীয়মানাং বলাদিব। কিন্তু জোর করে যে নয়, তার প্রমাণ দিলেন স্বয়ং তার বাবা। ক্রুদ্ধ শ্বেতকেতুকে দেখে তাঁর বাবা বললেন— এত রাগের কি হয়েছে বাছা! এই তো চিরকালের ধর্ম— মা তাত কোপং কার্ষীঃ ত্বমেব ধর্মঃ সনাতনঃ। তুমি কি জান না বাবা, মেয়েরা হল সব ছাড়া-গোরুর মতো— যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত। যখন যে ইচ্ছে, যে কোনও বর্ণের পুরুষ-পুঙ্গব যে কোনও স্ত্রীলোককে ভোগ করতে পারে— অনাবৃতা হি সর্বেষাং বর্ণানাম্ অঙ্গনা ভুবি। শ্বেতকেতুর বাবা উদ্দালক যে যৌন ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন সেটা বোঝা যায়। কেননা এই উদ্দালক উপায় থাকা সত্ত্বেও শিষ্যকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সুযোগ দিয়ে শ্বেতকেতুর জন্ম দিয়েছিলেন— উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ।

শ্বেতকেতু সব শুনলেন বটে কিন্তু সেদিন থেকেই তিনি এই নিয়ম বেঁধে দিলেন যে, কোনও মেয়েই তার স্বামীকে অতিক্রম করে অন্য পুরুষের সঙ্গ করতে পারবে না। পাণ্ডু বললেন— শ্বেতকেতুর এই বচনের পর থেকেই সমাজে এটা পাপ বলে গণ্য হচ্ছে— অদ্য প্রভৃতি পাতকম্। নচেৎ পাণ্ডুর ভাবটা এই যে, অন্য পুরুষের সঙ্গ কিছু দোষের নয়। বিশেষত পুত্রার্থে। বিশেষত স্বামীই যখন এই নিয়োগে অনুমতি দিচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, পাণ্ডু যেখানে কুন্তীকে উত্তরকুরু দেশের রমণীকুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে আপন স্ত্রীর পতিব্রতা-বাতিক ভাঙার চেষ্টা করেছেন, তাতে বেশ বুঝি তাঁর কালে এই ধরনের সামাজিক শিথিলতা ছিল। আমাদের আলোচ্য প্রধান পুরাণগুলির মৌলাংশও যেহেতু মহাভারতের যুগের বেশি পরে লেখা নয়, তাতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যেতে পারে যে, পুরাণের যুগেও সামাজিক শিথিলতা ছিল যথেষ্ট, যদিও সাধারণ মেয়েমানুষকে পতিব্রতার দীক্ষা দিতে পৌরাণিকেরা ছিলেন শুধুমাত্র

মৌখিকভাবে দায়বদ্ধ। পুরুষ মানুষেরা স্ত্রীসংক্রান্ত বিষয়ে নিজেরা দায়হীন, আচরণহীন, অথচ স্ত্রীলোকের কর্তব্য বিষয়ে তাঁদের এই যে মৌখিকতা— এ মৌখিকতার একমাত্র কারণ হল— তাঁরা নিজেরা বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের স্ত্রীরা অন্য পুরুষের মোহগ্রস্ত হলে মানসিক স্থিরতা নষ্ট হয় বটেই। তবু বলব এই যে শিথিলতা— এর বেশির ভাগটাই পৌরাণিকদের নিজের কালের নয়, এ তাঁদেরও পূর্বকালের। মৎস্যপুরাণ থেকে একটি কাহিনি উদ্ধার করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মৎস্যপুরাণের এই ঘটনা মহাভারতে আছে, এমনকি ঋগ্‌বেদেও আছে। কাজেই এই শিথিলতা পৌরাণিকদের পূর্বকালের, যা তাঁরা তাঁদের কালেই পুরানো ঘটনা বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা একই বংশে পর পর দুটি শিথিলতার উদাহরণ দেব। তবে সমাজ এখন সেই পর্যায়ে নেই, যেখানে রমণীরা গাভীর মতো উন্মুক্ত। সমাজে এখন বিবাহাদি চালু হয়ে গেছে এবং পরপুরুষের আনাগোনায় নারীরাও বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করেছে। উশিজ মুনির স্ত্রীর নাম মমতা আর উশিজের ছোট ভাই স্বনামধন্য বৃহস্পতি। বিবাহিত মহিলা হলেও মমতার চেহারা ভারী সুন্দর— মমতা বরবর্ণিনী। একদিন বড়দাদা উশিজের অনুপস্থিতিতে উতলা বাতাস আর যৌবনের অভিসন্ধিতে বৃহস্পতি মমতার মিলন কামনা করলেন— মমতামেত্য কামতঃ। মমতা-বউদি বললেন— সে কি কথা ঠাকুরপো, আমি তোমার বড়ভাইয়ের বউ না! তার ওপরে এখন আমি গর্ভবতী, এখন তুমি ক্ষ্যামা দাও— অন্তর্বত্ন্যস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তু বিরম্যতাম্। যতখানি অনভিলাষে তার থেকেও অনেক বেশি গর্ভপাতের ভয়ে মমতা ভাবী ছেলের গুণরাশি কীর্তন করে বললেন— জান! ছেলে আমার গর্ভে থেকেই সাঙ্গ বেদ উচ্চারণ করছে। ঠিক এই অবস্থায়, না, না, তোমার শক্তিও যে অমোঘ বৃহস্পতি। এই সময়টা তুমি পার হতে দাও, তার পরে আমার সঙ্গে যা ইচ্ছে কোর তুমি— অস্মিন্নেব গতে কালে যথা বা মন্যসে বিভো।

মহাতেজা বৃহস্পতি শুনলেন না মমতার অনুনয়, কারণ মহাত্মা হলেও সেই মুহূর্তে তিনি কামাত্মা হয়ে পড়েছেন— কামাত্মা সা মহাত্মাপি। মনকে দমন করতে না পেরে তিনি মমতার তাৎক্ষণিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। চরম মুহূর্ত যখন এগিয়ে এল তখন বাধা দিল স্বয়ং মমতার গর্ভস্থ সন্তান। গর্ভেই যে বেদ উচ্চারণ করছে, সে গর্ভ থেকেই বলে উঠল—

ওগো বাক্যে বৃহস্পতি— বাচামধিপ— এই গর্ভে দুজনের স্থান হবে না। আপনার শক্তিক্ষয় বৃথা হবে না নিশ্চয়, কিন্তু আমি যে এখানে পূর্বের অতিথি— পূর্বঞ্চাহমিহাগতঃ। বড় ভাইয়ের ছেলের ছোট মুখে বড় কথা শুনে ক্রুদ্ধ বৃহস্পতি যা বললেন তা পঞ্চানন তর্করত্ন মশায়ের বঙ্গানুবাদে শুনুন। বৃহস্পতি বললেন, "তুই গর্ভে থাকিয়া যখন আমার ঈদৃশকালে বীর্যপাত করিতে নিষেধ করিতেছিস; তখন তুই দীর্ঘ তমোরাশির মধ্যে প্রবেশ করিবি।" মৎস্যপুরাণ বলেছে বৃহস্পতির এই শাপে মমতার ছেলেটি দীর্ঘতমা নামে জন্ম নিল। শাপের ফলে ঋষির নাম দীর্ঘতমা হল— শুধু এইমাত্র হতে পারে না। আমরা বেদ, মহাভারত ইত্যাদির প্রমাণে জানি এই ঋষি অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে অন্ধকার ছাড়া কিছু ছিল না বলেই তিনি দীর্ঘতমা।

দীর্ঘতমা বড় হয়ে বৃহস্পতির মতোই হয়ে উঠলেন। তবে গর্ভাবস্থাতেই যিনি বেদমন্ত্রের সঙ্গে কামপ্রবৃত্তিও দেখেছেন তাঁর পরবর্তী জীবনে কিছু বিকার ঘটবে এইটাই স্বাভাবিক। পুরাণকার অবশ্য এই বিকারের জন্য একটি গল্প বলেছেন। দীর্ঘতমা তখন ছোট ভাইয়ের আশ্রমে থাকেন। হঠাৎ সেখানে একদিন একটি ষাঁড় এসে উপস্থিত হল এবং যজ্ঞের কুশ-টুশ মাড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিল। দীর্ঘতমা ষাঁড়ের শিং-দুটো ধরে টানতে থাকলেন এবং ষাঁড় যখন আর কোনওক্রমেই এঁটে উঠতে পারল না তখন ষাঁড় বলল— আমি তোমায় বর দেব। দীর্ঘতমা বললেন— নচ্ছার কোথাকার, পরের বাড়িতে খাওয়া ষাঁড়, তোকে কিছুতেই ছাড়ব না। ষাঁড় বললে— আমাদের কোনও পাপ নেই, চুরির দোষও আমাদের গায়ে লাগে না। ধর্ম জিনিসটা তোমাদের ব্যাপার, যারা দু-পেয়ে প্রাণী। চতুষ্পদ জন্তুর ধর্ম অধর্ম, খাওয়া-দাওয়ার বিধিনিষেধ মৈথুনের বিচার কিছুই নেই। দীর্ঘতমা তখন সেই ষাঁড়ের কাছে আচ্ছা করে গো-ধর্ম শিখে নিলেন। গো-ধর্ম মানে ষাঁড় কিংবা গরু যেভাবে জীবনযাপন করে, সেই ধর্ম শিখে নিলেন এবং এই বিদ্যা তাঁর বেশ পছন্দ হল।

গো-ধর্ম শিক্ষার প্রথম প্রয়োগের জন্য দীর্ঘতমা বেছে নিলেন তাঁর ছোট ভায়ের বউকে, যিনি মহর্ষি গৌতমের পত্নী। ভ্রাতৃবধূর মিলন কামনা করলে সে তো ভারী ক্ষুব্ধ হল। সে কোনও মতে ভাসুর-ঠাকুরকে প্রত্যাখ্যান করল বটে কিন্তু যে দীর্ঘতমা ষাঁড়ের ব্যবহার শিখেছেন, তিনি করলেন কি, যেখানেই ভাই-বউ যায়, সেখানেই ষাঁড়ের কায়দায় উপস্থিত হতে লাগলেন—

সো'নড়ানিব। গৌতমের বউ তখন তাঁকে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর হাত দুটো ধরলেন চেপে। বললেন— তুমি এ রকম উল্টো ব্যাপার করছ কেন, আমি যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই আমার পেছন পেছন ধাওয়া করছ ষাঁড়ের মতো— অনড়ানিব বর্তসে। তোমার কি গম্যাগম্যের ভেদবুদ্ধি এমন নষ্ট হয়ে গেছে যে, মেয়ের সমান ভাইবউয়ের সঙ্গ কামনা করছ— গোধর্মাৎ প্রার্থয়ন্ সুতাম্। উত্ত্যক্ত, বিরক্ত গৌতমপত্নী শেষ পর্যন্ত রেগে বললেন— দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি মজা, বদমাশ! তোকে আজকে ঘরছাড়া করব— দুর্বৃত্তং ত্বাং ত্যজাম্যদ্য। বেটা কানা, বুড়ো! দুরবস্থায় ঘরে বসে খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি— যস্মাৎ ত্বমন্ধো বৃদ্ধশ্চ ভর্তব্যো দুরধিষ্ঠিতঃ— তার এই ব্যাভার! গৌতমপত্নী এবার গোধর্মী দীর্ঘতমাকে ধরে একটা প্যাটরায় মধ্যে পুরে ফেলে দিলেন গঙ্গায়। দীর্ঘতমা ভাসতে ভাসতে চললেন।

এই পুরাকাহিনিতে একটা ঘটনা বেশ প্রমাণ হল। প্রমাণ হল— যে সমাজে রমণীরা ছাড়া-গোরুর মত বলে পুলকিত বোধ করছিলেন উদ্দালক ঋষি, সেই সমাজে পুরুষেরাও অনেকে ছিলেন ষাঁড়ের মতো। বোঝা যাচ্ছে রমণীরা কেউ বিব্রত বোধ করছে, কেউ বা সাংঘাতিকভাবে বাধা দিচ্ছে তবু ষাঁড়ের মতো পুরুষ মানুষও সমাজে থাকেই। অন্তত দু-একজনে যে কতখানি ষাঁড়ের মতো তার প্রমাণ মিলবে ওই দীর্ঘতমারই পরবর্তী আচরণে। গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমা কোথাও তীরে এসে ঠেকলেন। তাঁকে তুলে নিলেন প্রহ্লাদের নাতি দৈত্যরাজ বলি। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণা, তাঁর ছেলে হয় না। তখনকার দিনে ছেলে না হলে, যেন তেন প্রকারেণ ছেলে অবশ্যই চাই। আর কে না জানে নিয়োগ প্রথায় ছেলে জন্মাবার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ বড়ই উপাদেয়। বলি ভাবলেন, ব্রাহ্মণ উপস্থিত, এই সুযোগ। আমরা বলি, প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজের রাজ্যের ভেতরে বাইরে আর কি কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না! তবে এ কথা ঠিক, যে কোনও কালের যে কোনও পুরুষমানুষই স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে পুত্রার্থে নিয়োগ করুন না কেন, তাঁর মনে কিঞ্চিৎ বিকার হবেই। এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কানা বলে রাজা হয়তো ভেবেছিলেন যৌবনবতী স্ত্রীর রূপই সে দেখতে পাবে না, উপরন্তু যে বৃদ্ধ তাঁকে দিয়েই কর্তব্য-নিষেকটুকু করা ভাল। কিন্তু গোধর্মী দীর্ঘতমা অত বোকা নন। চোখ না থাকলে তার অন্য ইন্দ্রিয় বেশি সজাগ থাকে, বিশেষত সে অনুভবে সব পেতে চায়— রূপ, রস, যৌবন— সব।

নিয়োগ প্রথার নিয়ম হল— যে পুরুষ গর্ভধান করবেন তিনি রাতের আঁধারে এই কাজ করবেন, দিনে নয়। তার ওপরে তিনি নিজের গায়ে বেশ খানিকটা ঘি মেখে নেবেন এবং মৌনী থাকবেন— ঘৃতাক্তো বাগ্‌যতো নিশি। এ সব নিয়মের কোনও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা বুঝি যে, ঘিয়ে জ্যাবজ্যাবে পুরুষের সঙ্গে রতিতে কোনও স্ত্রীই যাতে আনন্দ না পায় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। তার ওপরে তার সঙ্গে প্রেম সম্ভাষণও যাতে সম্ভব না হয় তার জন্যই বোধহয় পুরুষটির মৌনী থাকার ব্যবস্থা। যাতে তার রূপ দেখে ভাল না লাগে সেই জন্য রাত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু এত নিয়ম সত্ত্বেও স্ত্রীরা পুরুষের চেহারা বুঝে ফেলত, কথাও যে হত না, তা নয়। রাজমহিষী সুদেষ্ণা কানা-বুড়ো দীর্ঘতমাকে দেখেই আর তাঁর কাছে ঘেঁষলেন না— অন্ধং বৃদ্ধং তং জ্ঞাত্বা ন সা দেবী জগাম হ। তিনি দীর্ঘতমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন শূদ্রা ধাত্রীকে। ঋষি শূদ্রা-সঙ্গে বেশ কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ব্রহ্মবাদী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে পরিচিত। রাজা বলি ঋষিধর্মে প্রবীণ এতগুলি ছেলেপুলে দেখে পরম পুলকিত হয়ে দীর্ঘতমাকে বললেন— বাঃ! তাহলে এইগুলিই আমার ছেলে। দীর্ঘতমা বললেন— মোটেই নয়, এগুলি আমারই ছেলে। রাজমহিষী সুদেষ্ণাকে পাননি বলে দীর্ঘতমার মনে বা কিছু ক্ষোভও ছিল। রাজাকে তিনি তাই দগ্ধ হৃদয়ে বললেন— তোমার স্ত্রী আমাকে অন্ধ-বুড়ো জেনে অপমান করেছে, তোমার নিয়োগমতো রানি সেখানে আসেননি, এসেছিল তার শূদ্রা ধাত্রী। এগুলি তাই আমারই ছেলে। দানব রাজা তো মুনির কথা শুনে সুদেষ্ণাকে খুব বকলেন— ভার্যাং ভর্ৎসয়ামাস দানবঃ। রাজা আবার তাঁকে সালংকারে মনোমোহিনী সাজে সাজিয়ে ঋষির কাছে পাঠালেন। সজ্জিতা রমণীকে অনুভবে কাছে পেলেন ঋষি। নিয়োগের প্রথামত মুনির দেহ কিন্তু ঘিয়ে ভেজানো দেখছি না, তাঁর দেহে লেপন করা হয়েছে দই, একটু লবণ এবং মধু দিয়ে— দধ্না লবণ মিশ্রেণ ত্বভ্যক্তং মধুকেন তু। অর্থাৎ পঞ্চামৃতের দুই অমৃতে একটু নুন পড়েছে। গোধর্মে শিক্ষিত ঋষি চোখে দেখতে পান না বটে তবে প্রতি অঙ্গে রানিকে অনুভব করবার জন্য সুদেষ্ণাকে তিনি কি বললেন জানেন? মুনি বললেন— আমার এই দই-লবণ আর মধুমাখা দেহখানি একটুও ঘেন্না না করে সব জায়গায় চাটতে থাক দেখি— লিহ মাম্ অজুগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম্। যদি এইভাবে লেহন করতে পার তবেই পুত্র পাবে তুমি।

পুত্র জন্মানোর নিয়োগে বৃত হয়েছেন বলে এত ঘৃণিত আচরণ আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এটা অবিশ্বাস্য নয় এই জন্যে যে, ঋষি অন্ধ এবং গোধর্মী বলেই এত বিকার সম্ভব হয়েছে। তখনকার সামাজিক কাঠামোয় যে স্ত্রীলোককে নিয়োগের ঢেঁকি গিলতে হচ্ছে, তিনি রাজারানি হলেও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না বিকৃত রুচির এই ঋষিকে বারণ করার। অতএব সুদেষ্ণা মুনির দেহ চাটতে থাকলেন। চাটতে চাটতে সুদেষ্ণা কোনও অঙ্গই বাদ দিলেন না, বাদ দিলেন শুধু মুনির উপস্থদেশ— লজ্জায় অথবা ঘেন্নায়। মুনি বললেন— তুমি যখন এই অঙ্গ বাদ দিলে, তখন তুমি গুহ্যদেশহীন এক পুত্র পাবে। সুদেষ্ণা বললেন— আপনি এ কি বললেন মুনিবর! আমি যথাসাধ্য যথাশক্তি আপনাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি, আপনি প্রসন্ন হোন। রানির অনুনয়ে মুনি প্রসন্ন হলেন। হবেনই বা না কেন, ভাইবউয়ের সঙ্গে গোধর্ম করতে গিয়ে লাথি-ঝাঁটা খেয়েছেন, সেই মানুষের গা চেটে আনন্দ দিয়েছেন রাজরানি। মুনি বললেন— ঠিক আছে আমার কথাটা তোমার ছেলের ব্যাপারে না লেগে তোমার নাতির ক্ষেত্রে লাগবে এবং গুহ্যহীন হলেও তা কোনও অসুবিধে হবে না। এবারে পুলকিত হয়ে বললেন— তুমি যখন আমার লিঙ্গটি ছাড়া আর সব অঙ্গই লেহন করেছ— প্রাশিতং যৎ সমগ্রেষু ন সোপস্থং শুচিস্মিতে— অতএব তুমি দেবতাদের মতো পাঁচ ছেলে পাবে— ধার্মিক সুচরিত্র। এই ছেলেরাই নাকি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ এবং পুণ্ড্র।

বাংলাদেশ এবং তার চারপাশের ভাগ্য মূল থেকেই এই বিকৃতরুচি মুনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, থাকুক। কিন্তু এই বিকৃতি এসেছিল সেই দিন থেকে, যেদিন শ্বেতকেতুর দাম্পত্য আইন চালু হয়েছিল। পুরাণে এবং মহাভারতে নিয়োগ ব্যবস্থার অন্ত নেই, কিন্তু মনুর সময়েই দেখছি ধর্মশাস্ত্রকারেরা আর নিয়োগের পক্ষপাতী নন। একেবারে নিরুপায় অবস্থায় মনু নিয়োগের কার্যকারিতা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু সব সময় মনু মহারাজ এই প্রথার বিপক্ষে। হয়তো মনুর সময়ে তার প্রয়োজনও ছিল না। আর্যায়ণের প্রথম পর্যায়ে পুরুষ-বৃদ্ধির প্রয়োজন যত ছিল, পরবর্তী সময়ে তা ছিল না। এই কারণেই সমাজে শৃঙ্খলা, বিশেষত নারী-পুরুষের দাম্পত্য শৃঙ্খলা, বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক শিথিলতা নিন্দিত হতে আরম্ভ করে। অবশ্য পুরাণকারদের মৌখিক উপদেশে শৃঙ্খলার কথা যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাঁদের সমাজের বাস্তবতা ছিল অন্যরকম। তাঁরা তত্ত্বগতভাবে যে

জিনিসটা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন তার সঙ্গে মিল ছিল না যা ঘটত তার। এর জন্যে পৌরাণিকের মিথ্যাবাদিতার দায় নেই, কেননা যে কোনও সমাজেই এটা হয়। এমনকী আজকের দিনেও যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিন্যাস আমাদের ঈপ্সিত, যে সব সংস্কারের জন্য আমরা আন্দোলন করি, লেখালেখি করি, বক্তৃতা দিই, সেগুলির সঙ্গে প্রায়ই যোগ থাকে না, যা বাস্তবে ঘটে, বা ঘটে চলেছে— তার। পুরাণকারদের সমাজব্যবস্থা বুঝতে গেলেও এই বাস্তববোধটুকু থাকা দরকার।

এ কথাটা প্রথমে বোঝা প্রয়োজন যে, সমাজ বলে যে কথাটা প্রচলিত, সেটা সব সময়েই একটা সচল ব্যাপার। এই সচলতার কারণেই সমাজকে ধরে রাখার জন্য যে নিয়মগুলি করা হয়, তার বিপর্যয়ও ঘটে। নিয়ম এবং তার বিপর্যয়— এইটাই সুস্থ এবং সচল সমাজের লক্ষণ। যাঁরা মনে করেন এই কলিযুগে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে, ত্রেতা যুগে কিংবা দ্বাপর যুগে বড় ভাল সময় ছিল, তাঁরা ভুল ভাবেন। যাঁরা ভাবেন দ্বাপর-ত্রেতায় বর্ণাশ্রম ধর্ম একেবারে নিখুঁতভাবে মানা হত, পুরুষেরা সব সদাচার পালন করত আর মেয়েরা ছিল সব সতী-সাধ্বী, কোন অনাচার কু-আচার কিচ্ছু ছিল না— তাঁরাও ভুল ভাবেন। সত্যি কথা বলতে কি— এই অনাচারহীন সদাচার-পরায়ণ যুগকল্পনা একটা 'উটোপিয়া' মাত্র, সুস্থ সমাজ কখনও কাল্পনিক সমাজের কায়দায় চলে না। বস্তুত যে ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রচলন হয়, সেই ত্রেতাযুগেই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বারোটা বেজে গিয়েছিল। বায়ুপুরাণ সাক্ষী দিয়ে বলবে— ব্রহ্মা লোকহিতার্থে ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমের নিয়ম তৈরি করলেন বটে কিন্তু জনসাধারণ তা মোটেই মানল না— এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা। যদাস্য ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রমাত্মিকাঃ। কাজেই যাঁরা ভাবছেন, ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুকের তপস্যায় বর্ণবিধির লঙ্ঘন দেখে তাঁকে হত্যা করলেন আর বর্ণ এবং আশ্রম সব একেবারে ঠিকঠাক হয়ে গেল— তাঁরাও ভুল ভাবছেন। পুরাণের মধ্যে দেখবেন বার বার ব্রহ্মা মানসী প্রজা সৃষ্টি করছেন। এই মানসী প্রজা সৃষ্টি কাল্পনিক বর্ণাশ্রম বিভাগের তাগিদে। বাস্তবে সব সময় বর্ণবিপর্যয়, বর্ণসংকট ঘটেছে। একটা জিনিস লক্ষ করবেন। পৌরাণিকেরা বার বার বলছেন সত্যযুগে যে মানুষেরা ছিলেন, ত্রেতাতেও তাঁরাই আছেন, দ্বাপরেও তাঁরাই আছেন এবং কলিতেও তাঁরাই থাকবেন। কী প্রথম কী শেষ, সমস্ত

মন্বন্তরেই মানুষের সুকর্ম কুকর্ম, সুখ দুঃখ, খ্যাতি প্রতিপত্তি এমনকী রূপ-গুণও একই রকম থাকে— কুশলাকুশলপ্রায়ৈঃ কর্মভিস্তৈঃ সদা প্রজাঃ।

সাধারণ তত্ত্বগুলিকে এই নিরিখে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, মুনি, ঋষি দেবতা বলে পরিচিত মানুষেরা যে অপকর্মগুলি করছেন সেগুলি সচল সমাজের অঙ্গ। অর্থাৎ এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি। আর এই তো স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণকুলের চূড়ামণি কোনও ঋষি হলেই শূদ্র বর্ণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে তাঁর পছন্দ হবে না, কিংবা সাময়িক ধৈর্যচ্যুতিতে তাকে বলাৎকার করবেন না — এ তো সচল সমাজের মনুষ্যধর্মের লক্ষণ নয়। ঠিক এই কারণেই পরাশর-সত্যবতী কিংবা বশিষ্ঠ-অক্ষমালাকে আমরা ক্ষমা করব। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা বেশি তেজী বলে তাঁদের দোষকে 'জাস্টিফাই' করার কোনও প্রয়োজন থাকবে না। লোভ, হিংসা, লোকঠকানো, মেয়ে মানুষের রূপে মজা, পরস্ত্রী ধর্ষণ— এ সব যেমন এখনও চলছে, তখনও চলত। তাই বলে কি ভাল কিছুই ছিল না? হ্যাঁ তাও ছিল। বার বার যে পুরাণের ঋষিরা আচরণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন— সেও তো বৃথা নয়। বেশিরভাগ মানুষই সে কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করে গেছেন— আবার মনুষ্য ধর্ম অনুসারে তার থেকে চ্যুতিও ঘটেছে। কাজেই আদর্শ এবং বিচ্যুতি— এই দুইয়ে মিলে সে কালের সমাজটা এখনকার মতোই সজীব, এখনকার মতোই কৌতূহলজনক। এই অল্প পরিসরে পৌরাণিকের সব টুকিটাকি, মানুষের সব ইচ্ছে-অনিচ্ছে, কাজ-অকাজ, রস-রসাভাস— সব এক জায়গায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু যাগ-যজ্ঞ, দেবতা, ব্রাহ্মণ্য ছাড়াও সেকালের সমাজে আরও যা কিছু ছিল, তার সামান্য স্বাদ-গন্ধ আমরা পেতেই পারি।

ধরুন আপনি যদি পুরাণের কালে জন্মাতেন, তাহলে সকালে উঠেই আপনাকে কিছু পূজার্চনা করতে হত। হ্যাঁ, পুরাণকারেরা হোম-যজ্ঞ ইত্যাদির কথা অনেক শোনাবেন বটে, তবে ওসব ঝামেলা তাঁদের যুগে অত ছিল না। পুরাণ মানেই এক এক দেবতার মাহাত্ম্য এবং ব্রত, উপবাস। শিব, কৃষ্ণ কিংবা দেবী দুর্গার কথা যখন পুরাণে শুনি তখন দেখা যাবে এঁদের এক একজনের নাম করলেই শত যাগ-যজ্ঞের পুণ্য হত। কাজেই একটু পূজার্চনা এবং হরির নাম স্মরণ করেই পৌরাণিক গৃহস্থ কিন্তু দিনের কাজে নেমে পড়তে পারতেন। পুরনো দিনের মানুষ হলে কী হবে, পৌরাণিক গৃহস্থ কিন্তু শৌখিন কম ছিলেন

না। স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণ তাকে উপদেশ দিয়েছে ছেঁড়া কাপড় না পরতে— সদানুপহতে বস্ত্রে চ। উত্তমাঙ্গে একটি উত্তরীয় এবং অধমাঙ্গে একটি কাপড়— এই দুই খণ্ড বস্ত্রের জন্য পুরাণের দেবতা ব্রহ্মাকে কাপাস তুলো তৈরি করতে হয়েছে, যেন কাপাস গাছও ছিল না আমাদের দেশে। অবশ্য কাপাস তুলো নাকি প্রথম সৃষ্টি করতে হয়েছিল ব্রাহ্মণের পৈতে বানানোর জন্য— কার্পাসমুপবীতার্থং নির্মিতং ব্রহ্মণা পুরা। কূর্মপুরাণ বড় আশা করে বলেছে — ব্রহ্মচারী যুবক যেন রঙে না ছুপিয়ে, সাদা কাপড় পরে; আর কাঁধে যেন জড়ায় কৃষ্ণসার হরিণ-চামড়ার চাদর। কিন্তু এতে কি ব্রহ্মচারীর মন মানে? গুরুগৃহের হাজারো কাজকর্মের ফাঁকে সে যদি কোনদিন একটি নীল কাপড় পরে ফেলে তাহলেই পুরাণের গুরু ঠাকুর আদেশ দেবেন— দেখ বাপু মেয়েদের গায়ে ছোঁয়া লাগলে অথবা নীল কাপড় পরলে— স্ত্রীণামথাত্মনঃ স্পর্শে নীলীং বা পরিধায় চ— জল কিংবা ভূমি স্পর্শ করে শুদ্ধ হবে। নিয়ম ভেঙে কোনওদিন নীল-কাপড় পরলেই রঙিন কোন আকর্ষণে রসবতী রমণীর স্পর্শদোষ ঘটত কিনা— এসব বাজে খবরে আমাদের দরকার নেই, কেননা পুরাণ-গুরু গুরুগৃহে— থাকা যুবককে বলেছেন— বৎস, মেয়েদের দেখে কটাক্ষ করা, কিংবা তাদের জড়িয়ে ধরা— স্ত্রীপ্রেক্ষালম্ভনং তথা— খবরদার, খবরদার, এসব যেন কখনো কোর না— প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।

আমাদের দেশের পৌরাণিক গৃহস্থ জীবনে সব 'ডোজ'গুলিই অত্যন্ত বেমানানভাবে কড়া। কোনও অবস্থাতেই উগুম-কুগুমভাবে মানিয়ে নেবার ব্যবস্থা নেই। এই তুমি ব্রহ্মচারী আছ, তো অমুক করবে না, তমুক করবে না অর্থাৎ ব্রহ্মচারী যুবকের যা যা ভাল লাগবে, তা করবে না। গান-বাজনা নয়, নাচ নয়, তাস-পাশা নয়, এমনকী যুবকের যা কিছু সহজ ধর্ম তা সব করা বারণ। রমণীর সঙ্গে কথা বলা বারণ, কটাক্ষ বারণ। এমনকী গুরুপত্নী যুবতী হলে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পর্যন্ত বারণ— গুরুপত্নীহ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ। অথচ একই বাড়িতে, যেখানে ছাত্র-শিষ্য প্রায় পশুর মতো খাটবে, সেখানে গুরু থাকবেন রাজার মতো। তাঁর আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর আচার ব্যবহার, ক্ষমতা সবই রাজোচিত। বেশির ভাগ পুরাণ-প্রমাণে বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ গুরুর স্ত্রী থাকত একাধিক। ধর্মরক্ষার জন্য তিনি একটি সবর্ণা ব্রাহ্মণী বিবাহ করতেন বটে কিন্তু কামপূর্তির জন্য

অন্য জাতের সুন্দরী রমণী বিয়ে করে আনা ছিল তাঁদের অভ্যাস। স্বয়ং মনু এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু গুরুর সংসারে এই অসবর্ণা রমণীদের দিয়ে তাঁর কামপূর্তি হলেও, তাঁদের সম্মান বলে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ শিষ্য পর্যন্ত তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না, গুরুর স্ত্রী বলেই তাঁরা শুধু অভিবাদন লাভ করতেন মাত্র— অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ। এই যে একই গুরুগৃহের মধ্যে ভিন্নধর্মী চরম আচরণ— গুরু সব করতে পারতেন, শিষ্য স্বেচ্ছায় কিছুই পারে না— এই আচরণ বহু জায়গায় বহু জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিশেষত রমণী বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অনেক ক্ষেত্রেই শিষ্যদের রসান্বিত করে তুলত গুরুপত্নীর সঙ্গ লাভ করতে। ইন্দ্র তাই অহল্যার সর্বনাশ করেছিলেন, চন্দ্র গুরু বৃহস্পতির স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন— এ সব উদাহরণ পুরাণেই সবিস্তারে লেখা আছে। সমাজের বড় মানুষ এবং তেজী লোকের যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধিকার থাকায় সাধারণের মানসিকতা কি হত, তার একটা উদাহরণ আছে পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে।

পূর্বকালে যমের মেয়ে সুনীথা অরণ্যবাসী এক গন্ধর্ব-তপস্বীর তপস্যায় বিঘ্ন করেছিল। তপস্যা করার সময় গন্ধর্ব সুশঙ্খকে সুনীথা মাঝে মাঝেই গিয়ে খোঁচাত। এতে রেগে গিয়ে সুশঙ্খ শাপ দেন যে, সুনীথার ছেলে হবে দস্যি, পাপাচারী। সুনীথা ভয় পেলেন এবং বাবা যমকে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। যম বললেন, তুমি খুব অন্যায় করেছ, একমাত্র পরম সত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই তোমার। সুনীথা সব শুনে নির্জন বনে তপস্বিনী হলেন। নবীনা তপস্বিনীকে দেখে সুনীথার অল্পবয়েসি বন্ধুরা মনে বড় দুঃখ পেল। সখীরা খেলতে এসে তাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বনেই তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তারা বলল— কী হয়েছে তোর, এত চিন্তা কীসের? কী হয়েছে, আমাদের খুলে বল্। সুনীথা সুশঙ্খের অভিশাপের কথা বললেন। বললেন— তবুও আমার বাবা সব চেপেচুপে দেবতা, মুনি সবাইকে অনেক সাধ্যসাধনা করেছেন আমার বিয়ের জন্য। কিন্তু মুনির শাপ মাথায় রেখে কেউই আমাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কারণ পাপাচারী পুত্রের জন্ম হলে সমস্ত কুল মজবে— এই ভয়ে তাঁরা সবাই আমার বাবাকে বলেছেন— অন্য কোথাও এর বর খুঁজুনগে, যান— অন্যস্মৈ দীয়তাং গচ্ছ দৈবৈরুক্তঃ পিতা মম। সুনীথা বললেন— আমার আর কোনও উপায় নেই, তপস্যার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করা

ছাড়া। সব শুনে সুনীথার সখীরা এবার যে কথাটি বলল, সেইটেই হল তৎকালীন বাক্যবাগীশ সমাজের প্রতি যুবক-যুবতীর আসল মনোভাব। সখীরা বলল— বংশ, কুল— এসব বড় বড় কথা রাখ তো। কার বংশে দোষ নেই একটু বলবি— দেবতারাও কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়— নাস্তি কস্য কুলে দোষো দৈবৈঃ পাপং সমাশ্রিতম্। তুই কি জানিস না, স্বয়ং ব্রহ্মা একবার ভগবান শ্রীহরির সামনে ফালতু মিথ্যে কথা বলেছিল, তাতে কি সমস্ত দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছে, নাকি দেব-সমাজে তার পরম পূজ্য স্থানটি চলে গেছে— দৈবৈশ্চাপি ন হি ত্যক্তো ব্রহ্মা পূজ্যতমো' ভবৎ? সুনীথার সখীরা এবার বলল— স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের কথাটাই ধর না। ব্রহ্মহত্যার পাপ করেও দিব্যি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল শাসন করে যাচ্ছে। তাছাড়া গুরু গৌতমের প্রিয়া পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেও সেই পরস্ত্রীকামী ইন্দ্র দিব্যি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত, সবাই তাকে এখনও দেবরাজ বলেই জানে। পরস্ত্রীগমন করে তার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে কি— পরদারাভিগামী স দেবত্বে পরিবর্ত্ততে? স্বয়ং মহেশ্বর শিব ব্রহ্মহত্যার মতো পাপ করে এখনও বহাল তবিয়তে আছেন— দেবতারাও তাঁকে নমস্কার করেন, ঋষিরাও করেন— দেবা নমন্তি তং দেবম্ ঋষয়ো বেদপারগাঃ।

সুনীথার বন্ধুরা কাউকেই ছাড়লে না। তারা বলল— অন্যায় করে সূর্য দেবতার তো কুষ্ঠ রোগ ধরেছিল, তাতে কি তার সম্মান কমেছে! জগতে কার দোষ নেই বল তো? এই তো কৃষ্ণ ঠাকুর ভার্গব ঋষির শাপ ভোগ করে চলেছে। জগতের এত আহ্লাদ জন্মায় যে চাঁদ, সেও গুরুপত্নীর বিছানায় উঠে পড়েছিল। তার জন্যেই নাকি তার রাজ-যক্ষ্মা হয়ে কলাক্ষয় আরম্ভ হয়, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আবার তো সে পূর্ণিমায় জ্বল জ্বল করে তেজী হয়ে ওঠে। অত বড় মানুষ যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সেও গুরুকে মারবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিল। কাজেই বড় মানুষদের কথা আর বলিস না, সুনীথা। দোষ ছাড়া মানুষ নেই, দেখাতে পারবি না এমন বড় মানুষ, যার গায়ে নোংরার দাগ লাগেনি একটুও— বৈগুণ্যং কস্য বৈ নাস্তি কস্য নাস্তি চ লাঞ্ছনম্। সুনীথার সখীরা এবারে স্ত্রীলোকের গোপন রহস্যটি বলল। বলল— সুনীথা! যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের দোষ তো এত বড় বড়। সে আন্দাজে তোর দোষ তো এইটুকুনি! আর ছাড় তো ওসব বড় বড় কথা, মেয়েছেলের গতর আছে, তো সব আছে। রূপ আছে তো সব আছে— রূপমেব গুণঃ স্ত্রীণাং প্রথমং ভূষণং শুভে।

সুনীথার সখীরা বলল— তোকে পুরুষের মন-মজানো একটা বিদ্যা দেব। এতে দেবতা থেকে আরম্ভ করে সবাইকেই তুই মোহিত করে দিতে পারবি। সুনীথা কি বিদ্যা পেলেন জানি না, তবে যে-বিদ্যায় তাঁর কাজ হয়েছিল, সে তার রূপ। তাঁর বীণার গান শুনে আর রূপে মজে তপস্যা ছেড়ে উঠে এলেন সূর্যের মতো রূপবান ব্রাহ্মণ অঙ্গ। তিনি কাম-ক্রোধ ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনকে ধ্যান করছিলেন। সেই অবস্থায় সুনীথার রূপ-লাবণ্য দেখে তাঁর এমন মোহ হল যে, ধ্যান-জপ মাথায় উঠল। ঘেমে, কেঁপে, হাই তুলে ঋষিপুত্র অঙ্গ কেবলই সুনীথাকে কাছে পেতে চাইলেন, বিয়ে করতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, অঙ্গ বললেন— কন্যে, তুমি যা চাও তাই দেব, তোমার সঙ্গে সঙ্গমের প্রতিদান হিসেবে যা মানুষকে দেওয়া যায় না— তাও দিতে রাজি আছি— দেয়ং বাদেয়মেবাপি তস্যাঃ সঙ্গম-কারণাৎ।

পুরাণের রাজ্যে এই এক অদ্ভুত জিনিস। আমরা বলেছিলাম— গুরুগৃহের অতিরিক্ত কড়াকড়ি অনেক সময় ব্রহ্মচারী শিষ্যের মনে নানা জটিলতা তৈরি করত। ফলে অনেক সময়ে তাঁরা স্বয়ং গুরু-মার ওপরেই আসক্ত হয়ে পড়তেন এবং রুক্ষ গুরুর সংসার-ঠেলা উপবাসিনী গুরুপত্নীরাও যে স্বেচ্ছায় শিষ্যের বাহু-বন্ধনে ধরা দিতেন, তার প্রমাণও আমরা অন্য প্রবন্ধে দিয়েছি। বস্তুত পুরাণ-প্রবক্তার সমাজটি কিন্তু এক অদ্ভুত উপদেশ এবং ততোধিক বিপ্রতীপ বাস্তবতার সূত্রে বাঁধা। তাঁরা যা উপদেশ দেন, তা ঘটে না, বরঞ্চ যা ঘটে, তা থেকে কেবল আরও একটি মৌখিক উপদেশ তৈরি হয়— এমনটি কিন্তু কোর না। বিপদে পড়লেই তাঁদের ব্রহ্মশাপ আছে, প্রারব্ধ কর্ম আছে, আছে দেব-দ্বিজের কাছে অন্যায়। এই যে সুনীথা ঋষিপুত্র অঙ্গকে রূপে মজাল, পুরাণে এমনিতর কাহিনি তো হাজারো আছে। অথচ পুরাণজ্ঞ ঋষিরা সব সময়েই স্ত্রীলোকের রূপে মজতে বারণ করেছেন। আবার দেখুন ওই যে সুনীথা আর অঙ্গের মিলনে একটি ছেলে জন্মাল আমরা প্রাচীন পুরাণ থেকে আগেই তার পরিচয় দিয়েছি— তার নাম বেণ। বেণ এমনিতেই দুষ্টপ্রকৃতির ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের পুরাণ পদ্মপুরাণে বেণকে দুষ্ট প্রমাণ করার জন্য প্রথমে তো সুশঙ্খ ঋষির শাপ লেগেছে। কিন্তু সে শাপ সত্ত্বেও বেণ নাকি ভালই ছিলেন, এমনকী বেশ ধর্মপ্রাণ। কিন্তু এইবার বেণের গায়ে লাগল পদ্মপুরাণের নিজের কালের হাওয়া। সে আমলে জৈনধর্মের প্রকোপ বেড়েছিল অতএব পদ্মপুরাণে

ঋষির শাপে এবং কালবশে জৈনরা এসে উপস্থিত হল ধর্মানুরাগী বেণের রাজসভায়। বেণ মহারাজ তাঁদের ধর্ম এবং দার্শনিক প্রস্তাব শুনে পাপাচারী হলেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি উচ্ছন্নে গেল।

ব্যাপারটা এইরকমই। পৌরাণিকের নিজের কালের হাওয়া সব সময় লেগেছে তাঁর কালের পুরনো গল্পে। ফলে পুরনো, আরও পুরনো কালের বৃত্তান্ত বিভিন্ন পুরাণকারের কালের গন্ধে নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে। তবে একটি বাপারে সর্বত্র বড় মিল, সে রমণী। আমার এক নতুন পরিচিত বন্ধু আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন— তোমরা যে সব সময় প্রাচীন ভারতের তাবৎ রমণী-কুলের ওপর পুরুষ মানুষের অত্যাচার দেখতে পাও, তাই নিয়ে আবার প্রবন্ধ লেখ— এ ভারী অন্যায়। আমি বললুম— কেন, কেন, এই তো গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, তুমি বললে তো হবে না। প্রাচীন ঋষি, মুনি, নাগরিকেরা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিই না বলেছেন— নরকের দ্বার থেকে আরম্ভ করে ছলা-কলার সবচেয়ে বড় যন্ত্র। বন্ধুবর বললেন— রাখো তোমার গবেষণা। প্রাচীন ভারতের পুরাণ-ইতিহাসের বৃত্তান্ত থেকে এইটেই প্রমাণ হবে যে, মেয়েরাই ছিল বেশি শক্তিশালী, তারাই ছেলেদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত এবং প্রচুর রজ্জু-ভ্রমণের পর ছেলেরা বলত— মাগী ছলাকলায় আমাকে ভুলিয়ে এতকাল ঘুরিয়েছে, আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রূপের নেশায় আমি ছিলাম নাচার। অতএব শুন ভাই সাধু, তোমরা মেয়েছেলে দেখে ভুলো না, নারী নরকের দ্বার। পুরুষ শুনত এবং আবাব ভুলত।

বন্ধুর কথা শুনে আমি ভাগবত পুরাণের কলিকালের বর্ণনা স্মরণ করলাম। আমি বললাম— ধুর, আপনি যা বলছেন, সে সব ঘটবে কলিকালে। ঋষিরা বলেছেন— কলিকালে পুরুষেরা হবে সব মেনিমুখো স্ত্রৈণ— দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ। কলির পুরুষেরা সব বাপ-ভাই ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে— পিতৃ-ভ্রাতৃ-সুহৃদ্-জ্ঞাতীন্ হিত্বা— বউয়ের আঁচল ধরে শুধু শালা-শালীর খোঁজ নিয়ে বেড়াবে— ননান্দৃ-শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ। বন্ধু বললেন— বেড়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আপনার ঋষি। কেন, দ্বাপর-ত্রেতার চেহারাটা কি অন্যরকম ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো দ্বাপর যুগের পুরুষেরা কি শালা-শালীর খবরই রাখতেন না। মনে করতে পারেন কি— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহামতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর প্রথম এবং প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

গাণ্ডীবধারী ভাই অর্জুনও নয়, গদাধরী ভাই ভীমও নয়। সেনাপতি ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের এক শালা ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাছাড়া বিরাট-রাজার শালা কীচকের প্রতি বিরাট রাজার কিরকম প্রীতি ছিল, অর্জুনের শালা কৃষ্ণের ওপর অর্জুনের কীরকম গদ্গদ ভাব ছিল, সেটাও কি বলে দিতে হবে! আর কথা বাড়াবেন না। এত বড় মানুষ, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুটা পর্যন্ত বাবার বাড়িতে মানুষ হয়নি, হয়েছে তার মামা-বাড়িতে। কেন হস্তিনাপুরে কি আর পাঁচটা ছেলে মানুষ হয়নি, তার বাপেরা মানুষ হয়নি। যাই বলুন, এও শালা-প্রীতি। আর কথা বাড়াবেন না।

আমি আর কথা বাড়াইনি। ভাবলাম শালা-শালীর কথাটা ও যুগেও সত্যি হতে পারে। কিন্তু স্ত্রৈণতা? কিংবা ভাগবত পুরাণ যে বলেছে— কলিকালে শুধু কামনার কারণেই মেয়েদের সঙ্গে মিশবে পুরুষেরা— সৌরতসৌহৃদাঃ— এ ব্যাপারটা? মনে মনে ভেবে প্রমাদ গনলাম। বিভিন্ন পুরাণে পাতায় পাতায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা এবং কাম-লোভ বর্জিত মুনিদের স্ত্রীসঙ্গ পাবার জন্য যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, তা ভাবতে ভয় করে। আর তাঁদের কামনা জানাবার যে ভাষা, সে ভাষার মধ্যে ভালবাসার কোনও ব্যঞ্জনা নেই, আছে শুধু রমণীর প্রত্যঙ্গ-স্তুতির সঙ্গে দুর্বার সঙ্গমেচ্ছা— সে ভাষা আর উচ্চারণ করে কলিকালের কচি-কাঁচাদের পাকিয়ে তুলতে চাই না। কবিবর যে লিখেছিলেন— 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল'— এ শুধু উর্বশীর একার ক্ষমতা নয়, পুরাণ কাহিনিতে যে কোনও রমণীর রূপ দেখে কাম-গন্ধহীন মহাপুরুষেরাও মুহূর্তে কামোন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। কাজেই শুধুমাত্র যৌন সম্বন্ধের ইচ্ছাতেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশামেশি— এ কিন্তু যতখানি পৌরাণিক যুগের বৈশিষ্ট্য, কলিকালের ততটা নয়। পুরাণকারেরা তাঁদের কালের দুষ্কর্মগুলি চাপিয়ে দিয়েছেন কলিকালের কাঁধে।

এই যে উর্বশীর কথা বললাম, সে তো স্বর্গের বেশ্যা বলে পরিচিত। স্বর্গের বেশ্যা মানেই কিন্তু তার রূপ, যৌবন, ক্ষমতা— কোনওটাই সাধারণ বেশ্যার মতো নয়। বিশেষত 'কালচার', বিদগ্ধতা, শিক্ষা— এ সব গুণ তখন শুধু গণিকাদেরই থাকত। তার ওপরে উর্বশী হলেন, স্বর্গের বেশ্যা, তার খানদানই আলাদা। পুরাণগুলির মধ্যে উর্বশীকে একাধিকবার পাঠানো হচ্ছে শুধু ইন্দ্রিয় সংযত সিদ্ধবর্গের সুপ্ত কামনায় সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য। আর কী আশ্চর্য,

তিনি সব সময়ই সফল। এই যে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশ, যে বংশের অধস্তন কৌরব-পাণ্ডবেরা কত পুরাকীর্তি স্থাপন করে গেলেন, ভাবতে পারেন, সে বংশের মূলেও বংশ বংশ ধরে রমণী-দর্শনমাত্রে কাম-সম্বন্ধ ঘটেছে। ভাবতে পারেন সে বংশের এক মহদ্ গ্রন্থিতেও জড়িয়ে আছেন স্বর্গ-বেশ্যা উর্বশী। চন্দ্রবংশের প্রথম পুরুষ চন্দ্র শুধু গুরুপত্নীকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি। গুরুপত্নীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র হয়েছিল এবং সে পুত্র সুস্থ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও ধর্ষণজাত এই পুত্রটির সামাজিক স্বীকৃতি পুরাণগুলিতে লেখা হয়েছে নক্ষত্র-জন্মের প্রতীকে, তবু গুরু বৃহস্পতির সামনেই তাঁর স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা স্ত্রী একটুও বলতে লজ্জাবোধ করেননি যে, তাঁর পুত্র বুধ ধর্ষণকারী চন্দ্রের জাতক। আবার পরবর্তী সময়ে বুধ যখন এক রমণীকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করেছেন, তখন তিনি নিজের কুল পরিচয় দিচ্ছেন বৃহস্পতির ছেলে বলে— পিতা মে ব্রাহ্মণাধিপঃ।

কাজেই দেখুন ভাগবত পুরাণ যে বলেছিল— সঙ্গম বাসনাতেই কলিকালে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশি করবে লোকেরা, সে 'ট্র্যাডিশন' বহু কালের। চন্দ্র তো গুরুপত্নীর গর্ভে বুধের জন্ম দিলেন, কিন্তু বুধ কী করলেন? তিনি মোহিত হয়েছিলেন এমন এক মহিলা দেখে, যে মহিলা পূর্বে পুরুষ ছিলেন। পুরাকালে 'সেক্স-চেঞ্জ' করার কোনও শৈলী বা শৈল চিকিৎসা চালু ছিল কিনা জানি না, কিন্তু মনুর ছেলে ইল রাজা মহাদেব আর পার্বতীর ক্রীড়াকানন শরবনে ঢুকে স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। মহাদেব নাকি এই নিয়ম করেছিলেন যে, পুরুষ মানুষ তাঁর বিহারস্থানে ঢুকলেই মেয়ে হয়ে যাবে। মহারাজ তাই মেয়ে হয়ে গেলেন, তাঁর নাম হল ইলা। মৎস্য পুরাণ লিখেছে মেয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্তন যুগল হয়ে উঠল পীনোন্নত, জঘনদেশও তাই— সাভবন্নারী পীনোন্নতঘনস্তনী। চাঁদের মতো মুখে এল বিলোল কটাক্ষ; ইলার দেহে এল আরও সব অস্ত্র, যা রমণীর দেহ-তূণে থাকে। রমণী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইলার মনে হল— কেই বা আমার বাবা, কেই বা মা, কোন স্বামীর হাতেই বা আমি পড়ব? এত সব চিন্তা করতে করতে মোহময়ী রমণী যখন নির্জন বনপথে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকল, তখনই চোখে পড়ে গেল চন্দ্রপুত্র বুধের। এই মুহূর্তে মৎস্য পুরাণের ভাষা হল— রমণীকে দেখামাত্র বুধের মন জর্জরিত হয়ে উঠল এবং তিনি কামপীড়িত হয়ে, কি করে এই রমণীকে লাভ করা যায়

সেই উপায়ে মন দিলেন— বুধঃ তদাপ্তয়ে যত্নম্ অকরোৎ কামপীড়িতঃ। এর পরেই বুধের ব্রাহ্মণবেশ। ইলার হঠাৎ স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তিতে থতমত ভাবটা তিনি জানতেন বলে কৌশল করে আচমকা তাকে বললেন— আমার অগ্নিহোত্রের কাজকর্ম ফেলে কোথায় পালিয়েছিলে, সুন্দরী। এখন সন্ধে হল, এই তো রমণীয় বিহারের সময়— ইয়ং সায়ন্তনী বেলা বিহারস্যেহ বর্ত্ততে। তুমি ঘরদোর মুক্ত করে ফুল-সজ্জা কর আমার ঘরে। আর কি, ইলা বুধের মায়া-ভবনে ঢুকলেন। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল রসে, রমণে— রেমে চ সা তেন সমম্ অতিকালম্ ইলা ততঃ।

তাহলে ভাগবত পুরাণের কলিকালের ভবিষ্যদ্‌বাণী খাটল গিয়ে অতীত কালে। চন্দ্র গেল, বুধ গেল, তার ছেলে পুরূরবাও মুগ্ধ হলেন স্বর্গ-সুন্দরী উর্বশীকে দেখে। ভাগবত পুরাণের মন্তব্য বিরুদ্ধভাবে সপ্রমাণ করার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণের টিপ্পনীটা বজায় রাখব। বলব— দুজনে দুজনকে দেখা মাত্রই মোহিত হলেন। বিশেষত রাজা, যাঁর পক্ষে অন্য দরকারি কাজ ফেলে রাখা চলে না, তিনি সব বাদ দিয়ে প্রগল্‌ভতায় ভরপুর উর্বশীকে বললেন— সুভ্রু, আমি কামনা করি তোমাকে— ত্বামভিকামো স্মি। তাই আশা করব তুমিও অনুরাগ উপহার দেবে আমাকে। পুরূরবা এবং এই স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর ব্যাপার পারস্পরিক কামনার ব্যাপার যাই থাকুক, একথা কিন্তু মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের উপন্যাস, নাটক বা রোমান্টিক প্রেমের আরম্ভবিন্দু হল এই পুরূরবা-উর্বশীর মিলন কাহিনি, যে কাহিনির আরম্ভ ঋগ্‌বেদে এবং পরিণতি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে আমি অল্পক্ষণের জন্য মৎস্যপুরাণ স্মরণ করব, কারণ অন্যান্য পুরাণের চেয়ে মৎস্যপুরাণের কাহিনিতেই রোমান্টিকতার সুবাস লেগেছে বেশি।

দানবরাজ কেশী স্বর্গ আক্রমণ করে স্বর্গের শোভা উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পুরূরবার চোখে পড়েন। বহুবার স্বর্গে যাতায়াত করার ফলে পুরূরবা উর্বশীকে চিনতেন এবং উর্বশীকে হারালে স্বর্গের কী ক্ষতি হবে, দেবরাজের মন কতটা ভেঙে পড়বে তাও তিনি বুঝতেন। পুরূরবা মাঝপথে কেশীকে আক্রমণ করে উর্বশীকে তুলে নিয়ে পৌঁছে দেন দেবরাজের কাছে। কৃতজ্ঞ দেবরাজের সঙ্গে পুরূরবার বন্ধুত্ব আরও বেড়ে যায়। উর্বশী উদ্ধারে সমস্ত দেবতারাও দারুণ খুশি। এমন একটা ঘটনা 'সেলিব্রেট' করার জন্য

স্বর্গমঞ্চে একটি নাটক করার কথা হল, যার নাম লক্ষ্মীস্বয়ংবর, পরিচালক স্বনামধন্য নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি। বহু নাটকের নায়িকা উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করছিল। প্রথম থেকেই নাটকের যেখানে সেখানে সে পুরূরবার কীর্তিকথা গান করতে থাকে, এবং স্বয়ং পুরূরবা তখন দর্শকাসনে উপবিষ্ট। পরিচালক ভরতমুনি তবুও কিছু বলেননি। কিন্তু এবার মেনকা রম্ভা এবং উর্বশীর নেচে নেচে গান করবার কথা। পুরূরবাকে দেখে নৃত্যপরা উর্বশী ভরতমুনির শেখানো লক্ষ্মীস্বয়ংবরের পার্ট ভুলে গেল। নেমে আসল অভিশাপ, বিজন বনে লতা হয়ে থাকার অভিশাপ।

কালিদাস এই অভিশাপকে কাজে লাগিয়েছেন কবিকল্পে, উর্বশীর জন্য বিরহী পুরূরবার বিলাপে। কিন্তু আমরা জানি উর্বশীর ওপর আবও একটা অভিশাপ ছিল, যা তাকে সাহায্য করেছিল পুরূরবাকে পেতে। মিত্র আর বরুণ— এই যমজ দেবতা বদরিকাশ্রমে বসে তপস্যা করছিলেন। সেই অবস্থায় আশ্রমের বাগান থেকে নানা ভঙ্গিতে ফুল তোলা আরম্ভ করল উর্বশী। প্ররোচনার জন্য যথেষ্ট ছিল উর্বশীর অঙ্গে জড়ানো রাঙা বসনখানি। বসনের সূক্ষ্মতায় উর্বশীব দেহ-সৌষ্ঠব এমন এক স্ফুটাস্ফুট সীমারেখায় এসে পৌঁছেছিল যে তপস্যারত দুই দেবতা আর তাকে না দেখে পারছিলেন না— সুসূক্ষ্মরক্তবসনা তয়োর্দৃষ্টিপথং গতা। ফলে ভাগবত পুরাণের কলিকাল মিথ্যা করে দুই দেবতা মোহিত হলেন এবং তাঁদের তেজ পতিত হল ত্রেতা কিংবা দ্বাপরযুগের তপস্যার আসনে— তপস্যতো স্তয়োর্বীর্যম্ অস্খলচ্চ মৃগাসনে। মৎস্যপুরাণ লিখেছে— দুই দেবতাই পরস্পরের শাপভয়ে নিজেদের সামলালেন বটে কিন্তু উর্বশীর ওপরে শাপের কথাটা এখানে পুরাণ বলেনি। বিষ্ণুপুরাণ কিংবা বায়ুপুরাণে দেখছি মিত্রাবরুণের শাপের কথা উর্বশীর মনে আছে এবং বিদগ্ধা রমণী ভাবছে— শাপের ফলে যখন মর্ত্যলোকেই বাস করতে হবে, তবে সেই মর্ত্যরাজা পুরূরবার সঙ্গেই থাকব। বিষ্ণুপুরাণ লিখেছে পুরূরবাকে দেখেই উর্বশী তার স্বর্গের অহংকারে জলাঞ্জলি দিয়ে সমস্ত স্বর্গসুখ পায়ে ঠেলে— অপহায় মানম্, অপাস্য স্বর্গসুখাভিলাষং— উর্বশী আত্মনিবেদন করল রাজার কাছে। আর পুরূরবা। তিন ভুবনের সেরা স্বর্গসুন্দরীর রূপ, বিলাস আর হাসি দেখে মুগ্ধ পুরূরবা বললেন— আমি তোমাকেই চাই— ত্বাম্ অভিকামো'স্মি। লজ্জায় যেন নুয়ে পড়ে স্বর্গের গণিকা জবাব দিল— থাকতে পারি তোমার

সঙ্গে, কিন্তু শর্ত আছে। মোহিত রাজা তখন যে কোনও শর্তেই রাজি। উর্বশী বলল— আমার বিছানার কাছে দুটি মেষ-শাবক থাকবে, যাদের আমি ভালবেসে পালন করি; ও দুটিকে কখনও সরানো চলবে না। দ্বিতীয় শর্তে উর্বশী বলল— মহারাজ! আমি যেন আপনাকে কখনও উলঙ্গ না দেখি— ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ। স্বর্গের সংস্কৃতিতে এই হয়তো বিদগ্ধা মহিলার রুচি কিন্তু মৎস্যপুরাণ বিপদ বুঝে উর্বশীকে শুধরে দিয়ে বলেছে— মহারাজ! মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য সময় যেন আপনাকে নগ্ন না দেখি— অনগ্নদর্শনঞ্চৈব অকামাৎ সহ মৈথুনম্। উর্বশীর তৃতীয় শর্ত ছিল, যতদিন সে রাজার কাছে থাকবে, ততদিন তার আহার হবে শুধু ঘি— ঘৃতমাত্রং তথাহারঃ।

শুধুমাত্র ঘি খেয়ে জীবনধারণ! এ আমরা কলিকালের লোকেরা হয়তো ভাবতে পারব না, কিন্তু পুরাণের অঙ্কে রাজা নাকি ভোগে, সুখে উর্বশীর সঙ্গে ষাট হাজার বছর কাটিয়েছিলেন। আর মাটির রাজার রতিসুখে উর্বশী, স্বর্গবেশ্যা উর্বশী নাকি ভেবেছিল— ছাই অমন স্বর্গের সুখে, আর স্বর্গে ফিরে যাব না— প্রতিদিন-প্রবর্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসে'পি ন স্পৃহাং চকার। এর পরের সব ঘটনা আর ব্যক্ত করতে চাই না। মোট কথা স্বর্গের চাতুরিতে উর্বশী রাজাকে উলঙ্গ দেখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও রাজার প্রেমের টানে উর্বশীকে প্রতি বছরে এক রাত অন্তত পুরূরবার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে হত।

আমি অবশ্য এখানে পুরূরবা-উর্বশীর প্রেমকাহিনি শোনাতে বসিনি। আমি চন্দ্রবংশের তিন মূল পুরুষের কাহিনি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সুন্দরী রমণীর দর্শনমাত্রেই পুরুষের যে বাঁধ-ভাঙা উন্মাদনা, সে যদি কলিকালেও সত্যি হয়, তবে তা দ্বাপর-ত্রেতাতে আরও বেশি সত্যি, কারণ কলিকালের ভদ্রলোকেরা যা করে, রয়ে সয়ে করে, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনিতে হঠাৎ করেই, অথবা যাচ্ছেতাইভাবে সবই করা যেত। দেখামাত্রই সেখানে স্পৃহা এবং স্পৃহামাত্রই চ্যুতি, ধৈর্যচ্যুতি থেকে আরম্ভ করে সর্বচ্যুতি। আসল কথা মানুষের মূল চরিত্র কখনওই প্রায় বেশি পরিবর্তিত হয় না। পুরাণকারেরা ঘোর কলি বলে যা যা বলেছেন, তা সব তাঁদের কালেও একভাবে ছিল। অন্যদেশীয় চালে কথাবার্তা বলা আধুনিক বিনোদিনীকে নাই বা দেখলেন তাঁরা, কিন্তু হালকা কাপড়-পরা উর্বশী-রম্ভাই বা কম কীসে? বড় ঘরের অতিযৌবনা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শীর্ণকায় সাধারণ মানুষের প্রেম দেখলে, আমরা যেমন সন্দপন্দে

দিই— দেখ্ ভাই, এ সব বস্তু আমাদের জন্যে নয়, এদের জন্যে তৈরি বরপুরুষ আছে অন্য জায়গায়, আমাদের মতো সাধারণ ঘরে নয়, তেমনি সে যুগের কবিরাও রব তুলেছেন— আরে, রম্ভার মতো স্বর্গসুন্দরীর সঙ্গে সম্ভোগ করতে কত ক্ষমতা লাগে, সে জানেন শুধু দেবরাজ। যারা সব সময় ছোঁক ছোঁক করছে, এই সব চেড়ির মতো বিটলে পুরুষেরা কি ক্ষমতায় বুঝবে স্বর্গসুন্দরীব স্বাদ— ঘটচেটীবিটঃ কিংস্বিদ্ জানাত্যমরকামিনীম্।

আমাদের বলা পুরাণকাহিনির এই সব নমুনা থেকে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে, সেকালে কোনও সজ্জন পুরুষ ছিলেন না, ছিলেন না সতী-সাধ্বী মহিলারা। ববঞ্চ তাঁরা এতই ছিলেন এবং এতকালের সমস্ত আলোচনায় তাঁরা এত বিপুলভাবেই সংবর্ধিত হয়েছেন যে, আলাদা করে এই মুহূর্তে তাঁদের স্মরণ করার প্রয়োজন বুঝি না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে, সেকালের দুনিয়াটা যদি শুধু সাধু, সজ্জন আব সাধ্বী মহিলায় ভরা থাকত, তাহলে সমাজটা স্থাণু হয়ে যেত। আমি বলতে চেয়েছি, কলিকালের সব দোষই কোনও না কোনওভাবে পৌরাণিক সমাজেও ছিল এবং সে সমাজটাও ছিল ভাল-মন্দে সচল। শুধু বড় ঘরের মেয়ে সম্বন্ধে কৌতূহলই নয়, শুধু পছন্দসই মেয়ে দেখামাত্রই স্পৃহালুতা নয়, বিদগ্ধা সুন্দরীব হালকা প্ররোচনামূলক পরিধানই নয়, সে কালের অনেক কিছুর মধ্যেই পাব কলিকালের আধুনিক চলন-বলনের ভঙ্গি, যদিও সে ভঙ্গি পুরাতন সরল সমাজে অবশ্যই অন্যরকম। কিন্তু তাঁরা জানতেন, সবই জানতেন। প্রাক্‌বিবাহ পর্বে প্রেম করাও জানতেন, লুকিয়ে দেখা করাও জানতেন, আবার বিয়ের পর 'হনিমুনে' যাওয়ার কথাটাও জানতেন। তবে হ্যাঁ বিয়ের আগে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সুবিধে ছিল অনেক বেশি। শত শত কুঞ্জ বন আর রেবা-নর্মদার তীরভূমি ছেড়েই দিলাম, ছেড়েই দিলাম ভাঙা দেউল আর হাজারো নির্জন স্থান। স্বয়ং কৃষ্ণ ঠাকুর যে জায়গাটি দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রেম করার জন্য, সে জায়গার হদিশ পেলে আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রমাদ গুনবেন। নররূপী ভগবান কৃষ্ণ সহস্র প্রেমিকাকে সুখী করার জন্য শ্মশানে নিয়ে গেছেন নির্জনে রসাস্বাদন করতে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই পৌরাণিক ক্ষেত্রটি আধুনিক প্রেমিক-প্রেমিকারা স্মরণে রাখতে পারেন, কেননা আধুনিক জনসংকুল শহরগুলিতে শ্মশান জায়গাটিতে অন্যলোকের ভিড় থাকলেও নেহাত আপনার আত্মীয়-গুরুজন

গতায়ু না হলে ধরা পড়ার কোনও ভয় নেই। বিয়ের পরে যে 'হনিমুন', তারও কিছু নমুনা পাওয়া যাবে পুরাণে। সেই যে পুরূরবা, তিনি উর্বশীকে বিয়ে করে কত জায়গায় ঘুরেছিলেন জানেন? কখনও চৈত্ররথ বনের মতো 'রিজার্ভ ফরেস্ট', কখনও মন্দাকিনীর তীরে, কখনও কামনার মোক্ষধাম অলকায় কখনও ঐতিহাসিক নগরী বিশালায়— অলকায়াং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে। রাজার ভ্রমণসূচিতে গন্ধমাদন পাহাড়ের নিম্নভূমি কিংবা নাম করা 'হিল-স্টেশন' মেরুশৃঙ্গও বাদ যায়নি। বাদ যায়নি দূরপাল্লার দেশ উত্তর কুরু কিংবা ছায়া-সুনিবিড় কলাপ গ্রাম। এই সব জায়গায় রাজা উর্বশীকে নিয়ে পরম সুখে রমণ করেছেন— উর্বশ্যা সহিতো রাজা রেমে পরময়া মুদা।

পরাশর বলেছিলেন— কলিকালের বিয়ে-করা বউরা যদি একটুও অনাদর পায় তাহলে নাকি তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে অনায়াসে স্বামীদের কথা উড়িয়ে দেবে— উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃ কণ্ডুয়নং স্ত্রিয়ঃ। কুর্বন্ত্যো গুরুভর্তৄণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ।। আহা, পরাশর-ব্যাসের যুগে বোধ হয় অনাদর পেলে মেয়েরা যেন সব স্বামীদের মাথায় তুলে চুমো খেত। সেই যযাতি রাজা ক্ষণিকের কামনায় ভুলে শর্মিষ্ঠার একটু গর্ভ উৎপাদন করেছিলেন বলে (যা সে যুগের নিরিখে এমন কিছু অপকর্ম নয়) তাঁর নিজের স্ত্রী দেবযানী বাবাকে বলে তাঁর দেহে হাজার বছরের বার্ধক্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। বোকা যযাতি জানতেন না যে, সমস্ত পুরাণগুলি একযোগে ব্যবস্থা দিয়েছে যে শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতার মতো, গুরু-গুরুপত্নীর মতো সম্মান করবে। তাও আবার দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মতো ক্ষমতাবান শ্বশুর। যযাতি শ্বশুরের কথা শোনেননি, তার ফলও ভোগ করেছেন।

তবে এও মানতে হবে এই শুক্রাচার্য পুরাণগুলির মধ্যে এক বিচিত্র চরিত্র। আমাদের বিশ্বাস সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজে শুক্রাচার্যের মতো ব্রাহ্মণ আরও অনেকেই ছিলেন, যদিও তাঁর চরিত্রটি পুরাণ-কথিত ব্রাহ্মণ-সমাজের আচরণীয় চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। যেমন ধরুন ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা পান একেবারে বারণ। এমনকী যে ব্রাহ্মণ সুরা পান করে ফেলেছেন তাঁকে শাস্ত্রমতে দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। শাস্ত্রীয় শাস্তির বহর থেকেই বুঝি মদ্যপানের অপরাধ তখনকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই করতেন। আমাদের শুক্রাচার্য কিন্তু ভালরকম মদ্যপান অভ্যেস করেছিলেন। স্বয়ং ভগবান

বিভূতিযোগে নিজেকে শুক্রাচার্যের মতো পণ্ডিত বলে কল্পনা করেছেন, অথচ অসুরগুরু হওয়ার সুবাদে প্রতিদিনই সেই পণ্ডিতের মদ না হলে চলত না। এই অভ্যাস ছিল বলেই অসুরেরা একদিন বৃহস্পতি-পুত্র কচকে পুড়িয়ে গুঁড়ো করে তাঁর পানপাত্রে মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং শুক্রাচার্য প্রেমানন্দে সেই মদ পান করে কচকে গলাধঃকরণ করেছিলেন। কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে গুরুর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আবার শুক্রাচার্যকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু মদ খেয়ে তাঁর কি অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থাটার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন পুরাণকার। মৎস্যপুরাণ লিখেছে তিনি অসুরদের প্রবঞ্চনায় মদ খেয়ে একেবারে মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন— সুরাপানাদ্ বঞ্চনং প্রাপয়িত্বা, সংজ্ঞানাশং চেতসশ্চাপি ঘোরম্। পুরাণকার শেষ পর্যন্ত এক কৌশল করেছেন। ব্রাহ্মণের যেহেতু মদ খাওয়া বারণ এবং শুক্রাচার্য যেহেতু মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছেন, অতএব পরবর্তী সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে বাঁচানোর জন্য মৎস্যপুরাণ বলেছে যে, শুক্রাচার্যই রেগে-মেগে নিয়ম করলেন— ব্রাহ্মণের পক্ষে এর পর থেকে সুরাপান নিষিদ্ধ হল। যেন তার পরে আর কোনও ব্রাহ্মণ সুরাপান করেনি।

পুরাণগুলিতে আপ্ত মুনি-ঋষিদের উপদেশাবলি শুনলে মনে হবে যে, সেকালের আর্যপুরুষেরা ছল, জুয়োচুরি, রাহাজানি এসব কিছুই যেন জানতেন না। কিন্তু এক এই শুক্রাচার্যের কাহিনিতেই এই সমস্ত অপরাধের অনেকগুলি উদাহরণ পাব। এমনকী শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত দেবসমাজ, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও এই ছলনায় এমনভাবে অংশ নিয়েছিলেন যে, আজকাল হিন্দি সিনেমার অনেক চিত্রাংশ এই কাহিনির কাছে ঋণী থাকবে। দেবতা আর তাঁদের সৎভাই দৈত্যদের যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন প্রায়ই লেগে ছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য আরও সিদ্ধাই পাওয়ার জন্য ধূম্রব্রত পালন করে মহাদেবের তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বভাবতই প্রমাদ গনলেন। কিন্তু বিপদ-মুক্তির জন্য বড় ঘরের ব্যবসাদারের মতো তিনি কাজে লাগালেন নিজের মেয়ে জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর উদ্দেশে পিতার উপদেশ ছিল— শুক্রাচার্যকে হাত করতে হবে তোমায়— গচ্ছ সংসাধয়স্বৈনম্। তাঁর মনে যেমনটি চায় সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের উপচারে সেবা করতে হবে তোমায়। জয়ন্তী গেলেন। প্রথমে মধুর কথা, সেবার ইচ্ছে দিয়ে কাজ আরম্ভ হল, পরে তপঃক্লান্ত মুনির গা-হাত-পা টিপে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শসুখও দিতে থাকলেন জয়ন্তী— গাত্রসংবাহনৈঃ কালে সেবমানা ত্বচঃ সুখৈঃ— শুক্র কিন্তু তপস্যা

ছাড়েননি, মহাদেবের বরলাভও সম্ভব হল তার ফলে। জয়ন্তী ততদিনে শুক্রাচার্যের প্রেমে পড়ে গেছেন। বরলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্র ফিরে তাকিয়েছেন জয়ন্তীর দিকে। বললেন— তুমি কে, কি চাও, কেনই বা এত কষ্ট করছ আমার জন্যে, তোমার ভালবাসায় আমি খুশি, বল কি চাই— স্নেহেন চৈব সুশ্রোণি প্রীতোঽস্মি বরবর্ণিনি। শুক্রের কথা শুনে সলজ্জে জয়ন্তী বললেন— আমার মনে কি আছে, তা তুমি ধ্যানযোগেই জেনে নাও, মুনি— তপসা জ্ঞাতুমর্হসি। আমি বলতে পারব না।

জয়ন্তী পুরো দশ বছর শুক্রচার্যের সঙ্গে বিহার করতে চেয়েছিলেন। এতকাল তপস্যার পরিশ্রমের পর এমন মধুর নিবেদন শুনে শুক্র সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। বললেন— 'এবমস্তু' সুন্দরী, আমাদের ঘরে চল। পুরাণকার লিখেছেন— তারপর শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে বিয়ে করে দশ বছর ধরে মায়াবৃত হয়ে সকলের অদৃশ্য হয়ে থাকলেন— অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাম্। আমরা জানি— নিয়মব্রতে এতকাল উপবাসী শুক্রাচার্য প্রায়ই আর ঘরের দরজা খোলেননি। তবে এই দশ বছরে অদৃশ্য থাকার ফল হল পুরাণের অন্যতমা নায়িকা দেবযানীর জন্ম— সময়ান্তে দেবযানী তদোৎপন্না ইতি শ্রুতিঃ।

কিন্তু আসল মাথাব্যথাটা দেবযানীর জন্ম নিয়ে নয়। অসুরেরা শুনেছিল, তাদের গুরু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু বাড়ি গিয়ে তারা তাঁকে পেল না। মায়া-ফায়ার ব্যাপার যে কিছু ছিল না তা কিন্তু পুরাণের একটা খবর শুনেই বোঝা যায়। পুরাণ লিখেছে, মায়াবৃত গুরুকে দেখতে না পেয়ে তাঁর ভাবগতিক বুঝে— লক্ষণং তস্য তদ্ বুধ্বা— অসুরেরা ফিরে এল। এই যে 'ভাবগতিকের' ব্যাপারটা— এটা শুক্রাচার্যের ক্ষেত্রে বড় বেশি সত্যি। তিনি বড্ড মেজাজী মানুষ; তিনি ইচ্ছে করেছেন দশ বছর ফুর্তিতে কাটাবেন, অতএব কারও সাধ্য হবে না, তাঁকে ফেরাবে। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন শত্রুপক্ষের ছেলে কচকে বিদ্যা শেখাবেন, সেখানে অসুরদের হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি টলেননি। অসুর গুরু শুক্রাচার্যের মধ্যে এই খাঁটি ব্যাপারটা ছিল, তাঁর পাঠশালাতে এখনকার ছাত্রদের নিয়মে পাঁঠার ইচ্ছেয় কালীপুজো হত না, যা দেবসমাজে হত। যেমন অসুর গুরুর দশ বছরের নেশা বুঝেই ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে পাঠালেন কার্যসিদ্ধি করতে। দেবগুরু নির্দ্বিধায় চলে এলেন অসুরদের ছলনা করার জন্য। পুরাণকারও পরমানন্দে জানালেন— বোকা

অসুরেরা কীভাবে ছলিত হল। কিন্তু আমাদের ধারণা দেবসমাজের বিরুদ্ধপক্ষে থাকতে হত বলেই যা কিছুই অসুরদের আয়ত্ত করতে হয়েছে, তা নিষ্ঠাভরেই আয়ত্ত করতে হয়েছে। ছলনা ব্যাপারটা তাদের শুক্রাচার্যের পাঠক্রমে ছিল না বলেই তারা দেবগুরুর ছলনা বুঝতে পারল না। দেবগুরু শুক্রাচার্যের বেশ ধরে এলেন এবং অসুরদের পটিয়ে-পাটিয়ে উলটো বিদ্যা শেখাতে থাকলেন।

এদিকে দশ বছর শেষ হয়েছে। স্ত্রী জয়ন্তীকে বিদায় জানিয়ে শুক্রাচার্য উপস্থিত হলেন তাঁর যজমান, ভক্ত অসুরদের কাছে। শুক্রাচার্য এসে দেখলেন দেবগুরু তাঁর অনুপস্থিতিতে আসর জমিয়ে নিয়েছেন এবং অসুরেরা কিছুই বুঝতে পারছে না, শুধু প্রতারিত হচ্ছে। দৈত্যগুরু হাঁক দিয়ে বললেন— তোরা করেছিস কী? আমি হলাম শুক্রাচার্য, আমিই তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে এসেছি। অসুরেরা একবার এদিক তাকায় ওদিক তাকায়, কিন্তু কিছুতেই বোঝে না, কোনটা আসল শুক্রাচার্য। শুক্র বললেন— ওরে আমিই তোদের গুরু, কবির কবি শুক্রাচার্য। আর এই যাকে দেখছিস, ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি। তোরা আমার পথে আয়; বঞ্চিত না হতে চাস তো বৃহস্পতিকে ত্যাগ কর। অসুরেরা আবার তাকিতুকি শুরু করল, কিন্তু আসল শুক্র আর নকল শুক্রের মধ্যে কোনও তফাত বুঝতে পারল না। ঠিক এই সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি কী করলেন জানেন! তিনি শুক্রাচার্যের মেজাজ নিয়ে বললেন— ভাই সব, আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য। আর এই যে আজকে যিনি উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছেন— ইনিই আসলে দেবগুরু বৃহস্পতি, শুক্রাচার্যের রূপে আমাদের সবাইকে প্রতারণা করতে চাইছেন। বৃহস্পতির প্রত্যয়-মাখানো কথা শুনে অসুরেরা পুরো দেহাতি কায়দায় বৃহস্পতির দিকে আঙুল দেখিয়ে শুক্রকে বলল— ইনিই আমাদের দশ বছর ধরে শিক্ষা দিচ্ছেন, ইনিই আমাদের অন্তরের গুরু। অসুরেরা এবার চোখ লাল করে শুক্রাচার্যকে বলল— ভাগুন আপনি এখান থেকে, আপনি মোটেই আমাদের গুরু নন— গচ্ছ ত্বং নাসি নো গুরুঃ। ইনি বৃহস্পতিই হোন আর শুক্রই হোন, ইনিই আমাদের গুরু, আপনি মানে মানে কেটে পড়ুন এখান থেকে— সাধু ত্বং গচ্ছ মাচিরম্। দেবতা, দেবগুরু এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির প্রবঞ্চনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত টেকেনি, মহামতি প্রহ্লাদের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা মিটে যায়; কিন্তু অসুরদের প্রতারণা করে দেবগুরু যে আপনার কৌশলে মুগ্ধ হয়েছিলেন— কৃতার্থঃ স তদা হৃষ্টঃ— এই ছলনা বিভিন্নভাবে ঢুকে পড়েছে

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সে ছলনাও যদি বৃহস্পতির মতো সোজাসুজি হত, তা হলেও আমাদের বলার কিছু ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের নিজের ওপর আস্থা যত কমেছে, ত্যাগের আসন থেকে ব্রাহ্মণ যখনই নামতে আরম্ভ করেছে, এই কৌশলে ছলনা বেড়েছে তত বেশি। এতে ব্রাহ্মণ সমাজের স্বার্থকল্যাণ যতই হোক, নিম্নবর্ণের ওপর, সাধারণ স্ত্রীলোকের ওপর নিপীড়ন বেড়ে গেছে। আর এই ছলনার কৌশল বড় অদ্ভুত। অশিক্ষিত জনসাধারণকে শুধু পরলোকের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্রের নামে অদ্ভুত অদ্ভুত নিয়ম করে এমন কতকগুলো ব্রত-উপবাস লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ভাবলে ভয় করে।

হ্যাঁ কতকগুলি জায়গায় ভয় দেখানোর অর্থ আছে, সেটা আমরা বুঝি, কারণ তাতে সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু কতকগুলি ভয় দেখানোর ফল হয়েছে শুধুই নিপীড়ন। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। বলেছি না, শাস্ত্রকারেরা জানতেন সবই। তবে কি না তাঁদের কতকগুলি উপদেশ আমরা কলিযুগের লোকেরা উলটো বুঝি। যেমন ধরুন পুরাণকারেরা খুব ঘটা করে বললেন— ব্রাহ্মণ! তুমি যেন খবরদার সুরাপান কোরো না। আমরা বুঝব— তা হলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সময়ে অসময়ে সুরাপান করতেন, তার ফলেই না এত বারণ। আর কী আশ্চর্য, কোনওদিন যাঁরা বেশ্যাগমন করেনি, বেশ্যার নাম শুনলে যাঁদের কুম্ভীপাক নরকে ডোবার কথা তাঁরা বেশ্যা কয় প্রকার এটা খুব ভাল জানেন। দেবীভাগবত পুরাণের বেশ্যা প্রসঙ্গে বাঙালের গালাগালি 'পুঙ্গীর ভাই' কিংবা 'পুঙ্গীর পুত'-এর রহস্য পর্যন্ত জানানো হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি 'পুঙ্গী' কথাটা ছোটবেলায় অনেক শুনেছি, কিন্তু আমাদের যাঁরা পাকানোর ভার নিয়েছিলেন তাঁরা পর্যন্ত এই শব্দের সঠিক পাঠ দিতে অসমর্থ হয়েছিলেন। শেষে দেবীপুরাণে দেখি— এক স্বামীতেই যার সন্তুষ্টি সে নাকি পতিব্রতা, কিন্তু একটি মাত্র উপপতিতেই স্ত্রী কুলটা। স্বামী ছাড়াও যদি আর দুটি গভীর শরীরী প্রণয় থাকে তবে সেই স্ত্রী 'ধর্ষিণী'। পুরাণকার ভেবেছেন— তিনটি পুরুষের সঙ্গে যে ক্রমান্বয়ে চালাতে পারে সে রমণীর মধ্যে ধর্ষণ ক্ষমতা আছে! চারজন পুরুষকে যে সঙ্গ দিতে পারে, সে রমণীর সম্বন্ধে পুরাণকারের ধারণা— সে পুরুষ দেখলেই ছোঁক ছোঁক করবে অর্থাৎ সে পুংশ্চলী। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পুরুষ বরণ করার পর তার উপাধি জুটবে বেশ্যা আর সাত-আট জন হয়ে

গেলেই পুঙ্গী— বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে পুঙ্গী চ সপ্তমে'ষ্টমে। আর যার কোনও বাছ-বিচার নেই, সবই জলভাত— তিনি মহাবেশ্যা।

বিভিন্ন কলাবিলাসে রমণীর বিভিন্ন পদবি না হয় বোঝা গেল, কিন্তু যে পুরুষ-প্রবরেরা এদের প্রতি আসক্ত হবেন, তাদের কিন্তু সংজ্ঞা নেই কোনও। তবে হ্যাঁ পরলোকে তাদের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যদি সকালে উঠে তিত্তিরি পক্ষী দেখেন তাহলে বুঝবেন, এটি পূর্বজন্মের এক ব্রাহ্মণ যিনি স্বামীর অতিরিক্ত সেই উপপতি, কুলটাগমনের ফলে যে আজ তিত্তিরি হয়ে জন্মেছে। দ্বিতীয়ত পুরাণবচন যদি সত্যি হয় তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষের যত কাক আছে, এই সমস্ত কাকই ছিল কোনও জন্মের ধর্ষিণী-গামী ব্রাহ্মণ। এর মধ্যে পুংশ্চলীগামীদের 'পোজিসনটা' একটু ভাল, কেননা পুংশ্চলীগামীরা পরজন্ম সত্য হলে কুহুকণ্ঠী কোকিল হয়ে জন্মাবেন অর্থাৎ পুংস্কোকিল। বেশ্যাগামী হলে পরজন্মে নেকড়ে, আর পুঙ্গীর ছোঁয়া পেলে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণ শুয়োর হয়ে জন্মাবে, তাও একজন্ম নয়, সাত জন্ম— পুঙ্গীগামী শূকরশ্চ সপ্তজন্মনি ভারতে। এই নিরিখে উলটোদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের সমস্ত শুয়োরেরা পূর্ব পূর্ব ব্রাহ্মণ-জন্মে কী পরিমাণ পুঙ্গীগমন করতেন ভাবলে শিহরিত হতে হয়।

ব্রাহ্মণেরা ভয় পাবেন না। আমরা জানি ব্রাহ্মণেরা যাতে বেশ্যা কিংবা পুঙ্গীর ব্যাপারে সাবধান থাকেন, সেই জন্যেই এই সাবধানবাণী, সেই জন্যেই পরজন্মে কাক, কোকিল কিংবা শুয়োর হবার ভয় দেখানো। বিশেষত ভারতবর্ষের যত তিত্তিরি, কাক-কোকিল, নেকড়ে এবং শুয়োর আছে, তাঁরা যদি সত্যই কোনও না কোনও পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ থেকে থাকেন, তাহলে তাঁরা কোনও কোনও সময়ে অবশ্যই নিজপত্নী ছাড়াও অন্য দুষ্টা স্ত্রীতে উপগত হয়ে থাকবেন। কাজেই আমরা ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরবের স্বার্থে এই কদাচার এবং কদাকার পশু-পক্ষিচক্রে বিশ্বাস করি না, বা করতে চাই না। কিন্তু এই বিশ্বাস না করার একটা বিপদ আছে এবং সে বিপদ যদি আপনি গণনার মধ্যে না আনেন তাহলে আবার ব্রাহ্মণ সমাজের দিক থেকে ছলনার প্রসঙ্গ আসে— কেননা সেটাও পরলোক বিষয়েই। পুরাণকথিত পরলোকের একটি পরিণতি আপনি উড়িয়ে দেবেন, এবং আরেকটি পরিণতিতে আপনি পরম বিশ্বাসী হবেন— এই দ্বিচারিণী মনোবৃত্তি সদাচার বিরোধী। বিপদটা কোথায় বলি।

বরাহ পুরাণে নিমির ছেলে মারা গেছেন। এই নিমি কিন্তু ইক্ষ্বাকুর ছেলে নিমি নয়। ইনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং এঁর যে ছেলেটি মারা গেছে তাঁরও বয়স হয়েছিল। কিন্তু বয়সের যুক্তিতে যেহেতু কোনও মৃত্যুশোকই লঘু করা যায় না, তাই নিমি পুত্রশোকে অধীর হয়ে ঠিক করলেন— ছেলে যা কিছু খেতে ভালবাসত সব জোগাড় করে সাতজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াব। মাটিতে কুশ বিছিয়ে তার ওপরে পিণ্ড দেব, জল দেব। নিমি, পুত্রশোকে বিহ্বল নিমি যা যা ভেবেছিলেন, সব করলেন। কিন্তু এত সব ক্রিয়াকর্ম করবার পর যখন তাঁর শোকের বেগ কিছু কমল, তখন তিনি ভাবলেন— আমি এ কি করলাম, আজ পর্যন্ত কেউ তো এমন করেনি! এই পিণ্ডদান জলদান, ছেলে খাচ্ছে, বলে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো— এ তো কেউ করেনি। শোকের বশেই আমি এই অনার্যোচিত কাজ করেছি— শোকস্য তু প্রভাবেন এতৎ কর্ম ময়া কৃতম্। দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঋষি— কেউ তো আগে আমার মতো শ্রাদ্ধকর্ম করেননি, এমনকী জীবনে শুনিওনি এমন কাজের কথা, যা আমি করেছি— ন চ শ্রুতং ময়া পূর্বং ন দেবৈ ঋষিভিঃ কৃতম্। নিমি ভাবলেন, শোকে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে, এখন যা করেছি এর ফলে হয়তো মুনিরা আমাকে অভিশাপই দেবেন। দেবেন হয়তো ভস্ম করে।

নিমি এত সব ভাবছেন এর মধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন সমস্ত কর্মে মুস্কিল-আসান নারদ মুনি। কিন্তু পাঠক! আপনি অবহিত থাকবেন। শ্রাদ্ধ বলে কোনও কিছু অতি প্রাচীন কালে ছিল না, থাকলেও এখনকার আকারে ছিল না। কিন্তু নিমি পুত্রশোকে একটা ব্যাপার, ক্রিয়া-কাণ্ড করে ফেলেছেন। ক্রিয়াকাণ্ডের ধুমধামে, জোগাড়-যন্ত্রে এবং সবার ওপর পাঁচ-সাত জন যাঁরা খেতে আসছেন, তাঁদের কাছে মন হালকা করার ফলে শোকাতুর হৃদয়ের শোক যেমন কমেছে, তেমনি অভ্যাগতদের মাধ্যমে প্রয়াত ব্যক্তির সুখ কল্পনার ফলে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও উপরি পাওনা হিসেবে দেখা দিল। কাজেই এই শ্রাদ্ধের ব্যাপারটায় দুপক্ষেরই— একপক্ষের মানসিক, অন্যপক্ষের ব্যবহারিক— সুবিধা দেখা দেওয়ায় এই প্রথার একটা 'স্যাংশন' প্রয়োজন ছিল। পাঠক! আমরা আপনাকে সেই কারণেই অবহিত হতে বলেছি। নারদ এলেন এবং নিমি তাঁর শোকের কথা এবং শোকের ফলে যা যা তিনি করে ফেলেছেন, তাও বললেন। সব কথা শুনে নারদ বললেন— তোমার ক্রিয়াকলাপগুলো নতুন ধরনের বটে, তবে সেটা যে অধর্ম, তা আমার মনে হচ্ছে না।

তবু নারদ এ ব্যাপারে নিজে সম্পূর্ণ মত না দিয়ে নিমিকে বললেন তাঁর স্বর্গত পিতাকে স্মরণ করতে। একথা তো সত্যি যে, পারলৌকিক ব্যাপারে স্বর্গত পিতৃপুরুষের কথার দাম বেশি। স্মরণমাত্রই পিতা উদয় হলেন এবং বললেন— বৎস নিমি তুমি যা করেছ, এটাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে, স্বয়ং ব্রহ্মা এই ধর্ম নির্দেশ করেছেন— পিতৃযজ্ঞেতি নির্দিষ্টো ধর্মো'য়ং ব্রহ্মণা স্বয়ম্। তাহলে নিমিব হঠাৎ-করা শ্রাদ্ধ, নারদের সম্মতি, স্বয়ং পিতার উদয় এবং সবার ওপব ব্রহ্মার নির্দেশ— সব কিছু মিলে শ্রাদ্ধ চালু হয়ে গেল।

শরীরটাকে জীর্ণ বসন বানিয়ে গীতার দার্শনিক আত্মাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে করে রেখেছেন। ফলে পৌরাণিকেরা অসুবিধেয় পড়লেন বইকি। সে যুগের রাজা মহারাজাদের ক্ষমতাও ছিল; না হলে যখন তখন মহা-মহর্ষিরা চলে আসতেন ঘরে। জীর্ণ শরীর ছেড়েও পিতৃপুরুষেরাও দেখা দিতেন পুত্রের চোখের সামনে; লোকপিতামহ ব্রহ্মার মতামতও যখন তখন পাওয়া যেত। কাজেই শ্রাদ্ধ চালু হয়ে গেল। আর শ্রাদ্ধ যখন চালুই হল, তখন পৃথিবীতে মৃতের জীর্ণ শরীর ভস্মীভূত হলেও পরলোকে তাঁর চলা-ফেলার সুবিধের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা আপনাকে রাখতেই হবে। কারণ সেখানে যাবার পথে কোথাও নাকি আগুনের বর্ষা হচ্ছে, কোথাও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও বা গরম জলের ধারা নামছে অজানা গহ্বর থেকে— অগ্নিবর্ষং শিলাবর্ষং তপ্তং তত্র জলোদকম্। কাজেই যাঁরা বেঁচে রইলেন, পিতৃপুরুষের চলার কষ্ট লাঘব করার জন্য তাঁরা একজোড়া জুতো এবং ছাতার ব্যবস্থা করবেন— কারণ যমের বাড়ির পথ চলতে প্রেত-পুরুষেব পা যেন পুড়ে না যায়— পাদৌ চ ন দহ্যেত যমস্য বিষয়ং গতে। বৃষ্টি-বাদলা হলে স্বয়ং সূর্যদেব তাঁকে ছাতার আশ্রয়ে যমলোক পর্যন্ত নিয়ে যাবেন— এবং নিবারণং ছত্রমাদিত্যেন কৃতং পুরা। এইভাবে মৃতের তরফের দানসামগ্রীতে খাট-পালঙ্ক, গোরু-ষাঁড়, বাসন-কোসন সব কিছুরই একটা ব্যবহারিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে, যা দান-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের পক্ষেও উপযোগী। পিতৃলোকের উদ্দেশে আপনি যে দান করবেন, তার ফল কী? আপনি যদি ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র পেটভরে খাওয়ান, তাহলে আপনি স্বর্গত হলে সেখানে সোনার 'এরোপ্লেন' পাবেন। আর যদি ফুল সাজিয়ে একটি ফুল-শয্যা দিতে পারেন ব্রাহ্মণকে তাহলে এখানে আপনার নিজের বাড়ি না থাকলেও স্বর্গে গিয়ে নন্দনমুখী একখানি বাড়ি পাবেন আপনি। আর আপনিই যদি

একখানা বাড়ি দেন উত্তম ব্রাহ্মণকে, তাহলে স্বর্গে গিয়ে এমন একখানি মণিরত্নখচিত বিমান পাবেন আপনি, যে বিমান চলবে আপনার মনের গতিতে। আর সে বিমানে আপনি সঙ্গ পাবেন দারুণ সব স্বর্গকামিনীদের এবং কখনও যদি বা তাদের গোলাপ জলের মৃদু-সেকে, মৃদু-গীতে ঘুমিয়েও পড়েন তাহলেও আপনার ঘুম ভাঙবে অবিবাহিতা কন্যা বা যুবতীদের মনোহর গানে— কন্যা যুবতয়ো মুখ্যাঃ সহিতাশ্চাপ্সরোগণৈঃ। সুস্বরৈস্তে বিবুধ্যন্তে...। এক কথায় ভাল দান-করা শ্রাদ্ধের ফল মৎস্যপুরাণ বলেছে— দারুণ রতিশক্তি, সুন্দরী স্ত্রী, অপূর্ব খাওয়া-দাওয়া এবং খাওয়ার ক্ষমতা এবং আরও অনেক কিছু— রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজনশক্তিতা।

মজার কথা হল এই যে, শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মে এত যে দানের পুণ্য বলা হল, তবু এই দান গ্রহণ করার জন্য সদ্ ব্রাহ্মণ পাওয়া যেত না। এর মধ্যে কোনও অসত্য নেই যে, সেকালে এমন ব্রাহ্মণ অনেক ছিলেন, যাঁরা, শ্রাদ্ধ কেন, কোনও দানই নিতেন না। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও এমন ব্রাহ্মণ দেখেছি, যাঁরা ক্রিয়া-কর্ম করাতেন ঠিকই, কিন্তু দান গ্রহণ করতেন না। অবশ্য দান গ্রহণ করার জন্য এঁদেরই ছায়ায় আরও একদল ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছিলেন, যাঁরা মূল যাজকের ক্রিয়াকর্ম গুছিয়ে দিতেন এবং শ্রাদ্ধের সতিল পিণ্ড খাওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দান নিয়ে বাড়ি যাওয়া— এই ছিল তাঁদের কাজ। নির্ধন অথচ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজে এই দান-পাওয়া অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা ছিলেন হেয়। প্রধানত এদের কল্যাণেই পুরাণে পুরাণে দানের লিষ্টি এবং ফরমাস বাড়তে থাকে, ফলশ্রুতির ছলনাও সেই সঙ্গেই বাড়তে থাকে। কিন্তু একে একে কেন দানের সামগ্রী শুধু বাড়তেই থাকে তার যে একটা অর্থনৈতিক কারণ ছিল সেটা বলেছে অগ্নিপুরাণ। প্রথম পর্যায়ে ব্রাহ্মণ কাজ করত না, পরের পর্যায়ে লোকে তাকে কাজ দিতে ভয় পেত। ফলে অগ্নিপুরাণকে লিখতে হয়েছে— ব্রাহ্মণ সবার কাছ থেকে দান নেবে— সর্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। কেননা ব্রাহ্মণের কোনও জীবিকা নেই, তাই ব্রাহ্মণের বড় কষ্ট— অবৃত্ত্যাকর্ষিতো দ্বিজঃ। এই সহজ সরল স্বীকারোক্তির পর আর কথা চলে না। সত্যিই তো, জীবিকাহীন ব্রাহ্মণের চলবে কি করে?

আমাদের ধারণা, ব্রাহ্মণদের বাঁচাতেই বর্ণব্যবস্থা। তাঁরা যত মাননীয়ই হোন না কেন, বর্ণব্যবস্থার মূল স্তম্ভ ছিলেন ক্ষত্রিয়রা। কেননা সমস্ত মানুষের সম্মান-

রক্ষা এবং কোনও মানুষের সীমা কতখানি সেটা বোঝানোর জন্যই নাকি ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছিল— মর্যাদায়াঃ প্রতিষ্ঠার্থম্। আসল কথা সভ্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি ছিল শৃঙ্খলা— সেটা জমির মালিকানার ব্যাপারেই হোক, কিংবা স্ত্রীলোক নিয়েই হোক, কিংবা যে কোনও অধিকার নিয়েই। এই শৃঙ্খলার সূত্রে কিন্তু সমস্ত জমির মালিকানা এসে গেল ক্ষত্রিয়ের হাতে। যাঁরা মনে করেন ব্রাহ্মণেরা সেই পুরাণ-পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু থেকে— সব স্বয়ম্ভুর মতো জন্মালেন, তাঁরা জানবেন— বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকালে চালুই ছিল না। নিছক শৃঙ্খলার প্রয়োজন বোধেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তা বায়ুপুরাণ থেকে শোনা যেতে পারে। তবে তার আগে একটু অন্য কথা আছে।

আমরা এর আগে পুরাণ প্রমাণে বলেছি যে, মানুষ কেমন করে বনবৃক্ষের কাছে বাড়ি তৈরির কায়দা শিখেছিল। যেটা বলিনি, সেটা হল— কিছুদিনের মধ্যে তারা বাড়িঘর তৈরির একটা মাপজোকের অঙ্ক তৈরি করে ফেলেছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও যে আমরা হাতের পরিমাণে মাপজোক করতাম তার মূলটাও নাকি ত্রেতাযুগে। এতে বেশ বুঝি ত্রেতাযুগ কলিকাল থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নয়।

তবে মাপজোকের সাধারণ মানটা কিন্তু হাতের থেকেও ছোট, অর্থাৎ হাতের আঙুল দিয়েই প্রকাশ করা হত। শুধু গ্রাম নয়, নগর, এবং অন্তঃপুর পর্যন্ত তৈরি হত এই আঙুলের হিসেবেই— মিত্বা মিত্বাঙ্গুলৈঃ। বায়ুপুরাণ বলেছে সমস্ত মানুষের মধ্যে যাঁরা ছিলেন বলবান, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় তাঁরাই নাকি থাকতেন নগরে— নিবসন্তি স্ম তেষু বৈ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজারাই ছিলেন নগরবাসী। আর যাঁরা ক্ষমতায় ক্ষত্রিয়দের থেকে দুর্বল তাঁরা ক্ষত্রিয়দেরই দান গ্রহণ করে বেঁচে থাকতেন— প্রতিগৃহ্নন্তি কুর্বন্তি। এঁরাই ব্রাহ্মণ। আবার তাঁদের থেকেও দুর্বল শ্রেণির লোকেরা রাজাদের কাজকর্ম করে বেঁচে থাকতেন। অর্থাৎ বৈশ্যেরা, যাঁরা কৃষি, পশুপালন এবং ব্যবসার ওপর জীবন ধারণ করতেন। আর সবচেয়ে দুর্বলশ্রেণির লোকেদের বলা হত শূদ্র, যাঁরা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য— এই সব জাতেরই পরিচর্যা করে দিন কাটাত— পরিচর্যাসু বর্তন্তে তেভ্যাশ্চান্যে হ্যতেজসঃ। এঁরা দুর্বল এই জন্যে যে, এঁরা মাথার কাজ করতে পারতেন না একটুও, অল্পেই ভেঙে পড়তেন— শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ— অতএব

দৈহিকভাবে ত্রিবর্ণের সেবা করা ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না তাঁদের। বায়ুপুরাণ পরিষ্কার বলেছে— ভাল কাজ আর মন্দ কাজের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব দিয়েই পূর্বকল্পের জাতিবিভাগ— ভাবিতাঃ পূর্বজাতিষু কর্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ। ভগবদ্গীতায় ঠিক এই কথাটাই আরও সূক্ষ্ম করে বলা হয়েছে ভগবানের মুখে— আমি মানুষের গুণাগুণ আর কাজকর্মের নিরিখে চতুর্বর্ণের বিভাগ তৈরি করেছি।

বাস্তবিকপক্ষে গুণ এবং কর্মের রকমফেরেই যে জাতি বিভাগ— সে কোনওকালে নেই। এখনকার মন্ত্রী, আমলা, করণিক, ব্যবসাদার এবং গৃহসেবী মানুষগুলোর মধ্যে নতুন করে জাতি ভেদ করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মার্কা মারতে দেরি লাগবে না। বায়ুপুরাণ শূদ্রদের কথা বলতে গিয়ে একটা জব্বর বিশেষণ দিয়েছে, যে বিশেষণ আমরা প্রায় কোথাও আর পাই না। বায়ুপুরাণ বলেছে— ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রের বিভাগ করা হল বটে, কিন্তু শূদ্রেরা নাকি সব সময় তিন বর্ণের ওপর খেপে থাকত— শূদ্রা দ্রোহিজনাস্তথা। কথাটা সাংঘাতিক বাস্তব। ক্ষত্রিয় বলুন, ব্রাহ্মণ বলুন, কিংবা বৈশ্যই বলুন— এই তিন বর্ণেরই সত্তা এবং জীবিকা ছিল রাজনির্ভর। ফলে সমাজের সারবস্তুগুলি এঁদের ভাগেই পড়ত। কিন্তু কপালদোষে লেখাপড়া কিংবা কিছুই না শিখে যাদের শুধু পরের বাড়িতে খেটে মরতে হত— তারা যে উচ্চবর্ণের ওপর সব সময়েই চটে থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কী! পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারদের তাই বার বার বিধান দিতে হয়েছে যাতে শূদ্রেরা কখনওই উচ্চবর্ণের বিরোধিতা না করে। কেননা বিরোধিতা করলে তিন বর্ণেরই অসুবিধে, ঠিক যেমন বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে অসুবিধে হয়। ব্রাহ্মণ্য যখন বংশগত হয়ে গেল তখন শূদ্রদের সেবাবৃত্তি ধর্মের সংজ্ঞা লাভ করল। অথচ পুরাকল্পে বর্ণবিভাগ ছিল পুরোটাই ব্যক্তিগত গুণ এবং কর্মদক্ষতার ওপর— কর্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।

যাক, এই বর্ণবিভাগ হল নতুন নিয়ম। অরাজক জনপদে সবার জীবনবৃত্তির প্রথম সোপান। এই নিয়মে সমস্ত জমিগুলি চলে গেল ছোট ছোট রাজাদের হাতে, কারণ তাঁরা সবচেয়ে বলবান— যে বৈ পরিগ্রহীতারঃ... ইতরেষাং-কৃতত্রাণাঃ। আর ব্রাহ্মণেরা! হ্যাঁ তাঁরা সত্যবাদী, ব্রহ্মবাদী সব বটে, কিন্তু তাঁদের প্রথম বিশেষণ হল— তাঁরা সব সময় রাজার বাড়ি ঘোরাফেরা করতেন—

উপতিষ্ঠন্তি যে তান্ বৈ। বস্তুত পুরাণ-ইতিহাসের যুগে ব্রাহ্মণেরা বেশির ভাগই ছিলেন রাজাদের মন্ত্রী। আপনারা রামায়ণের দশরথের মন্ত্রিসভা থেকে আরম্ভ করে যে কোনও বড় রাজার মন্ত্রিসভার সদস্যদের দিকে দৃক্‌পাত করলেই টের পাবেন ব্রাহ্মণেরা কি পরিমাণে রাজকার্যে অংশ নিতেন। ফলে যে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রিসভায় নাও থাকতেন তাঁরাও এই মন্ত্রণাদাতা ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জাত হওয়ায় রাজার অনুগ্রহ পেতে তাঁদের দেরি হত না। চক্রবর্তী যদি চক্রবর্তীকে না দেখিবে— এই নিয়মে। পৌরাণিকেরা বৈশ্যের সংজ্ঞাটি দিয়েছেন ভারী চমৎকার। তাঁরা বলেছেন— যারা নাকি ক্ষত্রিয়দের থেকে দুর্বল কিন্তু দারুণ দুষ্টবুদ্ধি আর যমের মতো যাদের ব্যবহার, যারা নাকি নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য নিরলসভাবে সমস্ত প্রজাবর্গকে চুষে খেত— তারাই হল ব্যবসাদার বৈশ্য— বৈশ্যানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তসাধকান্। শূদ্রদের কথা আগেই বলেছি, কাজেই সাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষায় নতুন বিধান কী হল সেইটে এবার বলি।

দুই

আজ থেকে একশো বছর আগে যখন ব্রাহ্মধর্মের রমরমা চলছে, তখন আমরা বলেছি— বেদ ব্রাহ্মণ সব গেল। পঞ্চদশ-ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-ধর্মের জোয়ার এনেছিলেন তখনও আমরা শ্লোক বেঁধে বলেছি— কলির প্রকোপ ভীষণ বেড়ে গেছে— বলী কলিপরাক্রমঃ। নিত্যানন্দের কীর্তনরসে বেদ-ব্রাহ্মণ সব গেল— বিগতবেদবাদো'ধুনা। আবার দেখুন দশম-একাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রখ্যাত প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য লিখেছেন— ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা এখন কামনা-বাসনা আর ক্রোধ-লোভের শত কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে— কামক্রোধাদি-কণ্টকশতজর্জরঃ। সর্বত্রই আচার্য নৈয়ায়িক কেবলই স্খলন দেখতে পাচ্ছেন— ইতস্ততঃ স্খলমিব উপলভ্যতে। অর্থাৎ তিনিও বলছেন— বেদ-ব্রাহ্মণ সব গেল। আমরা তিন যুগের সন্ধিতে এই যে গেল গেল রব শুনলাম, এই রব পুরাণগুলির মধ্যেই কতবার শোনা গেছে। যে দ্বাপরযুগের শেষ অংশে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ জন্মেছিলেন বলে, লোকে বলে সেই দ্বাপর যুগের আদিতেই নাকি 'সব গেল গেল' হয়েছিল। বেদ এক ছিল, তাকে চার ভাগ করতে হয়েছে দ্বাপর যুগে, কেননা ব্রাহ্মণেরা ..র বেদ ধরে রাখতে

পারছিলেন না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দ্বাপর যুগে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে— দ্বাপরেম্ প্রবর্ত্তন্তে ভিন্নবৃত্তাশ্রমা দ্বিজাঃ। ধর্ম হয়ে পড়েছে ব্যাকুল তার ওপর বেদের ওপর এত ব্যাখ্যা, এত টীকা-টিপ্পনী চালু হয়ে গেছে যে, মানুষ ধর্ম বলে কোনটা মানবে, তা ভেবেই পাচ্ছে না— মতিভেদাস্তথা নৃণাম্। ভেদ, প্রভেদ, আর বিকল্পে মানুষ দ্বাপরেই জর্জর। ফলে বর্ণাশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে— বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসোঃ। কামনা, লোভ, অধৈর্য, যুদ্ধ এবং ধর্মের মধ্যে পর্যন্ত সংকর এসে গেছে। আমাদের বক্তব্য দ্বাপর যুগের অবস্থাই যখন এই রকম, তখন আর কলিযুগে বেশি কী হবে। ঋষিরা কলিযুগে ঘটবে বলে যে ভয়াবহ বর্ণনা করেছেন তাতে আমরা বেশ বুঝি কলিযুগই পৌরাণিকদের আপন যুগ কারণ দ্বাপরের যুগধর্মের সঙ্গে তাব পার্থক্য বেশি কিছু নেই। আমরা এবার সেই পথে এগোব।

পুরাণকারদের দ্বাপর যুগ বর্ণনায় একটা মোক্ষম কথা বেরিয়ে এসেছে। তাঁরা বলেছেন— দ্বাপরযুগে সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়ে যায়— দ্বাপরে সর্বভূতানাং কায়ক্লেশপুরস্কৃতা। জীবিকা নির্বাহের জন্য এখন সবাইকেই হয় শরীরের, নয়, মনের, নয়তো বাক্যের ক্লেশ সহ্য করতে হয়। বস্তুত ব্রাহ্মণেরা পূর্বযুগে যেমন যজন-যাজন অধ্যয়নে দিন কাটাতে পেরেছিলেন, এখন আর তা পারছেন না। ক্ষত্রিয়েরাও যে বিনা ক্লেশে শুধুমাত্র রাজধর্মের মাহাত্ম্যে রাজ্যশাসন করে আসছিলেন সেটাও আর তত সহজে সম্ভবপর হচ্ছিল না। সমাজের ওপরে উঠে আসছিল খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ— যারা শূদ্র বলে পরিচিত। পৌরাণিকদের কাল্পনিক ক্ষত্রিয় পুরুষেরাই একমাত্র রাজা হবার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয় নাকি। যে ক্ষমতাশালী সেই রাজা হয়। শূদ্রেরাও রাজা হচ্ছিলেন, অন্তত যখন পুরাণসংহিতাগুলি রচিত হচ্ছিল তখন তো অবশ্যই শূদ্রেরা রাজা ছিলেন। ফলে ভবিষ্যৎ কলিযুগের কথায় বার বার পৌরাণিকেরা বলেছেন— কলিকালে শূদ্র রাজাই দেখা যাবে বেশি— রাজানঃ শূদ্রাভূয়িষ্ঠাঃ। আর এটা তো খুব স্বাভাবিক যে, শূদ্র যদি রাজা হন, তাহলে জাতি হিসেবে এতকাল যাঁরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পদসেবা করে এসেছেন, তাঁরা রাজা হবার পর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে ভাল চোখে দেখবেন না। তাছাড়া ব্রাহ্মণেরা পূর্বে যেরকম বিনা ক্লেশে ক্ষত্রিয় রাজার ভাত-কাপড় পেয়ে মুকুলিত নেত্রে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, শূদ্র রাজা হলে তাঁদের যে

পুরাণোক্ত কায়দায় শারীরিক, মানসিক কষ্ট উপস্থিত হবে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বাচিক ক্লেশও বেড়ে যাবে অর্থাৎ কথাও যে বেশি খরচা করতে হবে, তাতে আশ্চর্য কী! পুরাণকারকে তাই বলতে হয়েছে— মনসা কর্মণা বাচা কৃচ্ছ্রাদ্ বার্তা প্রসিধ্যতি— কষ্ট করে জীবিকানির্বাহ করতে হবে এবং তা সব বর্ণকেই।

ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে পুরাণকারদের যুগেই তো শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, পাশুপত, কাপালিক— এই সব নানান ধর্মতন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে। এর ওপরে আছে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের জয়জয়কার। বৌদ্ধ রাজা অশোক পর্যন্ত যেতে হবে না, শূদ্র রাজা মহাপদ্ম নন্দই যথেষ্ট। মহামতি আলেকজান্ডার পর্যন্ত যে রাজাকে সমীহ করেছেন, সেই রাজা যদি শূদ্র হন তাহলে পুরাণকারকে লিখতেই হবে— কলিকালে বোকা-পাঁঠারাও আসনে বসা বামুন দেখলে মস্করা করে— আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা চালয়ন্তি অল্পবুদ্ধয়ঃ। বামুন এতকাল ক্ষত্রিয়রাজার ছত্রছায়ায় বসে শূদ্রদের গালাগালি দিয়েছেন। এখন শূদ্রদেরই কেউ রাজা হলে তাদের দাস-দাসীরা যে বামুনদের চেটে তুলবে না সেটা বুঝতে পেরেই পৌরাণিকেরা লিখেছেন— রাজকর্মচারী শূদ্রেরা— (মনে রাখবেন এই শূদ্রদের পেছনে রাজার অভয় আছে)— ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকেও তাড়না করতে ছাড়ে না— তাড়য়ন্তি দ্বিজেন্দ্রাংশ্চ শূদ্রা রাজোপজীবিনঃ। আর ব্রাহ্মণেরা কি করেন? কূর্মপুরাণ বলেছে— আসলে যে ব্রাহ্মণেরা বেশি পড়াশুনো করেনি, যাদের ধনসম্পত্তির ভাগ্যও ভাল নয়, শক্তিও কম— তারা ফুল-বেলপাতা আর মাঙ্গলিক দ্রব্যের পসরা সাজিয়ে শূদ্রদের অর্থাৎ শূদ্র রাজার পরিচর্যা করে— শূদ্রান্ পরিচরন্তি অল্পশ্রুতভাগ্যবলান্বিতাঃ।

ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণেরা চিরকালই সমস্ত বিচ্যুতির জন্য দায়ী হয়েছেন। এই যে বলা হয় ব্রাহ্মণেরা কলিতে শূদ্রান্নভোজী হবে, শূদ্রের যজন করবে— এসব কেন বলা হয়? বড় মানুষ ব্রাহ্মণদের যেখানে রাজভোগ জুটত, সেখানে নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণদের অন্নচিন্তায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করতেই হত। কিন্তু অনেক নিপীড়িত হবার পর যদি শূদ্র বসেন রাজাসনে তাহলে তাঁরা পূর্ব ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন? এই ব্যবহারের চিত্র ধরা পড়েছে পুরাণের কলি বর্ণনায়। পুরাণ বলেছে— ফুল-বেলপাতা দিয়ে যতই তেল দেওয়া হোক না

কেন শূদ্রেরা তবুও ব্রাহ্মণদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না— ন প্রেক্ষন্তে অর্চিতাশ্চাপি শূদ্রা দ্বিজবরান্ নৃপ। ব্রাহ্মণেরা তবু দাঁড়িয়ে থাকতেন শূদ্ররাজার রাজমহলের দরজায়— যদি রাজার কৃপাদৃষ্টি হয়— সেবাবসরমালোক্য দ্বারে তিষ্ঠন্তি চ দ্বিজাঃ। সত্যি কথা বলতে কি শূদ্রের এই ব্যবহারকে ভাবী কলির ব্যবহার বলে ভুল করার কোনও কারণই নেই। এটা মনে রাখতে হবে শূদ্র রাজারা অনেকেই রাজা হয়ে ব্রাহ্মণ্য কায়দায় বৈদিক যাগযজ্ঞ করে নিজেদের উচ্চতা প্রমাণ করছিলেন। ভাগবত পুরাণে দেখা যাবে অন্ধ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাতিতে শূদ্র। তিনি কাণ্ব সুশর্মাকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন— তদ্‌ভৃত্যো বৃষলো বলী। গাং ভোক্ষত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ...। আবার শিলালিপির প্রমাণে দেখতে পাচ্ছি অন্ধ্র রাজারা অশ্বমেধ, গবাময়নের মতো বিশাল বৈদিক যজ্ঞ বিনা বাধায় সম্পন্ন করেছেন। যবন রাজা ডেমিট্রিয়াস, যাঁর সংস্কৃত নাম ত্রিমিত্র, তিনি পর্যন্ত এক যজ্ঞশালার উদ্বোধন করেছিলেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন স্বয়ং ভাণ্ডারকর। বেশ বোঝা যাচ্ছে পুরাণকার ব্রাহ্মণদের মতে যাঁরা শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ, তাঁরাই তাঁদের সময় রাজ্যাধিকার পাওয়ায় পুরাণকারেরা কলিযুগের বর্ণনায় ঢালাও বলে দিয়েছেন যে কলিকালে পতিত ব্রাহ্মণ, আভীর শূদ্র, ম্লেচ্ছ, ব্রাত্য, শক, কৈবর্ত, পুলিন্দ— এই সব নিম্নবর্ণের রাজারাই রাজ্যশাসন করবে।

আমি রাজা-রাজড়া আর ব্রাহ্মণদের বিপর্যয় নিয়ে আর সময় কাটাব না। কারণ ইতিহাসে এই বিপর্যয় ঘটে আবার বিপর্যয় কেটেও যায়। ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রভাব শেষ হলে যেমন শূদ্রের বাড়বাড়ন্ত হয়, তেমনি তারাও চলে যায়, আবার চাড়া দিয়ে ওঠে বেদ-ব্রাহ্মণ্যের জয়ঘোষ। ভারতের ইতিহাসে এই চক্র বারবার চলেছে কিন্তু সমাজ চলেছে তার আপন নিয়মে। পৌরাণিক বলেছেন— কলিযুগে বর্ণাশ্রমের বারোটা বেজে যাবে আর বর্ণসংকর ঘটবে ভূরি ভূরি— বর্ণাশ্রম-পরিভ্রষ্টাঃ সংকরং ঘোরমাস্থিতাঃ। কিন্তু আমরা বলি— বর্ণসংকর কলিযুগের কোনও নতুন সৃষ্টি নয়। উঁচু জাতের সঙ্গে নিচু জাতের বিয়ে অথবা নিচু জাতের সঙ্গে উঁচু জাতের বিয়ে— এ তো বর্ণাশ্রম চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলছে। মজা হল, বামুন আর ক্ষত্রিয়েরা যে নিজেদের মধ্যে বিয়ে-থার ব্যাপারে তলায় তলায় রফা করে নিয়েছিলেন, তার জোরালো প্রমাণ আছে। ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি যখন দেবযানীকে বামুনের মেয়ে বলে বিয়ে করতে ভয় পেলেন, তখন দেবযানী লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছিলেন— বামুনের

সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বামুনের কত বিয়ে হয়েছে। বামুন-ক্ষত্রিয়ের বর্ণসংকর সমাজে বেশ চলে— সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্। দেবযানী বললেন— কত উচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয়বংশ ব্রাহ্মণদের সরসতায় সজীব হয়ে উঠেছে। এ কথাব অর্থ পরিষ্কার। নিয়োগ প্রথায় ব্রাহ্মণের ছিল একচ্ছত্র অধিকার। ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে ছেলেপুলে না হলেই ব্রাহ্মণদের ডাক পড়ত এবং তাঁরা বাড়িতে একবার এলে ক্ষত্রিয় রানি থেকে বাড়ির ঝি সবাই শুদ্ধ নিয়মমতে আপন আপন গর্ভাধান করিয়ে নিতেন। শূদ্রা রমণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়ের পুত্র জন্মালে তাদের যে সমাজে কোনও খারাপ অবস্থা হত তাও নয়। বিদুর, যুযুৎসু কিংবা দীর্ঘতমার ছেলে কাক্ষীবান— এঁদের জীবনযাত্রায় কোনও অসুবিধে হয়নি পৌরাণিক সমাজে। তবে আসল কথা হল— সমস্ত বর্ণের রমণীর ওপর ব্রাহ্মণের অনুলোম অধিকার থাকায় ব্রাহ্মণদের যে কী চরম অবস্থা হয়েছিল, সেটা একটা উদাহরণ দিয়ে নিবেদন করি।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ব্রহ্মা একবার ভগবান মহাদেবকে বললেন— প্রভু আমি বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, এবারে একটু বেশ্যাদের আচার-বিচার সম্বন্ধে শুনতে চাই— পণ্যস্ত্রীনাং সমাচারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ। মহাদেব প্রথমে ব্রহ্মাকে একটু কৃষ্ণকথা শুনিয়ে নিয়ে বললেন— সেই যে দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের ষোলো হাজার রমণী ছিল, মনে আছে তো! একদা বসন্তকালে তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার চলছে। এমন সময় কৃষ্ণেরই ছেলে শাম্ব এসে দাঁড়ালে, সেই সব রমণীদের যে একটু ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল, তাও নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে। কৃষ্ণের শাপে পরবর্তীকালে দস্যুরা কৃষ্ণপত্নীদের হরণ করে এবং অর্জুনও তাঁদের রক্ষা করতে পারেননি। দস্যুরা যখন কৃষ্ণ-রমণীদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ভোগ করতে লাগল তখন তাঁদের কাছে দালভ্য ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ-পত্নীরা দালভ্যকে বললেন— মুনিবর! আমরা পূর্বে ভগবানের সঙ্গ পেয়েও এখন বেশ্যা বনে গেলাম কেমন করে— কস্মাদীশেন সংযোগং প্রাপ্য বেশ্যাত্বমাগতাঃ। যাই হোক, আপনি এখন বলুন বেশ্যারাই বা কি ধর্ম পালন করতে পারে? ঋষি তাঁদের বেশ্যা হবার কারণ দেখিয়ে একটি ব্রত করতে বললেন যার নাম বেশ্যাব্রত। মৎস্যপুরাণে এটি অনঙ্গব্রত। বেশ্যাব্রতের নিয়ম হল— যে রবিবারের সঙ্গে হস্তা, পুষ্যা বা পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগ হবে, সেই রবিবারে স্নানটান করে বেশ্যারা প্রথমে ভগবান শ্রীহরির পূজা করবে।

হরি-পূজার শেষে একজন ধর্মজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডেকে আনতে হবে। এই ব্রাহ্মণ কিন্তু বিকলাঙ্গ হলে চলবে না। যা হোক, এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ঘি-পাকানো শালিধানের ভাত খাইয়ে বেশ্যারা এবার তাঁকে রতিক্রিয়ায় আমন্ত্রণ করবে। কিন্তু হ্যাঁ রতিক্রীড়ার সময় সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে একেবারে কামদেব বলে ভেবে নিতে হবে। কেননা ওই বিশেষ রবিবারে ভগবান শ্রীহরির ওপর কামদেবের আবেশ হয়। অতএব যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে রতিক্রীড়া করা হচ্ছে তাঁকেই ভাবতে হবে ইনি স্বয়ং কামদেব— রত্যর্থং কামদেবো'য় মিতি চিত্তে চ ধারয়েৎ। এইজন্যেই বুঝি ব্রাহ্মণটি বিকলাঙ্গ হলে চলে না। রতিক্রীড়ার সময় ব্রাহ্মণ যা ইচ্ছে করবেন, বিলাসিনী বেশ্যা তাঁর সঙ্গে সেই ব্যবহারই করবেন— যদ্ যদ্ ইচ্ছতি বিপ্রেন্দ্র স্তৎ তৎ কুর্য্যাদ্ বিলাসিনী। তিনি যেভাবে চান, মুচকি হেসে আধোভাবে, বেশ্যা সেইভাবেই সেই ব্রাহ্মণের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন— সর্বভাবেন চাত্মানম্ অর্পয়েৎ স্মিতভাষিণী। এরপর আর কি, প্রচুর দান-ধ্যান করে বেশ্যাব্রতের সমাপ্তি। অবশ্য হ্যাঁ, দানের মন্ত্র কিন্তু— আমি যেমন কাম আর কেশবের তফাত করি না, তেমনি হে বিপ্র! আমারও সর্বকাম সিদ্ধি হোক। ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলে উপনিষদের মন্ত্রে শান্তিবাক্যে বলবেন— কামই দিল, কামই নিল। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা। ভাবটা এই— আমি কে? কামদেবই সব। আমার মধ্যে দিয়ে কামদেব রতি করলেন, বেশ্যার মধ্যে থেকে কামদেবই রতি গ্রহণ করলেন। এরপর ব্রাহ্মণ জিনিসপত্র বেঁধে বিদায় নেবেন। কিন্তু এই ব্রতের বেশ্যার কাজ এবং কর্তব্য হবে এই যে— ওই রবিবারের পর থেকে যে কোনও রবিবারে যদি অন্য কোনও ব্রাহ্মণ ওই বেশ্যাবাড়িতে রতিক্রীড়ার জন্য আসেন— ততঃ প্রভৃতি যো' ন্যো'পি রত্যর্থং গেহমাগতঃ— তাকেও একইভাবে বেশ্যা রতিদান করবে। এইভাবে তেরো মাস পর্যন্ত যদি উত্তম ব্রাহ্মণদের রতি-রহস্যে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে সেই সেই ব্রাহ্মণদের অনুজ্ঞা লাভ করে অন্যান্য রূপবান মানুষেরাও এরপর সেই বেশ্যার ঘরে আসতে থাকবে— তদনুজ্ঞানুরূপস্তু যাবদন্যাগমো ভবেৎ।

ব্যাপারটা যা দাঁড়াল তাতে এই বেশ্যাব্রতের অর্থ একটাই হতে পারে। এককালে কৃষ্ণের সঙ্গ-পাওয়া এই সব বেশ্যা রমণীরা এই বেশ্যাব্রত কতটা পালন করেছিলেন, পদ্মপুরাণ তা বলেনি। তবে বেশ্যাব্রতের নিয়ম-কানুন শুনে মনে হয়, বেশ্যারা যে তাদের রূপের উপজীবিকা আরম্ভ করবে, তাও এক

ব্রাহ্মণকে দিয়ে বউনি করে। আর তেরো মাসের ব্যাপারটাও কিছু নয়। তেরো মাসে চার তেরং বাহান্নটা রবিবার বাহান্ন জন ব্রাহ্মণকে দেহদান করার পর সেই প্রসাদী দেহ অন্যের ভোগে লাগবে। অর্থাৎ পয়সা রোজগার করার জন্য একটি বেশ্যাকে পুরো এক বছর ব্রাহ্মণের কাছে দেহ খাটাতে হবে, তারপর তাঁদের আদেশ হলে অন্য পুরুষের সমাগম ঘটবে বেশ্যার বাড়িতে।

বলতে পারেন— উদাহরণটা আমি বড় কড়া দিয়ে ফেলেছি। দিয়েছি এইজন্যে যে সমাজের ব্রাহ্মণেরা আস্তে আস্তে এই পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন। যে উদাহরণ আমরা দিয়েছি, সেটি পদ্মপুরাণের বলেই নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে প্রাচীন পুরাণগুলির মূল পর্বে এত ব্রত, নিয়ম ছিল না। আস্তে আস্তে পুরাণকথার মধ্যে ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতির প্রক্রিয়াগুলি ঢুকে যাওয়ায় পুরাণের মধ্যে বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম এবং উপনিষদের ব্রহ্মভাবনা কমতে থাকে। সহজে এবং সস্তায় বেশি পুণ্যপুষ্টির জন্য জনসাধারণ তখন সাধারণ ব্রত, নিয়ম পালনের বড়াই করতে থাকে এবং ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণভোজন এবং দানসামগ্রীর লোভে এই সব ব্রত-পার্বণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে থাকেন। যার ফলে বেশ্যাবাড়ির নথভাঙার অনুষ্ঠানও ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রথমে করাতে হয়। আমরা সম্পূর্ণ অবহিত আছি যে, ব্রাহ্মণেরাই এককালে তাঁদের ত্যাগ এবং শৌচাচারের নিরিখে সমাজের মূর্ধন্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা অবহিত আছি ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। আমরা এও জানি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা না থাকলে ভারতের দার্শনিক, মানবিক এবং সাহিত্যিক চিন্তাধারা অন্যরকম হত। অন্যরকম হত বলছি এইজন্যে যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও সমানাধিকার পেতেন তাহলে ভারতের সংস্কৃতির চলমানতা বাড়ত বই কমত না— কেননা সংস্কৃতি কোনও স্থাণু পদার্থ নয় এবং কোনও দেশে সংস্কৃতির প্রবাহ কোনও বিশেষ একটি জাতির ওপর নির্ভর করে না। উপরের উদাহরণ দিয়ে আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, ক্রমাগত সামাজিক মূল্য পেতে পেতে ব্রাহ্মণেরা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন যখন সভ্যতার চোখে ব্রাহ্মণের মূল্য কমতে আরম্ভ করেছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তৈরি হয়ে গিয়েছিল এমন এক বিভাগ যাতে এক ভাগ তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা, উদারতা এবং কর্মগুণে সবার সম্মান পেতেন। আরেকভাগ, বেদ-উপনিষদ, ব্রহ্মভাবনা সব ভুলে শুধু ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি বলে গর্ব করতেন। আর

তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্বিষ খোলসখানি গলায় ঝুলিয়ে শুধু সম্মান পেতে চাইতেন দানসামগ্রীর স্বার্থে।

একটা গল্প বলি বিষ্ণুপুরাণ থেকে। এক সময়ে ঋষিরা এক জায়গায় বসে একটা সমাজ কিংবা এখনকার ভাষায় একটা 'ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করলেন। ইউনিয়নের নাম 'মহামেরু' ইউনিয়ন। ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধান্ত করলেন— যে ঋষি এই মহামেরু সমাজে আসবেন না, তিনি সাত রাতের পর ব্রহ্মহত্যার পাতকে পাতকী হবেন। ইউনিয়নের ভয় কার না থাকে। সমস্ত ঋষিরাই কোনও না কোনও সময়ে মহামেরু সমাজে তাঁদের নাম লিখিয়ে গেছেন। শুধু মহর্ষি বৈশম্পায়ন এই ইউনিয়নেব ধার ধারেন না, তিনি আসেনও না। ফল, মেরুসমাজের ঋষিদের শাপ এবং তার ফলে তিনি তাঁর বাচ্চা-বয়েসি ভাগনেকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন এবং সে মারা গেল। কিন্তু বালক হলে কী হবে সেও তো ব্রাহ্মণ বটে, অতএব ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগল। বৈশম্পায়ন তখন শিষ্যদের ডেকে বললেন— বাপু হে, আমার ব্রহ্মহত্যার পাপ যাতে নষ্ট হয়, তার জন্য নির্দিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন করো। মজা হল এই শিষ্যদের মধ্যে ঠোঁটকাটা যাজ্ঞবল্ক্যও ছিলেন। তিনি বললেন— গুরুমশাই! খুব তো বললেন ব্রত কর, কিন্তু এই ফালতু বামুনগুলোকে দিয়ে ব্রত করিয়ে কী হবে— কিম্ এভি র্ভগবন্ দ্বিজৈঃ। এদের ক্ষমতা খুব কম, একটু আধটু ব্রত নিয়ম করলেই এরা মুষড়ে পড়ে— ক্লেশিতৈ রল্পতেজোভিঃ কিমেভি র্ভগবন্ দ্বিজৈঃ। তার চেয়ে আমি একাই এই ব্রত পালন করছি। বৈশম্পায়ন নিশ্চয় ভাবলেন— একবার মেরুসমাজের ব্রাহ্মণদের চটিয়ে ভাগনে মারা পড়েছে, আবাব শিষ্য ব্রাহ্মণ চটানো! তিনি রেগে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন— শিষ্য হয়ে তোর এত বড় কথা! তুই তো সব ব্রাহ্মণদের নিস্তেজ বলছিস্। দে, আমায় ফিরিয়ে দে, এতকাল ধরে তোকে যা পড়িয়েছি, বেদবিদ্যা সব ফিরিয়ে দে। যাজ্ঞবল্ক্য গুরু বৈশম্পায়নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা কবতেন, কেননা পুরাণ তাঁর আখ্যা দিয়েছে— শিষ্যঃ পরমধর্মজ্ঞঃ গুরুবৃত্তিপরঃ সদা। সেই যাজ্ঞবল্ক্য যখন দেখলেন যে, তাঁর গুরু কতখানি ফালতু ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণপুঙ্গব বলে ঘোষণা করছেন— নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যত্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্— তখন যাজ্ঞবল্ক্যও ভীষণ রেগে বললেন— দেখ ঠাকুর! যা বলেছি, তোমার ওপর যথেষ্ট ভক্তি ছিল বলেই বলেছি— ভক্ত্যৈতত্তে মযোদিতম্। এখন তুমি যদি বিদ্যে ফিরিয়ে নিতে চাও, তাহলে বলছি— তোমার মতো গুরুতেও আমার প্রয়োজন নেই, যা

এতকাল শিখেছি এখনই নাও ফিরিয়ে— মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ। এই বলে সাঙ্গ যজুর্বেদ তিনি রক্তবমি করে উগরে দিয়ে সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন— ছর্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ।

বেদের মতো জিনিস উগরানোর জন্যই যাজ্ঞবল্ক্যের বমির সঙ্গে একটু রক্ত পড়েছিল হয়তো। কিন্তু এই ঘটনাটা হল অল্পবীর্য নিষ্কর্মা, নিস্তেজ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যে ঠিক ছিল, তার প্রমাণ তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে সূর্যোপাসনা করে যজুর্বেদের পাঠ এতটাই রপ্ত করেছিলেন, যা তাঁর গুরুও জানতেন না— যানি বেত্তি ন তদ্ গুরুঃ। বস্তুত বামুনের কোনো গুণ না থাকা সত্ত্বেও এই যে বৈশম্পায়নের মতো মাথায় তুলে দেওয়া, এই মাথায় তোলার ব্যাপারটা পুরাণকাব এবং ধর্মশাস্ত্রকারদের যুগেই ঘটেছে বেশি। ব্রাহ্মণের গুণ এবং বিশিষ্ট কর্ম না থাকা সত্ত্বেও জন্মসূত্রে পাওয়া ব্রাহ্মণ্যকে সম্মান দিতে হবে— এই তাগিদ থেকেই ব্রাহ্মণকে বউনির খদ্দের হতে হয়েছে বেশ্যাব্রতে, আবার একই তাগিদে ব্রাহ্মণ ঠাট্টা-মস্করার পাত্র হয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। মনে রাখবেন গো-ব্রাহ্মণের চরম পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণের ঘরেই ব্রাহ্মণদের নিয়ে মস্করা হয়েছিল। যদুকুলের কুমারেরা শাম্বকে গর্ভবতী মেয়ে সাজিয়ে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করেছিল— বলুন তো ঠাকুর, এর ছেলে হবে না মেয়ে? ব্রাহ্মণেরা মুষল প্রসবের শাপ দিয়েছিলেন। আমরা বলি— ইয়ার্কি-ঠাট্টা কি লোকে করে না। ব্রাহ্মণেরা সব কথাতেই বাণী দিতেন, প্রচুর ভবিষ্যৎ ঘোষণা করতেন, সে নিরিখে ফাজিল ছেলেরা হয়তো একটু ঠাট্টাই করেছে, তাতেই বংশধ্বংসের অভিশাপ। আমরাও তো জ্যোতিষীকে পরীক্ষা করার জন্য কত মিথ্যে মস্করা করি। কিন্তু বংশধ্বংসের অভিশাপেও স্বয়ং কৃষ্ণের মতামত কী বলুন তো। প্রথমত ভাগবত পুরাণকার লিখেছেন— ঈশ্বর হওয়ার কারণে তিনি ইচ্ছে করলে কিছু করতেও পারতেন অথবা অন্যথাও করতে পারতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য করার জন্যই তিনি নাকি এক্ষেত্রে চুপচাপ রয়ে গেলেন। কারণ তাঁর মত হল— বামুনেরা যদি রেগেও যায়, রেগে গিয়ে যদি শাপও দেয়, এমনকী হত্যাও করে তবু তাঁকে নমস্কার করে যেতে হবে— ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ। এই নমস্কারের ফল হয়েছে এই যে, পদ্মপুরাণে দেখি— মন্দিরে ধ্যানমগ্ন এক পরমহংস ব্রাহ্মণ যখন সন্ধ্যাকালে অভিসারিণী পতিব্রতা যুবতীকে দেখে কামার্ত হয়ে ওঠেন,

পুরাণকার তখনও সেই ব্রাহ্মণের বিশেষণ দেন— ভগবান্ বিপ্রঃ। যদিও শ্লোকের অন্য অর্থে পৌরাণিককে বলতেই হয় যে ভগবান বিপ্র যুবতীতে দেখে কামার্ত হয়ে পড়লেন— দৃষ্টা তাং ভগবান্ বিপ্রো মন্মথস্য ভয়ার্দিতঃ। পরে যে ঘরে ওই রমণী আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই অর্গলরুদ্ধ ঘরের গবাক্ষপথে ঢুকতে গিয়ে ব্রাহ্মণ পরমহংস মারা যান— প্রবিষ্টং ন পুনশ্চৈতি পঞ্চত্বমগমত্তদা। উদ্দেশ্য পরিষ্কার জলবৎ।

পুরাণের ইতিহাস তাই ব্রাহ্মণদের মাথায় তোলার ইতিহাস। এই ঐতিহাসিকতাতেই ব্রাহ্মণকে যা দান করা যায় তাই সোনা হয়ে ফিরে আসে। মনু লিখেছিলেন ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতে যে ধনসম্পত্তির আহুতি দেবে সে দান হবে অক্ষয়। ঠিক এই জায়গায় টীকাকার লিখেছেন, ব্রাহ্মণের মুখ বলতে মুখ বুঝো না, ব্রাহ্মণের 'মুখ' মানে ব্রাহ্মণের হাত— পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হাতে করে নিলেই হল, সে পুণ্য অক্ষয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি কী পেতেন ব্রাহ্মণেরা যার জন্য সর্বত্যাগী অযাচকবৃত্তি, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ এত লোভী হয়ে পড়ল। আমরা কোনও উত্তর দেব না। হাজারো ব্রত থেকে আরম্ভ করে মানুষের জন্ম, যৌবন, শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা যা পেতেন, তার হিসেব আছে পুরাণে। সোনা-দানা, মণি-মুক্তো, বাক্স-প্যাটরা, খাট-বালিশ ছেড়েই দিলাম কিন্তু দানসামগ্রীর মধ্যে ভোগ্যা দাসী এবং শূদ্র দাস এই দুটি সজীব বস্তুর দানই আমাদের আধুনিক হৃদয়কে কিঞ্চিৎ অবাধ্য করে তোলে।

যাক ব্রাহ্মণের কথা। ব্রাহ্মণের কথায় যেন সেকালের আর সব কিছু হারাতে বসেছে। হারাবেই। কেননা ব্রাহ্মণেরাই সেকালের ইতিহাসের অর্ধেক। সেকালে যা কিছু ভাল তার অনেক কিছুরই মূলে ব্রাহ্মণেরা থাকায় অন্যদের কৃতিত্ব হ্রাস পেয়েছে বইকি। তার ওপরে সমস্ত রাজকর্ম এবং রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণের যোগ থাকায় অন্যদের গুরুত্ব আরও কমে গেছে। একথা আগেই বলেছি যে, তখনকার দিনের রাজমন্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান ছিল ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের। রাজার অবর্তমানে তাঁরাই রাজত্ব চালাতেন এবং আক্ষরিক অর্থে 'কিংমেকার' বলতে যা বোঝায় তাও ছিলেন ব্রাহ্মণেরাই। মহাভারত যেমন পরিষ্কার মন্তব্য করেছে যে, ব্রাহ্মণদেরই বেশির ভাগ মন্ত্রিত্ব দিতে হবে— মন্ত্রিণশ্চৈব কুর্বীথা দ্বিজান্ বিদ্যাবিশারদান— তেমনি প্রাচীন পুরাণগুলিরও একই মত। এমনকী সেনাপতির মতো বীরত্বপূর্ণ দায়িত্বেও যে ব্রাহ্মণদেরই

বসানো হত, তারও উদাহরণ আছে ভূরি ভূরি। স্বয়ং মৎস্যপুরাণ বলেছে, সেনাপতি করতে হয়, তো ব্রাহ্মণকে কর, নয়তো ক্ষত্রিয়কে— রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্যো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো'থবা। আরও আশ্চর্য, পৌরাণিকেরা সাধারণ সৈন্যগঠনের সময়েও ব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করেছেন। গোপনে গোপনে যে এতটা হয়েছিল, তা আমরা জানতেও পারতাম না, যদি না অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য ব্রাহ্মণদের সেনাবাহিনীর ওপর কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ বর্ষণ না করতেন। কৌটিল্য তাঁর পূর্বতন আচার্যদের মত উল্লেখ করে বলেছেন যে, আচার্যরা মনে করেন— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে তেজে এবং সদ্‌গুণে ব্রাহ্মণ-সেনাই শ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য এই মত উড়িয়ে দিয়ে মোটা গলায় বলেছেন— মোটেই নয়— নেতি কৌটিল্যঃ। নিজে ব্রাহ্মণ হওয়ার গুণে কৌটিল্যের সবিশেষ ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত তৈল-নিষেকে সব ভুলে যান। তাই কৌটিল্য বলেছেন— শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা যুদ্ধ ছেড়ে বামুন-বাহিনীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ-সৈন্যদের যে কোনও মুহূর্তে নিজের অধীন করে ফেলতে পারে— প্রণিপাতেন ব্রাহ্মণবলং পরো'ভিহারয়েৎ। অতএব কৌটিলের মতে— বরং বীরপুরুষ বৈশ্য কিংবা শূদ্রদের সেনাবাহিনীও ভাল, কিন্তু ব্রাহ্মণ নৈব নৈব চ। আসলে কৌটিল্য চান যুদ্ধবাজ ক্ষত্রিয়বাহিনী। যার যা। যুদ্ধ করবে ব্রাহ্মণ?

কিন্তু কৌটিল্য না চাইলে কী হবে, সেকালে রাজার নামে অনেক ক্ষেত্রে যে ব্রাহ্মণেরাই বেশির ভাগ রাজকার্য চালাতেন, তার প্রমাণ পুরাণে অনেক জায়গাতেই আছে। রাজা এবং রাজপুত্রদের যুদ্ধবিদ্যার ভারও ন্যস্ত ছিল ব্রাহ্মণদের ওপরেই। তাঁরা ব্রাহ্মণদেরও যুদ্ধবিদ্যা শেখাতেন, ক্ষত্রিয়দেরও শেখাতেন, কেননা— ধনুর্বেদে গুরুর্বিপ্রঃ প্রোক্তো বর্ণদ্বয়স্য চ। কাজেই দ্রোণাচার্য অশ্বত্থামাকেও ধনুক চালানো শিখিয়েছেন, কৌরব-পাণ্ডবকেও শিখিয়েছেন, কিন্তু একলব্য কিংবা কর্ণকে যে শেখাননি, তার কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কাউকে বিদ্যা শেখালে দ্রোণাচার্যের 'প্রেস্টিজ' চলে যেত। মৎস্যপুরাণ বলেছে রাজ্যের 'চিফ জাস্টিস'ও হবেন একজন ভাল বংশের ব্রাহ্মণ— বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্মাধিকরণো ভবেৎ। তাহলে যা দেখা যাচ্ছে, তা হল— পুরোহিত, মন্ত্রী, রাজগুরু, সেনাপতি, চিফ জাস্টিস— এতগুলি পদ যদি ব্রাহ্মণদের 'কোটাতে' চলে যায়, তাহলে ব্রাহ্মণেরাই সমাজের অর্ধেক হলেন না তো কি? পরবর্তী পুরাণগুলিতে এ ব্যবস্থা খানিকটা

ভেঙে পড়েছে অবশ্যই। এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যেও যে বিভিন্ন রাজকার্যে অন্য জাতীয়েরা প্রবেশ করে ফেলেছে এবং তা যে করেছে প্রয়োজনের তাগিদেই তার ছায়া পড়েছে তুলনায় অর্বাচীন পুরাণগুলির মধ্যে। এই পুরাণগুলি নীতিগতভাবে বড় বড় রাজকার্যে ব্রাহ্মণদের কার্যকারিতা মেনে নিলেও একমাত্র পুরোহিত এবং জ্যোতিষী বাদে আর সব জায়গাতেই অন্য মানুষদের চাইছিলেন। বিশেষত যুদ্ধে সেনাপতি ক্ষত্রিয় থাকুন আপত্তি নেই, কিন্তু অর্বাচীন পুরাণগুলিতে শূদ্রকে যুদ্ধের অধিকার দেওয়া হচ্ছে— যুদ্ধাধিকারঃ শূদ্রস্য। দেশের সংকর বর্ণকে বলা হচ্ছে— তোমরা রাজার যুদ্ধে সহায়তা কর— দেশ্যৈঃ সংকরৈঃ রাজ্ঞঃ কার্য্যা যুদ্ধে সহায়তা। আমরা বলি হঠাৎ এই উদারতার কারণ কী? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্বল্পতা কী? প্রাচীন পুরাণে শুনেছি— যে দেশে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বেশি নেই সে দেশে ধনবন্যার থাকবে না। কিন্তু পরবর্তী কালের অগ্নি পুরাণে দেখছি— যে দেশে শূদ্রেরা আছে, শিল্পী আছে, বণিক আছে, কৃষক আছে, যে দেশে ভাল ভাল কাজকর্ম হয় এবং যে দেশে নানা দেশের লোকেরা আছে সেই জনপদই শ্রেষ্ঠ— শূদ্রকারুবণিক্‌প্রায়ো মহারম্ভঃ কৃষীবলঃ।. নানাদেশ্যৈঃ সমাকীর্ণঃ ঈদৃক্‌ জনপদঃ শ্রেষ্ঠঃ।

শূদ্র শিল্পী এবং বণিকদের প্রতি পুরাণকারদের অনেক করুণা ছিল অস্বীকার করি না। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে যে, দিনে দিনে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা অনেকেই বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণ ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করার কষ্ট যত বাড়ছিল, সেনাবাহিনীতে শূদ্র এবং সংকরজন্মাদের প্রবেশ তত ত্বরান্বিত হচ্ছিল। তাছাড়া রাজাদের মধ্যেও যেখানে অনেক শূদ্র রাজা এসে গিয়েছিলেন, সেখানে শূদ্রদের যুদ্ধে অধিকার না দিয়ে উপায় আছে কোনও। আর যে দেশে শূদ্র, শিল্পী এবং কৃষকদের বাস, সে দেশের যে এত প্রশস্তি হয়েছে, পরবর্তীকালে তারও কারণ খোঁজা অন্যায় হবে না। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, ব্রাহ্মণেরা সাধারণ জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী হলেও ক্রমান্বয়ে দান পেতে পেতে তাঁরাও স্ফীত হয়ে উঠছিলেন। অতি দুঃস্থ আত্মীয়কে অর্থ সাহায্য করে যেমন তাঁর অবস্থার উন্নতি করা যায় না অথচ ওই ধন যেমন তাঁকে কর্মজগতের বিশাল ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেয়, তেমনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের আর্থিক উন্নতির জন্য রাজারা যে অশেষ দান করতেন তাতে তাঁর ধর্মনির্ভরশীলতা যতখানি বাড়ছিল কর্মক্ষমতা তত নয়। পুরাণ বলেছে— রাজার পক্ষে সোনা, জমি আর আট

বছরের মেয়েছেলে ব্রাহ্মণকে দান করার মতো পুণ্য আর নেই— হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্। তা, আট বছরের গৌরী মেয়েটিকে না হয় ব্রাহ্মণ সময় মতো তৈরি করে নেবেন, সোনা দিয়ে না হয় প্রথম ব্রাহ্মণীর আট-নরি হার গড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জমি। জমি ব্রাহ্মণ নিজে চাষ করতে পারবেন না, করলে জাত-ধর্ম সব যাবে। তাই রাজারা কি উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন দেখুন।

পূর্বকালে জমি দেওয়ার একটা নিয়ম ছিল এবং তার কারণও ছিল। যে জমি দেওয়া হত সেটা অকর্ষিত, অনাবাদী জমি, যার পারিভাষিক নাম খিলভূমি, অথবা একেবারে হাল-না-লাগানো জমি, যাকে বলে অপ্রতিহত ভূমি। এই জমি যাকে দেওয়া হত সে চাষের দায়িত্ব নিয়ে জমিতে শস্য ফলাত। এতে যেমন দানের পুণ্যও হত অন্যদিকে জমিটাও আবাদযোগ্য হয়ে যেত। কিন্তু পুরাণ বলছে— যে গ্রাম রাজা ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুণ্যভাগী হবেন, সে গ্রামের জমি হবে শস্যযুক্ত— গ্রামং বা শস্যশালিনম্। এমন জমি, যে জমিতে সব জাতের শস্য ফলানো যায়— সর্বশস্যপ্ররোহিণীম্। এখানে যেটা অনুক্ত আছে সেটা হল— যে খেট, খর্বট বা গ্রাম ব্রাহ্মণকে দেওয়া হচ্ছে, সেই গ্রামের অধিবাসী যত কুলি-কামিন, মজুর-কৃষক সবই কিন্তু ব্রাহ্মণকে দেওয়া হচ্ছে। কেননা অন্যত্র পুরাণ বলেছে— জমিই যদি দাও তবে তার সঙ্গে কটা বলদ আর কাঠের তৈরি দশটা লাঙল দিলে একেবারে স্বর্গলাভ হবে— সংযুক্ত হল পংক্ত্যাখ্যং দানং সর্বফল-প্রদম্। আপনারা ভাবছেন পৌরাণিকদের কি লজ্জা-শরম কিছুই নেই। আছে, যথেষ্ট আছে। সেই জন্যেই তাঁরা এক জায়গায় গ্রাম-দানের কথা বলছেন, আরেক জায়গায় বলদ এবং লাঙল দেওয়ার কথা বলেছেন, আবার আরেক জায়গায় বলেছেন— এর সঙ্গে যদি দাস, দাসী, অলংকার, ভূমি, গোরু, ঘোড়া আর হাতি দাও, তাহলে স্বর্গের পথ একেবারেই পরিষ্কার— দাসীদাসমলংকারং গোভূম্যশ্বগজাদিকম্। দেবায় দত্ত্বা সৌভাগ্যং ধনায়ুষ্মান্ ব্রজেন্দিবম্।।

এবার বলি দানের লিস্টি থেকে যদি জমি, বলদ, হাল-লাঙল, আর দাস-দাসীদের এক জায়গায় নিয়ে আসি তাহলে এই দাঁড়ায় যে, গ্রামের শূদ্র-বর্ণ যারা কৃষিকর্মের ওপরেই জীবিকা নির্বাহ করতেন, সেই শূদ্র বা দাসেরা জমির সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ব্রাহ্মণ মালিকের অধীনে চলে যেতেন, ঠিক যেমনটি জমির সঙ্গে সমস্ত অধিবাসীরা চলে যেত মধ্যযুগীয় ইউরোপের চার্চগুলির অধীনে।

কারণ দেবতা, মঠ কিংবা মন্দিরে যদি এইভাবে জমি দান করা হয়, তাহলে তার ফলভোক্তা হতেন সেবায়েত ব্রাহ্মণেরাই। ঠিক এই নিরিখে দেখলে বোঝা যাবে কেন সেই জনপদকে প্রশস্ত বলা হয়েছে, যেখানে শূদ্র, শিল্পী এবং বণিকরা থাকে। যে গ্রামের মালিকানা ব্রাহ্মণের হাতে এল, সেখানকার শূদ্র, শিল্পী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম মালিকানা ব্রাহ্মণের হাতে থাকত বলেই পরবর্তী পুরাণগুলিতে শূদ্র এবং বণিকদের কিছু পাত্তা দেওয়া হয়েছে, নইলে তাদের কে পোঁছে? এইভাবে কিন্তু রাজার রাজকোষের কোনও উন্নতি হয়নি, কারণ জমিদার ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সর্বদাই করমুক্ত। ব্রাহ্মণেরা নাকি তাঁদের তপস্যার ভাগ দিয়ে রাজাকে কর দিতেন। একের ছয় ভাগ তপস্যার ফলের বিনিময়ে ব্রাহ্মণ সামন্তেরা যেভাবে বেড়ে উঠেছিলেন, ভারতবর্ষের সমাজ এখনও তার ফল ভোগ করছে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বাক্তোচিত বমবমায় যাঁদের সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি হয়েছে তাঁরা হলেন বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের কথা পরে হবে, তবে সৃষ্টির আদি থেকেই যেন বৈশ্যদের ওপর পৌরাণিকদের একটা জাতক্রোধ আছে। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে শূদ্রদের বাদ দিলে একমাত্র বৈশ্যেরাই ছিলেন সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ। প্রাথমিকভাবে তাঁদের কাজ ছিল কৃষিকর্ম কিন্তু চাষের সঙ্গে প্রধানত শূদ্রদের যোগ থাকায় বৈশ্যেরা চাল এবং অন্যান্য উৎপন্ন শস্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। যে ব্যবসা করে সে এক ব্যবসা নিয়ে বসে থাকে না। কাজেই পরবর্তীকালে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যেই একচেটিয়া অধিকার এল বৈশ্যদের। আগেই বলেছি যে বায়ুপুরাণ বৈশ্যদের মধ্যে স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি এবং তাদের টাকা-পয়সা রোজগারের কায়দা-কানুন দেখে বায়ুপুরাণ তাদের উপাধি দিয়েছে 'যম' বলে— বৈশ্যানের তু তানাহুঃ কীনাশান্ বৃত্তসাধকান্। পৌরাণিকদের মুখ আছে, তাঁরা বাণী দেবেন, তাতে অসুবিধে কোথায়। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, একটা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করত এই বৈশ্যদের ওপর। ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণের মন্ত্রবলে করমুক্ত; ক্ষত্রিয়েরা বেশির ভাগই রাজপুরুষ— রাষ্ট্রের ওপরেই তাঁদের জীবিকা— তাঁদের অর্ধেক সামন্ত, অর্ধেক চাকুরিজীবী; শূদ্রেরা শুধু জন খাটে। এ অবস্থায় রাজকোষে যে বিরাট টাকা জমা পড়ত সেটা আসত কিন্তু এই বৈশ্যদের কর্মবলেই। এই

বৈশ্যেরা হলেন সেই মানুষ, যাঁরা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনেক অবমাননাকর মন্তব্য শুনেও ঘরে বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করে গেছেন। ভারত যে বহির্বিশ্বে স্বদেশ-জাত দ্রব্যগুলি রপ্তানি করতে পেরেছিল তাও কিন্তু এই বৈশ্যদের কল্যাণেই। কৃষিজাত পণ্যের লেনদেন তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে শ্রমজীবী শূদ্র দাসেদের সঙ্গে বৈশ্যদের বেশি মেলামেশা করতে হত। অন্যদিকে বহির্বিশ্বে ব্যবসার জন্য তাঁদের যবন-সংস্পর্শও ঘটত বেশি। এই স্পর্শদোষই কিন্তু চিরকাল তাঁদের হেয় করে রেখেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চোখে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ব্যবসার জন্য বৈশ্যদের অনেক অন্যায় কর্ম করতে হত এবং সে অন্যায় দিনে দিনে বেড়েছে। তবে এও তো সত্যি যে, ব্যবসা করতে গেলে মিথ্যেও বলতে হয় অন্যায়ও করতে হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণের মতো প্রাচীন পুরাণেই দেখতে পাচ্ছি যে সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণেরা ব্যবসা করার প্রাথমিক আদব-কায়দাকেও মিথ্যাচারিতা বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ভদ্রলোকের কোনও শ্রাদ্ধ-বাসরে বৈশ্যদের যেন নেমন্তন্ন না করা হয়— ন বণিক্ শ্রাদ্ধমর্হতি। কেন, তাদের অপরাধ কী? না, তারা বিক্রেয় জিনিসটি কেনবার সময়— দূর! তোমার মাল খারাপ, বিক্রি করাই কঠিন হবে— এই সব কথা বলে জিনিসটার নিন্দা করে। আবার বিক্রি করবার সময় ওই জিনিসেরই এমন প্রশংসা করে, যেন বাজারে তার জোড়া মিলবে না। কাজেই নিন্দে করে জিনিস কেনা, আর প্রশংসা করে সেটা বিক্রি করা— নিন্দন্ ক্রীণাতি পণ্যানি বিক্রীণংশ্চ প্রশংসতি— এই মিথ্যাবাদী বণিককে খবরদার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করবে না। ব্যবসার এই প্রথম চালটাকেই যদি মিথ্যে বলি, তাহলে ব্রাহ্মণেরা যে যজ্ঞকর্মের গুণ বাড়িয়ে বলে যাগ-যজ্ঞে মানুষের প্রবৃত্তি ঘটাতেন, যাকে তাঁরা নিজেরাই বলেছেন মিথ্যে অর্থবাদ, তাহলে তাঁদেরও তো শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করা চলে না। আসলে এই এক জাতক্রোধ। যাঁরা ভাবতেন ব্যবসায়ীকে দান করা মানে ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে— যচ্চ বাণিজ্যকে চৈব নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ— তাঁরা যে ব্যবসায়ীর সত্যি অন্যায়গুলো আরও বড় করে দেখবেন, তাতে সন্দেহ কি? অন্যদিকে যাকে নিন্দা করা হচ্ছে, সেই নিন্দিত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব হল— আমার যখন এইটুকুতেই এত নিন্দা, তখন আরও অন্যায়ে দোষ কি। এতে অন্যায়টা বেড়ে যায়, বৈশ্যদেরও অন্যায় বেড়েছে।

পরবর্তী পুরাণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, বৈশ্যেরা শুধু কৃষি আর বাণিজ্য নিয়ে নেই, তারা মহাজনি ব্যবসায় চড়া সুদে টাকা ধার দেয়— কৃষ্যাদিবৃত্তয়ো জ্ঞেয়াঃ কুসীদং বৃদ্ধিজীবিকা। শুধু এই নয়। আজকের দিনে যেমন পণ্য মজুত করে পরে দাম বাড়লে বিক্রি করার ঝোঁক বেড়েছে কিংবা দাঁড়িপাল্লা বাটখারায় কারচুপি করে ক্রেতাকে ওজন কম দেওয়ার প্রবৃত্তি বেড়েছে এই সব অসাধুতা তখনও ছিল এবং প্রাচীন কাল থেকেই ক্রমান্বয়ে তা বাড়ছে। পুরাণগুলি ব্যবসায়িক অসাধুতার ব্যাপারে রাজপুরুষকে সদা সজাগ থাকতে বলছে এবং তাদের দণ্ডবিধির ধারা থেকেই বোঝা যাবে— কী কী ধরনের অসাধুতা চলছিল। পুরাণ বলেছে— যে বণিক ধান কিংবা কাপাস তুলো মাপার সময় দাঁড়িপাল্লা (কূটমান) কিংবা বাটখারায় (কূটতুলা) কারচুপি করে— মানেন তুলয়া বাপি— তাকে বাইশ পণ দণ্ড দিতে হবে। এখনকার দিনে যেমন ওষুধ থেকে আরম্ভ করে ভোজ্য তেল এবং অন্যান্য খাবার জিনিসে ভেজাল মেশানো হয়— এই পরম্পরা বৈশ্য-বণিকেরা পুরাণের সময় থেকেই রপ্ত করেছে, কেননা পুরাণ বলেছে— ওষুধ, তেল-ঘি, নুন, সেন্ট, ধান, গুড়— এসব জিনিসে যে ভেজাল মেশাবে— পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং— তার বোলো পণ দণ্ড হবে। এমনকী ব্যবসায়ীরা যে সেল-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বেশি জিনিস মজুত করে কম জিনিস দেখাত, কিংবা কর আদায়ের জায়গা থেকে কেটে পড়ত— তার প্রমাণও পুরাণেই রয়েছে— মিথ্যা বদন্ পরীমানং শুল্কস্থানাদ্ অপক্রমন্। মোটামুটি সপ্তম-অষ্টম খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, ব্যবসায়ী সমাজ এত উন্নতি করেছিল যে পার্টনারশিপ বিজনেস পর্যন্ত চালু হয়ে গিয়েছিল— সমবায়েন বণিজাং লাভার্থংকম কুর্বতাম্। 'পার্টনারশিপে' কে কত পাবে তা ঠিক হত, কে কত মূলধন খাটিয়েছে তার ওপর— লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সংবিদা কৃতৌ। আবার 'পার্টনারশিপ বিজনেসে' কোনও একজন পার্টনার যদি জয়েন্ট মিটিং না করে ব্যক্তিগতভাবে জিনিস বিক্রি করে 'লস' খায়, সে দায় সেই ব্যক্তিগত অংশীদারের— স দদ্যাদ্ বিপ্লবাচ্চ। আর একইভাবে ব্যক্তিগত অংশীদার যদি লাভ করতে পারে তবে সে লাভের অংশের দশভাগ 'কমিশন' পাবে।

বোঝা যাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য কোন পর্যায়ে গেলে এতদূর চিন্তা-ভাবনা আসে; কিন্তু এই সঙ্গে ভাবতে হবে যে, উন্নতি যতই হোক না কেন বৈশ্য-বণিকদের করও দিতে হত সাংঘাতিক পরিমাণ। প্রথমত ব্যবসায়িক দ্রব্যের

বিক্রয়মূল্য রাজাই বেঁধে দিতেন এবং বণিককে কর দিতে হত কখনও বা বিক্রয়মূল্যের বিশ ভাগ। এই পরিমাণ কর দিতে গেলে বণিককে অসাধু হতেই হবে এবং কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজপুরুষকে ঘুসও দিতে হবে। প্রাচীন কাল থেকে তাই হয়েছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থ কথাসরিৎসাগরে দেখা যাবে যে, বণিকেরা 'কাস্টমস ডিউটি' ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেমন করে সাধারণ মানুষের চলার পথ ছেড়ে দিয়ে নির্জন পার্বত্য পথ, কিংবা অরণ্যের পথ ধরেছে— বণিকস্বার্থঃ পুরস্কৃত্যাটবীপথম্, বহুশুল্কভয়াৎ ত্যক্তমার্গান্তরজনাশ্রিতম্। এ ব্যাপারে বণিকদের সবচেয়ে সুবিধে দিতেন রাজার 'ফরেস্ট অফিসারে'রা এবং সেই কারণেই আটবিক পুরুষেরা অনেকেই ছিলেন রাজতন্ত্রের কাঁটার মতো। রাজারা এদের থেকে সব সময় সাবধান থাকার চেষ্টা করেও ফল পেতেন না। অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ গুছিয়ে নিতই।

তবে আজকের দিনে আমরা বুঝি যে, ব্যবসায়ীদের অসাধুতার পেছনে তাদের আরও লাভ করার খাঁই যতটা ছিল, তারও পেছনে ছিল রাজকরের সমস্যা। একটি রাজ্যের রাজকোষ যদি অনেকাংশেই নির্ভর করে বৈশ্য-বণিকের লাভের ওপর, তাহলে একদিকে তারা কষ্ট করেও সুখী হতে পারে না, অন্যদিকে ব্রাহ্মণসজ্জনেরা বাজারে গিয়ে আগুন দাম আর ভেজাল দেখে কেবলই বৈশ্যদের বায়ুপুরাণের ভাষায় গালাগালি দিতে থাকেন— বেটা যম, সুদখোর। কেবলই নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করে বেড়ায়— কীনাশান্ বৃত্তসাধকান্।

কাজ গুছিয়ে দেওয়ার জন্য এখনকার মতোই ঘুসখোর রাজপুরুষেরাও অবশ্য ছিলেন। ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনে এবং তাদের সময়মতো রাজপুরুষদের খাটানোর জন্য অপ্রয়োজনে রাজা মহারাজার পেছন পেছন যেতেন। রাজার ঘরে আনন্দের দিনে তো অবশ্যই। ব্রহ্মপুরাণে দেখবেন— রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উজ্জয়িনী নগরী থেকে ভগবৎ-সেবার ইচ্ছেয় বেরিয়েছেন। সেখানে তাঁর অনুগমনকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের যতটা না দেখা যাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যাবে বৈশ্যদের। পুরাণকার সেখানে একটি একটি করে বিভিন্ন কর্মকর বৈশ্যদের নাম করেছেন, আর বলেছেন তাঁরাও রাজার পেছন পেছন চলেছে। কিন্তু এই যে বণিকেরা চলেছে, সে তেলের ব্যবসাদারই হোক কিংবা কাপড়ের, সে তাঁতিই হোক কিংবা কামার, কিংবা এমন কোনও ব্যবসাদার যার ব্যবসার অর্থই আজকে হারিয়ে গেছে— কুম্ভকার, কুঠক— এরা সবাই

কিন্তু টাকা-পয়সা, সোনার মোহর সঙ্গে নিয়ে চলেছে— বণিগ্‌গ্রামগণাঃ সর্বে নানাপুরনিবাসিনঃ। ধনৈ রত্নৈ সুবর্ণৈশ্চ...। কই ব্রাহ্মণেরা কজন কোষাকুষি আর কমণ্ডলু নিয়ে যাচ্ছিলেন? কিন্তু অন্যত্র বৈশ্যদের কোনও এলেম না থাকলেও এখানে একটি একটি করে সমস্ত ব্যবসাদারদের নাম করা হয়েছে। কেন? একটু পরেই যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে সেই বিশাল জগন্নাথের মন্দিরটি তৈরি করবেন। মন্দিরে পুজো করতে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ সজ্জনদের দরকার হবে, কিন্তু মন্দিরটি বানাতে কাদের দরকার হবে? অবশ্যই বণিকদের। মন্দিরের সেবাপূজা চলবার জন্য রাজা মন্দিরের কাছাকাছি যেমন ব্রাহ্মণদের বসত বানিয়েছেন, তেমনি বৈশ্যদেরও বসত বানিয়েছেন— ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং নানাদেশ সমীয়ুষাম্। কারয়ামাস বিধিবচ্ছালাস্তত্রাপ্যনেকশঃ॥ বেশ বোঝা যায় মন্দির বানানোর টাকা এবং তার সেবাপূজা চালাবার টাকাও প্রধানত আসত এই বণিক-বৈশ্যদের কাছ থেকেই, যা এখনও একইভাবে আসে। ব্রহ্মপুরাণে মাঝে মাঝেই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একই শ্লোকে বৈশ্যদের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। বৈশ্যদের আর্থিক দিক দিয়ে সামাজিক মূল্য বাড়ছিল বলেই ব্রহ্মপুরাণের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বৈশ্যগোষ্ঠীরও নাম পাচ্ছি। তার ওপরে বিভিন্ন পুরাণে বৈশ্যদের জাত-ব্যবসা ধরতে ব্রাহ্মণকে যে বার বার নিষেধ করা হচ্ছে, তা থেকেও বুঝি যে বৈশ্যবৃত্তিতে অর্থলাভ উচ্চতর বর্ণের কাছেও লোভনীয় ছিল। অনেকেই সে বৃত্তি গ্রহণ করছিলেন এবং যারা সরাসরি সে বৃত্তি নিতে পারছিলেন না, তাঁরাই সামাজিক উচ্চতা প্রতিষ্ঠা করে বৈশ্যদের গালাগালি দিচ্ছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য— এই তিন বর্ণের পরে শূদ্রদের সম্বন্ধে আর কোনও কথা আমরা বলব না। বলব না এই জন্য যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর থেকে কলঙ্কজনক অধ্যায় আর নেই এবং আমার লেখনীতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র সংবাদ লিখতে গেলে উচ্চকুলশীল ব্রাহ্মণেরা শুধু লজ্জা পাবেন না, তাঁরা এক কথায় হীন এবং নীচ বলে প্রমাণিত হবেন। পুরাণগুলির মধ্যে যে শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব আচরণের নিরিখে শূদ্রকে খানিকটা সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হচ্ছিল, তাও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। নূতন ধর্ম, বৈষ্ণবতন্ত্র, শাক্ততন্ত্র কিংবা সাত্বত-পঞ্চরাত্র ধর্মবাদীরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরোধিতায় সম্মুখীন হয়েছিল বলেই সমাজের যে বহুলাংশ, সেই শূদ্রদের সমর্থন তাদের প্রয়োজন ছিল এবং সেইজন্যেই অন্তত মৌখিকভাবে হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণের থেকে মহত্তরের অর্থবাদ লাভ

করেছে; কার্যত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থেকে গেছেন, পুরাণগুলি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠতার মর্যাদা না দিয়ে পারেনি।

আমার দুঃখ লাগে একটাই। দিনের পর দিন একের নিষ্পেষণে এবং অপরের অবমাননেও, একের মানসিক পীড়নে এবং অপরের শ্রেয়োলাভেও সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ কেমন করে এত নির্বিকার রয়ে গেল। তাঁরা তো একবারের তরেও 'বর্ণ' শব্দটির আসল অর্থ বললেন না। না হয় বেদ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন গ্রন্থগুলি বলেইছে যে— ব্রাহ্মণো'স্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত॥ কিন্তু যজুর্বেদের এই মন্ত্রের অর্থও তো সংরক্ষণশীলেরা যা করেন, তা এর মানেই নয়। তাঁরা এমনভাবে বলেন যেন— সেই পরম পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্মাল, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্র জন্মাল। আসলে জন্মানোর কথাটা শূদ্রের বেলাতেই শুধু আছে। ব্রাহ্মণের কথা আছে এইভাবে যে, ব্রাহ্মণ সেই পরমপুরুষের মুখ হল। আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে তাঁর বাহু এবং উরু করা হল— 'কৃতঃ'। তাহলে আক্ষরিক অর্থে এক এক জায়গা থেকে এক এক জাতের জন্মের প্রশ্নই আসে না। আসলে ভাগের সুবিধের জন্য এটা একটা ভেদ কল্পনা। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে— ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে গুণে সমাজের মুখ্য ছিলেন বলেই মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি কল্পনা— যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মাৎ মুখতো'সৃজ্যন্ত। বাহুতে শক্তির কল্পনা বলেই— বাহুর্বৈ বীর্যম্— ক্ষত্রিয়দের বাহু বলা হয়েছে। উরু হল যাওয়া-আসা, ঘোরাঘুরির প্রতীক, ব্যবসার জন্য যা করতেই হয়, অতএব বৈশ্যেরা হলেন তাঁর উরুস্থানীয়। আর পা হল খাটুনির প্রতীক, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেই চাষ-আবাদ, কি, অন্য লোকের সেবা করতে হয়, তাই শূদ্র হল পদস্থানীয়। শতপথ বলেছে— যে ভগবান থেকে বিশ্বের উৎপত্তি তাঁকে কী কী ভাবে কল্পনা করা যায়, কত রকমভাবে কল্পনা করা যায়— যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্? না, চার ভাবে কল্পনা করা যায়। ঠিক এই জায়গাতেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এই চার জাতির কল্পনা মুখ-বাহু ইত্যাদির আদর্শে। সত্যি কথা বলতে কি ভারতবর্ষে তুলনামূলক ভাল মন্দের কল্পনায় অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের আরোপ করা হয়েছে। এমনকী যে বিষ রসায়নের কর্মকাণ্ডে লাগে তাকে ব্রাহ্মণ বিষ বলা হয়েছে দ্রব্যগুণের সীমা নির্দেশ করতে। আবার যে বিষ দেহপুষ্টির কাজে লাগে, সেটা ক্ষত্রিয় বিষ, বৈশ্য-বিষ শুধু কষ্ট লাঘব করে

আর শূদ্র-বিয়ের কাজ একেবারে মেরে ফেলা। পুরাণকারেরা কেউ তো এমন করে বর্ণবিভাগের কথা চিন্তা করলেন না। পুরাণের ব্যাসের আগে যে মহাভারতের ব্যাস; তাঁকেও তো একটু মনে রাখা যেত। তিনি তো বলেছিলেন— সে চতুর্বর্ণাত্মক পরম-পুরুষকে আমি নমস্কার করি। কী রকম পরম পুরুষ? না, ব্রাহ্মণ যাঁর মুখ, ক্ষত্রিয় যাঁর বাহু, বৈশ্য যাঁর পেট থেকে উরু পর্যন্ত, আর পা দুখানি যাঁর শূদ্র— সেই চতুর্বর্ণাত্মক পুরুষকে নমস্কার করি। পরিষ্কার কথা। একটি মানুষের দেহের কল্পনায় মানব সমাজের কল্পনা। যাঁরা বিদ্বান, শিক্ষিত, বিদগ্ধ— তাঁরা তখনও যেমন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তেমনি এখনও সমাজের ব্রাহ্মণ, নরদেহের মুখ। যাঁরা শক্তিমান, রাষ্ট্রশক্তি ধারণ করেন নিজের হাতে, তাঁরা তখনও যেমন ক্ষত্রিয় ছিলেন, আজও তেমনি ক্ষত্রিয়, দেহের শক্তির প্রতীক, বাহু। যাঁদের উদয়াস্ত উরুশক্তিতে মানুষের পেট চলে, তিনি তখনও ব্যবসাদার বৈশ্য, এখনও তাই। নরদেহের পেট এবং উরু। আর সারাদিন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা, খেটে-খাওয়া মানুষগুলি, যাঁরা মানব সমাজের দাঁড়িয়ে থাকার অবলম্বন— পা দুখানি, তাঁরা পূর্বেও শূদ্র ছিলেন, এখনও শূদ্র। পুরাণের বেদব্যাসেরা অন্তত বিষ্ণুর পা থেকে জন্মেছে বলে— তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ— বলে নমস্কার করতে পারতেন এই শূদ্র-বর্ণকে, তা তাঁরা করেননি। বহু বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ তাঁরা যেমন নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে উদারতা দেখিয়েছেন, তেমনি বলতে পারতেন— 'বৃ' ধাতু মানে বরণ করা, সেই ধাতু থেকেই তো বর্ণ। অতএব বর্ণ-ব্যবস্থা মানে— বিভিন্ন কাজের জন্য এই বিরাট মনুষ্যসমাজের বিভিন্ন মানুষকে বরণ করা। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও তাঁরা করেননি। অতএব বর্ণবিভাগের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিতান্ত স্বার্থপর অর্থবাদের জন্য পুরাণকারদেরও আমরা একভাবে নমস্কার জানাচ্ছি। দুঃখের বিষয় নমস্কারটা সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধ হল না, এই যা।

সত্যান্বেষী

অন্য সময় হলে নগরীর এই বিশেষ স্থানে এখন খুব একটা আলো দেখা যেত না। কেমন যেন একটা প্রায়ান্ধকার পরিবেশ। দু-চারটি ঘরে অবশ্যই প্রদীপের আলো চোখে পড়ত। এমনকী দু-চারজন রাজপুরুষকেও দেখা যেত। দেখা যেত— তাঁরা ঘর খুলে জরুরি কাজকর্ম সারছেন। প্রদীপের মৃদু আলোয় কখনও মদনসেনা বা বসন্তমঞ্জরীর মতো সুন্দরী সাধারণীর মৌক্তিকদামবদ্ধ চিকুর মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত ওই সব রাজপুরুষের ঘরে। তবে এখন সে রকম নয়। অন্য সময় হলে সন্ধ্যার এই প্রথম প্রহরেও নগর-কোটালের নজরদারি এবং হুঁশিয়ারি এমন পর্যায়ে পৌঁছত যে, প্রয়োজনে আসা অস্থায়ী গৃহবাসীরা কোটালের কর্তব্যজ্ঞানে যতখানি খুশি হতেন, তার থেকে বেশি আহত বোধ করতেন।

আজ কিন্তু সেরকম নয়। নগরীর এই অংশের সর্বত্র আজ রাজপুরুষের গতায়াত। নগরীর কেন্দ্রস্থলে যে সভাগৃহটি রয়েছে, তাতে আজ প্রচুর আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি-কুযুক্তির অবতারণা করে সভাসদেরা নানা উম্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়নি কিছু। এই সভাগৃহের প্রাণপুরুষ আজ অনুপস্থিত, তিনি ঝটিতি সভাগৃহে এসেই চলে গেছেন। সভাসদরা তাঁকে নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করছিলেন এবং এই আলোচনা হবে জেনেই তিনি হয়তো চলে গেছেন।

নগরীর প্রান্তে রাজার এই সভাগৃহ খুব পুরনো নয়, এমনকী নগরীটিও নতুন। মথুরা রাজ্যের একনায়ক কংস যখন বেঁচে ছিলেন, তখনও এই নগরীর প্রতিষ্ঠাই হয়নি। কংস মারা গেলে তাঁর দুই স্ত্রী অস্তি এবং প্রাপ্তি বিধবার বেশে প্রবেশ করলেন মগধরাজ্যে।

মগধরাজ জরাসন্ধ কংসের শ্বশুরমশাই। কৃষ্ণের হাতে জামাই কংসের অপমৃত্যু ঘটায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মথুরা আক্রমণ করেন। মথুরা রাজ্যের শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ তখন মূলত কৃষ্ণের হাতেই ছিল। কংস মারা যাবার পর তাঁর বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাগৃহ থেকে মুক্ত করে এনে মথুরার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন কৃষ্ণ। জামাই কংসের এই অপমান এবং মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করেন। একবার-দুবার নয়, অন্তত উনিশ বার।

কৃষ্ণের সঙ্গে সরাসরি জরাসন্ধের লড়াই দু-তিনবারের বেশি হয়নি। কিন্তু তাতেই কৃষ্ণ বুঝে গিয়েছিলেন যে, জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই অত সহজসাধ্য নয়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারাই জরাসন্ধের শাসনাধীন। তাঁর সম্মিলিত বাহিনীর সামনে যাদব-বৃষ্ণিদের চতুরঙ্গিণী সেনাও অতি দুর্বল প্রতিপক্ষ। কৃষ্ণ তাই তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন এবং কংসপিতা উগ্রসেনের পরমাত্মীয় পরিজনদের সবাইকে ডেকে বললেন— আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টি এবং পরিবার যেমন বেড়ে গেছে, তাতে এই মথুরাপুরীর মতো ছোট্ট জায়গায় আমাদের আর স্থান সংকুলান হয় না। তা ছাড়া জায়গাটাও এমন অরক্ষিত যে, শত্রুরাও বড় সহজে এখানে প্রবেশ করে— ইয়ঞ্চ মাথুরী ভূমিরল্পা গম্যা পরস্য তু।

অতএব কৃষ্ণ যখন মথুরা নগরী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার প্রস্তাব করলেন, তখন যাদবদের জ্ঞাতিগুষ্টি সকলেই একবাক্যে রাজি হলেন। কৃষ্ণের ব্যবস্থা সব পাকা। তিনি পূর্বাহ্ণেই গরুড়কে জায়গা খুঁজতে বলেছিলেন। গরুড় কৃষ্ণের

ভৃত্য এবং সারথি। এই মানুষটি ভারতবর্ষের আদিম-সমাজের কেউ হবেন। ইনি একটি পাখির মুখোশ ব্যবহার করেন কখনও বা পাখির ডানাও। নির্বিষ সাপ অথবা সর্পজাতীয় সরীসৃপ তাঁর খাদ্যের মধ্যে পড়ে। কৃষ্ণ এই ভৃত্যটিকে পরম বিশ্বাস করেন এবং গরুড়ও তাঁর প্রভুর জন্য করতে না পারেন এমন কোনও কাজ নেই। গরুড় এসে কৃষ্ণকে বলেছিলেন— আপনার কথামতো ভূমি অন্বেষণ করতে করতে যে জায়গাটা আমার শেষ পর্যন্ত পছন্দ হয়েছে, সেটি কুশস্থলী। এই প্রদেশের চারদিকেই প্রায় সমুদ্র। পূর্ব ও উত্তর দিকের জমি কিছু ঢালু এবং শীতল। এই জায়গাটা মনোমতো করে সাজিয়ে নিলে জরাসন্ধের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার আদর্শ জায়গা হবে সেটা। গরুড়ের পছন্দ করা জায়গা কৃষ্ণের পছন্দ হল। এবার সবাইকে বোঝাতে হবে। মুশকিল হল, মথুরার অধিপতি উগ্রসেন নামেই রাজা। তাঁকে সব সময়ই প্রায় গণতান্ত্রিক নিয়ম মতে চলতে হয়। আসলে যাদবদের জাতিগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি বড় মানুষ ছিলেন, যাঁদের প্রত্যেকেরই একেকটা দল ছিল। তা ছাড়া যাদবদের মূল বংশ পুত্র-পৌত্র-পরম্পরাক্রমে ভেঙে ভেঙে চার-পাঁচটি বড় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এই একেকটি গোষ্ঠীর নাম ছিল সংঘ। ভোজ বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর — যদুবংশের এই সব বড় বড় সংঘ মুখ্যের নামেই এখনও এই গোষ্ঠীগুলি পরিচিত।

মথুরাপুরীর ঠিকানা পাল্টানোর জন্য সমস্ত সংঘমুখ্যদের ডেকে কৃষ্ণ অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সব একবাক্যে কৃষ্ণের কথায় সায় দিলেন। মথুরাপুরীর সমস্ত লোক কুশস্থলীতে উপস্থিত হবার আগেই উপযুক্ত স্থপতিকে দিয়ে সেখানে রাজসভা তৈরি করালেন কৃষ্ণ। রাজসভা থেকে অল্পগতির দূরত্বে কতকগুলি ছোট ছোট বাসভবন নির্মিত হল। সেখানে প্রয়োজনীয় সময়ে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকদের সংঘমুখ্যরা এসে রাত্রিবাস করবেন এবং নির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। আপনারা জানেন, আজও সেই সভা বর্সেন্নিবার ঘরে যে সভায় জোর আলোচনা চলছিল কৃষ্ণকে নিয়েই। কৃষ্ণ সভাগ্‌কৃষ্ণকে দেখা অবধি বেশ খানিকক্ষণ। স্থানীয় আবাসে ফিরে আসার পর তাঁর সুযোগ না দিয়েই সে শৈনেয় সাত্যকি এসেছিলেন।

—কতক্ষণ?

—তা, অর্ধ প্রহরকাল হয়ে গেছে।

—তিনি এখন কোথায়?

বুঝতে পারনি? তোমার মতো

জসভার ওই বুড়ো উগ্রসেনের

—পুনরায় সভাগৃহে ফিরে গেছেন। সভাগৃহ ছেড়েই তিনি এসেছিলেন এখানে। তবে তিনি বলে গেছেন— তিনি আবার আসবেন, সভার কার্যকাল শেষ করে।

দুই

কুশস্থলীর এই জায়গাটার নতুন নামকরণ হয়েছে দ্বারকা। আর যে সভাগৃহে আজ উত্তরঙ্গ আলোচনা চলছে কৃষ্ণকে নিয়ে, সেই সভার নাম সুধর্মা। সভায় তাঁকে নিয়ে যে আলোচনা চলছিল তাতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন কৃষ্ণ। আলোচনার অর্ধপথেই তিনি সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু সোজাসুজি সুধর্মার প্রাঙ্গণে অবস্থিত স্থানীয় আবাসে ফিরে আসেননি তিনি। তাঁর মন আজ বড় বিষণ্ণ।

দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করে তিনি দ্বারকার কেন্দ্রস্থলে চলে এসেছেন। এখানে তাঁর পিতৃগৃহ। পিতৃগৃহের অদূরেই তাঁর নিজস্ব ভবন। বসুদেবের গৃহের সামনে তিনি অশ্বের গতি কমালেন, বাড়ির সামনে এসে ঘোড়াটিকে বেঁধে রাখলেন একটি স্তম্ভের সঙ্গে। বাড়ির বাইরে থেকেই রমণীকণ্ঠের চাপা হাসির শব্দ তাঁর কানে এল। বুঝলেন— অন্তর্গৃহে রুক্মিণীর কাছেই কেউ এসেছে। কৃষ্ণের হাতে সময় বেশি নেই। রুক্মিণীর সঙ্গে একটু দেখা করেই তিনি চলে যাবেন। অন্তর্গৃহে রুক্মিণীর ঘরে ঢুকতেই রুক্মিণী যেমন কৃষ্ণকে দেখে অবাক হলেন, তেমনই কৃষ্ণ অবাক হলেন অপরা রমণীকে দেখে। রমণীর বয়স আঠারোর বেশি নয়। কৃষ্ণ তাঁকে চেনেন বটে, তবে নানা কারণে বেশি ঘনিষ্ঠতার

পরিজনদের ন না।
যেমন বেড়ে গে নও পর্যন্ত কৃষ্ণের একমাত্র মহিষী। মথুরায় থাকাকালীনই
আর স্থান সংকুলান হ সামান্যা রমণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। স্বামী ছাড়া
বড় সহজে এখানে প্রবে। শোনা যায়, বৈদর্ভী রমণীরা অসম্ভব সুন্দর কথা
অতএব কৃষ্ণ যখন মথুরা ব বিদগ্ধতা তাঁদের এত বেশি যে, কবিরা বলে
তখন যাদবদের জাতিগুষ্টি স ন কাজে 'হ্যাঁ' বলছেন, আর কোন কাজে 'না'
সব থাকা। তিনি পূর্বাহ্নেই গরুড় ায় না।

কিন্তু ভারী আশ্চর্য, বিদর্ভের সেরা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও রুক্মিণী বড় সরল প্রকৃতির মানুষ, বড় সহজও বটে। এমনকী কৃষ্ণের সামান্য পরিহাস-বাক্যও তিনি এমন সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণই অবাক হয়ে যান। অবাক হয়ে ভাবেন— এই সুকুমারমতি রমণীই একদিন তাঁকে গোপনে চিঠি লিখে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। এও সম্ভব! কৃষ্ণ একদিন এই বিদর্ভ-নন্দিনীকে বলেছিলেন— বিদর্ভের স্বয়ংবর-সভায় কত বড় বড় রাজা-মহারাজারা তোমার পানিপ্রার্থী ছিলেন। তুমি তাঁদের ছেড়ে কেন যে আমার মতো এক পরান্নপ্রতিপালিত সাধারণ মানুষকে বিয়ে করলে তা ভাবলে অবাক লাগে। এইটুকু শুনে রুক্মিণীর খারাপ লাগলেও তিনি কোনও প্রত্যুত্তর করেননি। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় কৃষ্ণ আরও বলেছিলেন— তুমি বরঞ্চ আরেকটা বিয়ে করো রুক্মিণী। বেশ একটা সম্পন্ন রাজার ঐশ্বর্যশালী পুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। তুমি কত সুখে থাকবে। কত ভোগ, কত বিলাসের উপকরণ পাবে তুমি। পরিহাস বেশিদূর এগোতে পারেনি। রুক্মিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। পরম প্রিয় কৃষ্ণের জায়গায় অন্য কাউকে স্বামী কল্পনা করাটা তাঁর পক্ষে এতই অসম্ভব। রুক্মিণীর সঙ্গে এতদিন সংসার করে কৃষ্ণও বুঝেছেন— একমাত্র এই পরম বিশ্বস্তা রমণীটিই তাঁকে নিষ্কলুষভাবে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর যে কোনও দোষ থাকতে পারে, নিত্য অথবা নৈমিত্তিক কোনও কর্মে তাঁর যে কোনও ত্রুটি ঘটতে পারে— এ তিনি বিশ্বাসই করেন না। কৃষ্ণের বিষণ্ণতার দিনে তার মনের কষ্ট যখন চরমে ওঠে, তখন যেন এই শ্রীময়ী রমণীর ব্যক্তিত্ব মাতৃত্বের সর্বংসহ রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণ সেই কারণেই সভাগৃহ ছেড়ে এখানে এসেছেন।

কৃষ্ণকে দেখা মাত্রই রুক্মিণী শশব্যস্তে তাঁর পরম প্রিয় স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। পরম রমণীয়তায় তাঁর হাতখানি ধরে বললেন— আর্যপুত্র! এমন অসময়ে? আপনার সভাগৃহের কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? রুক্মিণীর ঘরে যে অন্যতরা রমণীটি আছেন, কৃষ্ণ সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কৃষ্ণকে দেখা অবধি সে রমণীর হাসি আরও বেড়েছে। কৃষ্ণকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই সে বলে উঠল—

—বউরানি! তুমি ওঁর ফিরে আসার কারণ বুঝতে পারনি? তোমার মতো এক অনুপমা সুন্দরীকে বাড়িতে রেখে রাজসভার ওই বুড়ো উগ্রসেনের

দাড়িওয়ালা মুখ, অক্রূরমশায়ের ক্রূর চিৎকার— এসব কি ভাল লাগে নাকি? কৃষ্ণ রমণীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর মন আজ বিক্ষিপ্ত আছে। অন্যদিকে এসব কথায় কৃষ্ণ কী ভাববেন, সেই ভাবনায় রুক্মিণী বলে উঠলেন—

—তুই থামবি? আর্যপুত্র! আপনার শরীর ঠিক আছে তো?

অপরা রমণী আবার উত্তর দিল— ঠিক ছিল না, এই তোমাকে দেখেই ঠিক হল। এই অষ্টাদশী রমণীটিকে কৃষ্ণ আজকাল রুক্মিণীর ভবনে মাঝে মাঝে দেখতে পান। রমণী অতিশয় সুন্দরী এবং লোক পরম্পরায় কৃষ্ণ জানেন যে, এই রমণীটির জন্য যাদব-বৃষ্ণি কুলের অনেকেরই হৃদয় বিগলিত। রমণীর কথার সূত্র ধরেই কৃষ্ণ জবাব দিলেন—

—কথাটা একেবারে মিথ্যে বলনি। রুক্মিণীকে দেখে সত্যিই ভাল লাগছে। তবে তোমার কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে— অক্রূরমশায়ের চিৎকারটা আমার কাছে ক্রূর লাগতেই পারে, তোমার কাছেও কি তাই? রমণী লজ্জা পেল। কৃষ্ণের কথার কোনও উত্তর দিল না সে। ওই একটি কথাতেই রমণী সাময়িকভাবে স্তব্ধ হল। অবশ্য তার ভাব-ভঙ্গি দেখে এমন মনে হল না যে, সে চুপ করেই থাকবে। একটু সময়ের জন্য সে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে রুক্মিণী ভবনের মর্মর-প্রস্তর বৃথাই খুঁড়ে চলেছিল বটে, কিন্তু মাঝেমাঝেই সে চঞ্চলভাবে কৃষ্ণ এবং রুক্মিণীকে লক্ষ করতে লাগল। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে উদ্দেশ করে বললেন—

—আচ্ছা রুক্মিণী! তোমার বিয়ের সময় সেই যখন তুমি ভবানী মন্দিরে পুজো দেবার জন্য বিদর্ভ নগরের উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলে, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে? রুক্মিণী পুলকে বিস্ফারিত হয়ে বললেন—

—সেদিনের কথা কি ভোলা যায়, আর্যপুত্র। বিদর্ভের রাজসভায় সেদিন কত রাজা-মহারাজারা উপস্থিত। শিশুপাল-জরাসন্ধরা আমাকে নিয়ে পিতা ভীষ্মকের সঙ্গে দরবার করছেন। আর সেই সময়ে আমি সখীদের নিয়ে ভবানী মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—আর আমি কেমন তোমার সখীদের অবাক করে দিয়ে তোমাকে চুরি করে নিয়ে এলাম বিদর্ভ থেকে।

একটু হেসে কৃষ্ণ আবার বললেন— আচ্ছা! এই ঘটনার পর থেকে তুমিও কি আমাকে চোর ভাব, রুক্মিণী! যেমন শিশুপাল ভাবেন, জরাসন্ধ ভাবেন,

তুমিও কি তাই ভাব, রুক্মিণী! কৃষ্ণের কথার ধরন দেখে রুক্মিণী একটু অবাক হলেন। তাঁর প্রিয় স্বামীটি তো এত গম্ভীরভাবে কথা বলেন না কখনও। রুক্মিণী অবশ্য নিজের স্বভাব অনুযায়ী বলে চললেন—

—সেদিন আমাকে যদি তুমি চুরি না করতে, তাহলে যে সিংহের যোগ্য ভাগ শৃগালের ভোজ্য হত। তা ছাড়া চুরি কীসের? তোমার সঙ্গে সমবেত রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ বলরাম স্বয়ং যুদ্ধ করেছিলেন। ওরা তো সব হেরে পালিয়েছিল। এর মধ্যে আবার চুরি কোথায়?

আগন্তুক রমণী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে সুযোগ পেয়ে বলল—

—তবু, তবু এটা চুরি। আর চোর বলে তোমার বেশ নাম আছে ঠাকুর! তোমার ছোটবেলার গল্প শুনেছি যথেষ্ট। তোমার চুরির জ্বালায় বৃন্দাবনের বৃদ্ধারা অতিষ্ঠ হয়ে তোমার পালিকা জননীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। তারপর ব্রজপুরের যুবতী রমণীদের কথাও শুনেছি, তুমি তাদের বসন..

—'তুই থামবি?' রুক্মিণী চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ও বড় প্রগলভা হয়ে উঠেছে, আর্যপুত্র। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।

রুক্মিণী কপট রাগে পরিচিতা রমণীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

—দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা করছি। আজই তোর বিয়ের জন্য কথা বলতে যাব আমি।

রমণী বলল— আমার বিয়ে? যিনি আমায় বিয়ে করতে আসবেন, তাঁকে যে তোমার আর্যপুত্রের কাছে চুরির তালিম নিতে হবে আগে। তারপর তো?

তিন

দীপকর একটু আগেই কৃষ্ণের ঘরে একটি তৈলপূর্ণ প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। প্রদীপের আলো একটু বেশিই লাগছে যেন। কৃষ্ণ দীপকরকে বললেন— প্রদীপ স্তিমিত করো। দীপকর প্রদীপের বর্তিকার অগ্রাংশ তেলের ভিতর ডুবিয়ে দিতেই প্রদীপের আলো মৃদু হল। কৃষ্ণ আপন শয্যায় হস্তোপধানে অর্ধশায়িত হয়ে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে গৃহভৃত্য কৃষ্ণকে এসে জানাল—

—প্রভু! হার্দিক্য শতধন্বা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

—শতধন্বা। তার তো আসার কথা ছিল না। তুমি তো বললে— সাত্যকি এসেছিলেন এবং আবারও তিনি আসবেন? কই সে তো এল না! যাই হোক, হঠাৎ শতধন্বা কেন এখানে এল— তা তো বুঝতে পারছি না। তার তো এখনও সুধর্মা সভাতেও আসার এবং বসার বয়স হয়নি?

কৃষ্ণের এতগুলি উচ্চকণ্ঠ স্বগতোক্তি শুনে ভৃত্য কিঞ্চিৎ বিব্রত হল। সে বলল—

—আমি কি তাঁকে বারণ করব এখানে আসতে? কৃষ্ণ লজ্জিত হয়ে বললেন, না না, বারণ করবে কেন? নিয়ে এসো তাকে। শতধন্বা এক কিশোর বালক। কৃষ্ণেরই জ্ঞাতিবংশের ধারায় তাঁর জন্ম। আত্মীয়তার সম্বন্ধে একটু দূরগত হলেও যদু-বৃষ্ণিদের রক্তের টানে কৃষ্ণ একে খুব দূরের লোক ভাবেন না। বিশেষত এর দাদা কৃতবর্মা একজন সংযমুখ্য। তিনি সুধর্মা সভায় আলোচনা-চক্রে যোগও দিয়েছেন। কিন্তু শতধন্বা কৃতবর্মার ভাই হলেও বয়সে কিশোর। এখন এই সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথা থেকে কী কারণে সে এখানে এসে উপস্থিত হল— কৃষ্ণ ধারণা করতে পারছেন না।

শতধন্বা ঘরে প্রবেশ করেই সদ্যাগত ভৃত্যের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল। কৃষ্ণ বুঝলেন— শতধন্বা গোপন কথা বলতে চায়। ভৃত্যকে চলে যেতে বললেন কৃষ্ণ। ভৃত্য চলে যেতেই কৃষ্ণ শতধন্বাকে বললেন— তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বৎস। শীতল পানীয় আনতে বলি?

শতধন্বা প্রত্যাখ্যান করে বললেন— আমার কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। কৃষ্ণ বললেন— সে তো বুঝতেই পারছি। এখানে এখন মশা-মাছিও নেই। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলো। শতধন্বা খুব তাড়াতাড়ি নিজের প্রসঙ্গে আসতে চাইলেন। কিন্তু তিনি যে কথা বলতে চাইছেন, তার জন্য কিছু ভণিতাও দরকার। নতুবা তার কথাটা খুব আকস্মিক এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। শতধন্বা বললেন— আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃতুল্য। একমাত্র আপনিই আমায় সাহায্য করতে পারেন।

কৃষ্ণ বললেন— কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপার কি, শতধন্বা? কাউকে দণ্ড দিতে হবে? অথবা তোমার পৈতৃক বিষয়-আশয় নিয়ে কি কৃতবর্মার সঙ্গে কোনও...। শতধন্বা মাঝপথেই কৃষ্ণকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— সে সব কিছুই নয়, আর্য। আজ আমি দ্বারকাতেই ছিলাম। আর্যা রুক্মিণীর বাসগৃহের পার্শ্বপথ

ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলাম সাত্রাজিতী সত্যভামা আর্যার গৃহ থেকে দ্রুত নির্গতা হলেন। কিছুক্ষণ পরে আপনাকেও আমি নির্গত হতে দেখেছি।

—'তাতে কী হল'— কৃষ্ণ অবাক হলেন। 'সে রুক্মিণীর সঙ্গে নর্মালাপ করতে এসেছিল। সুযোগ পেয়ে আমার সঙ্গেও খানিক রহস্যালাপ করে গেল।' শতধন্বা বললেন— সে কি আমার কথা বলল, কিছু? এক মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণ সব বুঝে গেলেন। ভাবলেন— একটু মিথ্যাচার করলে যদি এই কৈশোরগন্ধী যুবকের মন শান্ত হয়। কৃষ্ণ বললেন— না তেমন কিছু নয়, তবে সে জিজ্ঞাসা করেছে— শতধন্বাকে আমার কেমন লাগে? তা আমি বলেছি, খুব ভাল। মহামহিম হৃদিকের পুত্র, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মার ভ্রাতা তো আর সাধারণ মানুষ হতে পারেন না।

শতধন্বা বড় খুশি হলেন। ওই রমণীর কথা তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কৃষ্ণ কি সত্য কথা বলছেন? তাব সন্দেহ হয়। শতধন্বা কৃষ্ণের কাছে অনুনয়ের সুরে বললেন— আমাকে একটি বিষয়ে কথঞ্চিৎ সাহায্য করবেন, আর্য! একমাত্র আপনিই পারেন আমার তৃষ্ণা মেটাতে। কৃষ্ণ বললেন— বলো বৎস! তোমার তৃষ্ণাটি কী আগে শুনি। শতধন্বা বললেন— তৃষ্ণা? বৈদগ্ধ্যের তৃষ্ণা, যদুবংশ-স্তম্ভিণী এক মোহিনী মায়ার তৃষ্ণা।

কৃষ্ণের দ্বারে আঘাত পড়ল আবার। শতধন্বার কথা শেষ হল না। দ্বারপাল জানাল— আর্য সাত্যকি এসেছেন। কৃষ্ণ শতধন্বাকে বললেন— তোমার কথা বোধহয় আমি খানিকটা বুঝেছি। কাল যদি পরিপক্ক হয়, লগ্ন যদি অনুকূল হয়, তবে তোমার তৃষ্ণা মিটতেও বা পারে। তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। তুমি ধৈর্য ধরো।

শতধন্বা বিদায় নিলেন। সাত্যকির সঙ্গে তাব দেখাও হল। সাত্যকি শতধন্বার আগমনের কোনও মূল্য দিলেন না। মৃদু হাস্য বিনিময় করে তিনি কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ স্বাগত জানিয়ে বললেন— কী সংবাদ, সাত্যকি? তুমি একবার এসে ফিরে গেছ। রাজসভার জরুরি বিতর্ক ছেড়ে হঠাৎ তুমি চলেই বা এসেছিলে কেন?

— আমার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। আপনিই বা চলে এলেন কেন, আর্য?

—যে সভা আমার সম্বন্ধেই কথা বলতে চায়, যে সভায় আমার সম্বন্ধে কটূক্তি চলছে, সেখানে আমি উপস্থিত থাকলে আমার প্রতিপক্ষেরা কি মন-প্রাণ খুলে কটূক্তি করতে পারবে? তুমি কী বল?

—কিন্তু প্রাণখোলা সেই কটূক্তির প্রশ্রবণ আমাদের কাছে কি খুব শ্রবণ-রসায়ন বলে আপনার মনে হয়?

—তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাঁদের মনে যা আছে, তাও সম্পূর্ণ উদ্‌গীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। নইলে, উদরের অজীর্ণ বাষ্প তাঁদের কেবলই পীড়া দেবে। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু নিন্দুকের মুখে বাষ্প-স্তম্ভিত উদ্‌গার আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। তার চাইতে বমন শ্রেয়।

সাত্যকি বুঝলেন, কৃষ্ণের অন্তরে ক্রোধ ঘনীভূত হয়েছে। অবশ্য স্নেহাস্পদ সাত্যকির সামনেই মনের ভাব যা একটু প্রকাশ করে ফেললেন তিনি। নইলে রাগ হলেই রাগ প্রকাশ করে ফেলার লোক তিনি নন। কৃষ্ণ যদুসভার আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে সাত্যকিকে বললেন— তা আমায় নিয়ে কে কী বললেন একটু বলো।

—সুমিত্র-সংঘের জ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রসেনের মৃত্যুর দায় এখন আপনার ঘাড়েই পড়েছে।

—সে কী?

তিনি তো বনের মধ্যে আকস্মিকভাবে নিহত হয়েছেন শুনেছি। সেখানে আমার কী করার আছে।

—শুধু হত্যাই নয়। মহামূল্য মণিটিও আপনিই চুরি করেছেন বলে দ্বারকার লোকেরা কানাকানি করছে এবং এই কানাকানি আপনার ভালবাসার জ্ঞাতিগুষ্টির অপপ্রচারের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

—কে এই অপপ্রচার করেছেন বলে তুমি মনে কর?

—আমার মনে করা-করিতে কিছু যায় আসে না। আমি গুপ্তচর নিয়োগ করে পূর্বাহ্নেই খবর পেয়েছি, এই অপপ্রচারের মূলে আছেন অক্রূর।

—অক্রূর! তাঁর স্বার্থ কী এখানে?

—সে কথা বারান্তরে জানাব। আপনার কাছে শতধন্বা কেন এসেছিল?

শতধন্বার প্রসঙ্গ আসা মাত্রই কৃষ্ণের গাম্ভীর্য লঘু হল। এই ছেলেটিকে কৃষ্ণের ভাল লেগেছিল। কৃষ্ণ মুখরভাবে বলে উঠলেন— আর বোলো না।

কিশোর বালক। বাসন্তিক পুষ্পের মধু তার মনে। এই বালক সত্রাজিতের কন্যারত্ন সত্যাভামাকে ভালবাসে।

সাত্যকি কৃষ্ণকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ দিলেন না। বললেন— আপনি অক্রূরের স্বার্থের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না আর্য? আপনাকে জানিয়ে রাখি— পৃথিবীর অক্রূরও সত্যভামাকে ভালবাসেন।

কৃষ্ণ ভৃত্যকে ডেকে প্রদীপের আলো বাড়িয়ে দিতে বললেন। সাত্যকি বিদায় নেবার আগে জানিয়ে গেলেন — অক্রূরের কথা যখন বলেই ফেললাম, তখন বারান্তরে আরও একজনের কথা জানাব। কৃষ্ণ সাগ্রহে জানালেন— তিনিও সাত্রাজিতী সত্যভামার প্রণয়ী নাকি? শিকার তো মাত্র একটিই, শিকারি অনেক মনে হচ্ছে।

সাত্যকি— আপনি এত কষ্টকর এবং পরুষ উপমা দেবেন ভাবিনি। আপনিই তো পূর্বে শতধন্বার কথা বলতে গিয়ে বসন্তের মধুর কথা বলেছেন। তাই বলছিলাম— বসন্ত একটি মাত্র পুষ্পের হৃদয়েই মধু সঞ্চিত করে ক্ষান্ত হয় না, সমস্ত পুষ্পের হৃদয়েই তার মধু দেওয়া থাকে। তবে বলুন, মধুকরী এখানে মাত্র একটিই, এবং শুনতে আছি— মধুকরীর স্বভাব খুব চঞ্চল হয় না। কবে, কখন, কোথায় সে মধুচক্র রচনা করবে, সে তার নিজের ওপরেই বড় বেশি নির্ভর করে। আশা করি, আর্যা রুক্মিণীর ভবন সাত্রাজিতী সত্যভামার মধুসঞ্চয়ের ঠিকানা নয়?

কৃষ্ণ অবাক হয়ে চটুলভাবে বললেন— সাত্যকি! ধনুক-বাণ ছেড়ে তুমি কথঞ্চিৎ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে মন দিলে পারো। একটি টীকা রচনা তোমার পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়।

সাত্যকি একটু অপ্রস্তুত হলেন। বিদায়ও নিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

একটি বিশাল ফুৎকারে গৃহমধ্যবর্তী পূর্বোত্তেজিত তৈলপূর প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চাইলেন কৃষ্ণ। প্রদীপের বর্তিকা ফরর্-ফরর্ শব্দে আপত্তি জানিয়ে একবার মৃদু হল, একবার উত্তেজিত হল, শেষে পূর্বের মতোই সদর্পে জ্বলতে লাগল। কৃষ্ণ সুমিত্র-সংঘের দ্বিতীয় পুরুষ সত্রাজিতের গৃহে রওনা হলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর হয়ে গেছে। হয়তো এত রাত্রে সত্রাজিতের বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না।

চার

যে মানুষটির ওপর চুরির দায় এসে পড়ল, যে মানুষটির ওপর খুনের দায় চেপে গেল, সেই মানুষটি কৃষ্ণের মতো এক বিশাল ব্যক্তিত্ব বলেই পূর্বের ঘটনা একটু জানতেই হয়। অনেকেই জানেন— কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে বৃষ্ণিবংশের ধারায়। কৃষ্ণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হলেন এই বৃষ্ণি। তিনি দুটি বিবাহ করেছিলেন। এক স্ত্রী গান্ধার রাজ্যের মেয়ে, অন্যজন মদ্রভূমির। এঁদের নামও তাই গান্ধারী এবং মাদ্রী। গান্ধারীর একমাত্র পুত্রের নাম সুমিত্র। কেউবা তাঁকে অনমিত্র বলেও ডাকেন। আমরা সে সত্যভামার কথা বলছিলাম, তিনি এই বংশেই জন্মেছেন এবং তাঁর পিতার নাম সত্রাজিৎ। আর যিনি খুন হয়েছেন সেই প্রসেন হলেন সত্রাজিতের বড় ভাই।

বৃষ্ণির দ্বিতীয়া স্ত্রী বহুপুত্রবতী ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্রের ধারায় অক্রূরের জন্ম। অক্রূরের পিতামহ পৃশ্নির নামেই তাঁর সংঘটি বিখ্যাত হয়েছে। কৃষ্ণ-বলরাম জন্মেছেন মাদ্রীর দ্বিতীয় পুত্রের বংশে। কৃষ্ণ-বলরাম শূর সংঘের জাতক আর মাদ্রীর তৃতীয় পুত্রের বংশে জন্মেছেন সাত্যকি, তাঁর পিতামহ শিনির নামেই বিখ্যাত হয়েছে শিনি সংঘ বা শৈনেয়গণ। লক্ষণীয়, এঁরা পরস্পর পরস্পরের ভাই-বেরাদর, তবে সম্পর্কটা সামান্য দূরগত। বয়সটাও সবার একরকম নয়। এঁদের মধ্যে সবার বড় যদি হন অক্রূর, তবে সর্বকনিষ্ঠ হলেন সাত্যকি অথবা শতধন্বা। এক জায়গায় এরা সবাই বৃষ্ণি— কেননা, সত্যভামা বলুন আর অক্রূরই বলুন, কৃষ্ণই বলুন অথবা সাত্যকি— এঁদের সবারই বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হলেন বৃষ্ণি। আর পূর্বে যে শতধন্বার কথা বললাম, তিনি জন্মেছেন স্বয়ং বৃষ্ণির নিজের দাদা অন্ধক বংশের ধারায়। শতধন্বার দাদার নাম কৃতবর্মা, মহাভারতের বিশাল যুদ্ধে তাঁর কথা স্মরণ করতেই হবে। তবে যে সময়ের কথা আমরা এখন বলছি, তা ভারতযুদ্ধের অনেক আগের কথা।

সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ একটি মহামূল্যমণি পেয়েছিলেন, যার নাম স্যমন্তক-মণি। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী সত্রাজিৎ সূর্যদেবের বন্ধু ছিলেন। একদিন সূর্যদেব সত্রাজিতের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। দ্বারকার সমুদ্র-তীরে একাকী দণ্ডায়মান সত্রাজিৎ সূর্যের কাছে কোনও বর চাইলেন না; চাইলেন শুধু স্যমন্তক। সূর্যের দেওয়া স্যমন্তক মণির মালা গলায়

দুলিয়ে সত্রাজিৎ যখন দ্বারকার পথে হেঁটে চললেন, তখন মনে হল যেন সূর্যদেবই পা ফেলেছেন ভুঁয়ে।

পৌরাণিক কথকঠাকুর জানিয়েছেন— স্যমন্তক মণি নাকি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করত। অর্থাৎ যে ঘরে এই মণি থাকবে, সে ঘরে অর্থসম্পত্তির অভাব থাকবে না একটুও। এমনকী যে রাজ্যে এই স্যমন্তক মণি থাকবে, সেই রাজ্যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং আর কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগও ঘটবে না। সত্রাজিৎ এই মণিটি এনে তাঁর নিজের দাদা প্রসেনকে দিলেন ভালবেসে। তবে তাঁর এই ভালবাসার মধ্যে স্বার্থ ছিল কিছু। কেন, সেটা বলি।

লোকপরম্পরায় তিনি জানতে পেয়েছিলেন— এই মণিরত্নের ব্যাপারে কৃষ্ণের কিছু কৌতূহল ছিল। সেটা স্পৃহা বা লোভও হতে পারে। অবশ্য কৃষ্ণ এই মণিটি চাইছিলেন দেশের রাজা উগ্রসেনের স্বার্থে। যে মণিরত্ন দেশের এবং দশের উপকার সাধনে সমর্থ, সেটি যদি রাজার কাছে থাকে, তবে দেশেরই তো উপকার। তাব ওপরে কংসের মৃত্যুর পর উগ্রসেন বৃদ্ধ বয়সে নতুন করে রাজ্যের ভার নিয়েছেন। কৃষ্ণের ধারণা ছিল, মণিটি উগ্রসেনের কাছে থাকলে রাজা হিসেবে তাঁর সুবিধে হবে। অন্যদিকে স্যমন্তক-মণির মতো উৎকৃষ্ট বস্তু তো দেশের রাজারই যোগ্য অথবা প্রাপ্য। যাই হোক, কাছের লোকজনের কাছে নিজের তর্ক-যুক্তি, একটু-আধটু প্রকাশ করে ফেলার ফলে সে কথা সত্রাজিতের কানেও এল। কংসহন্তা কৃষ্ণের গৌরব তখন চরমে উঠেছে, জরাসন্ধের বিশাল ব্যক্তিত্বকে ঠেকিয়ে রেখে সমস্ত যদুমুখ্যদের বিশ্বাসও তিনি অর্জন করেছেন। এহেন কৃষ্ণ যদি সত্রাজিতের কাছে স্যমন্তক মণি চেয়ে বসেন, তাহলে সত্রাজিতের পক্ষে না বলা সম্ভবই নয়। ঠিক এই রকম একটা বুদ্ধি করেই সত্রাজিৎ প্রসেনের কাছে মণি রাখতে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ যদি কোনও কারণে মণিটি চান তো সত্রাজিৎ বলবেন— ওটি তো দাদা প্রসেনকে দিয়েছি, কী করে আপনাকে দিই? অন্যদিকে কৃষ্ণ যদি প্রসেনের কাছে মণি চান তো তিনি বলবেন— ছোট ভাইয়ের জিনিস। ভালবেসে দিয়েছে। কী করে আপনাকে দিই। অর্থাৎ না দেবার যুক্তি সাজানোই ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, সুমিত্র-সংঘের প্রথম পুরুষ সত্রাজিতের দাদা প্রসেনের কাছে স্যমন্তক মণিটি কিন্তু চেয়েওছিলেন কৃষ্ণ। প্রসেন অবশ্যই দেননি।

অন্যদিকে কৃষ্ণও জোর খাটাননি। হাজার হলেও এঁরা তাঁর আত্মীয় স্থানীয়, এঁদের সঙ্গে পূর্ব পিতামহক্রমে তাঁর রক্তের সম্পর্ক আছে। তার ওপরে আছে জনমত। যাদবদের মধ্যে সংঘমুখ্যরাই জনমত তৈরি করেন। প্রসেন এবং সত্রাজিৎ অন্ধকবংশের প্রধান পুরুষ। কৃষ্ণ তাই জোর করেননি। জোর করলে তিনি মণি পেতেন। জেনেও জোর করেননি।

কৃষ্ণ মণি না পেয়ে ফিরে গেলেন এবং মণির অধিকার নিয়ে আর মাথাও ঘামাননি। কিন্তু প্রসেনের নিজের অতিরিক্ত সতর্কতার কারণেই স্যমন্তক মণি নিয়ে নানা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। সর্বত্র শোনা গেল— প্রসেন মহামূল্য মণিটি গলায় দুলিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন এবং একটি পাহাড়ের কাছে বনের মধ্যে তিনি খুন হয়ে গেছেন। মণি আর তাঁর গলায় নেই এবং এদিক-সেদিক সেটি পড়েও নেই। পরিষ্কার খুন।

যাদবদের সমস্ত সংঘমুখ্যের কাছে প্রসেনের মৃত্যুর খবর পৌঁছল। প্রত্যেকে বলাবলি করতে লাগলেন— কৃষ্ণ এক সময় প্রসেনের কাছে মণিটি চেয়েছিলেন, প্রসেন দেননি। হয়তো সেই কারণেই আজ প্রসেনকে এইভাবে বেঘোরে বনের মধ্যে মারা যেতে হল। যদুকুলের প্রত্যেকেই কৃষ্ণের অসাধারণ রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং তাঁর কূট অভিসন্ধির বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, অন্যে যা পারেন, কৃষ্ণ তা নিশ্চুপে সাবহেলে করতে পারেন। এ খুনও কৃষ্ণই করেছেন এবং মণিটি যে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, এর পিছনেও কৃষ্ণের কারসাজি আছে। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় যাদব সংঘমুখ্যদের জরুরি সভা বসেছে মহারাজ উগ্রসেনের নেতৃত্বে এবং কৃষ্ণের আত্মনিন্দার প্রসঙ্গে সভা উত্তাল হয়ে ওঠায় সে সভায় বসে থাকতে পারেননি। তিনি সভাশেষে যদুমুখ্যদের সিদ্ধান্তগুলি শুনতে চাইছিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ কৃষ্ণের মতো এক বিরাট মানুষের ওপর অধিক্ষেপ রচনা করে যে সভা শুরু হয়, সে সভায় সিদ্ধান্ত হওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু সভার বহুলাংশের মনোভাবটা কী— তা সাত্যকির মাধ্যমে কৃষ্ণের কানে এসেছে এবং আমরাও তা শুনেছি। কী অবস্থায়, কোন সময়ে হতভ্রাতৃক সত্রাজিতের কাছে কৃষ্ণ গেছেন, তা আমরা বলেছি। এইবার অন্যত্রও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।

পাঁচ

অন্ধক-বৃষ্ণি অথবা ভোজকুলের মধ্যে যত রমণী আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী হলেন সত্রাজিতের কন্যা। সত্যভামা। যাদবদের রাজনৈতিক সামাজিক পরিমণ্ডলে সামান্য গণতান্ত্রিকতার স্পর্শ থাকায় এই সমাজের রমণীরাও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রমণীদের চেয়ে খানিকটা উদারপন্থী এবং খানিকটা প্রগতিশীল। সত্যভামা অবশ্য সবার চেয়ে আরও এককাঠি এগিয়ে। পিতার আদরিণী কন্যা হওয়ার ফলে স্ত্রীসুলভ সংকোচ এবং ভয় তাঁর মধ্যে একটু কম। খানিকটা স্বাধীনচেতা এবং খানিক প্রগল্‌ভাও বটে। দ্বারকার সংঘমুখ্যদের ভবনে তিনি একাকিনী যাতায়াত করেন এবং যাদব যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি একাশ্ববাহিত লঘু রথ তীব্র বেগে সঞ্চালিত করতে পারেন।

সত্যভামার সৌন্দর্যের মধ্যে এমনই এক উদ্দাম-মাধুর্য আছে, এমনই এক দীপ্র প্ররোচনা আছে, তাতে কোনও যুবক তাঁর দিকে প্রেমনত নয়নে একান্তে তাকিয়ে থাকতে পারে না। তাঁর মনের স্পর্শ পেতে হলে এমনই উচ্ছলভাবে তাঁর সঙ্গে মিশতে হয়, তাঁর নব যৌবনোদ্ধত বিচিত্র অত্যাচার এমনই সহিষ্ণুভাবে মেনে নিতে হয় যে, হয় সে যুবক এক মুহূর্তে সুন্দরী সত্যভামার দাসে পরিণত হয়, নয়তো অক্ষম ঈর্ষায় পলায়ন করে। অন্যদিকে, যে মুহূর্তে একটি যুবক তাঁর দাসে পরিণত হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই ওই যুবককে সত্যভামার আর পছন্দ হয় না। সেই যুবকের সমস্ত বৈচিত্র্য যেন ফুরিয়ে যায় তাঁর কাছে। সুন্দরী সত্যভামার প্রণয়প্রার্থী অনেক; তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার সত্যভামার প্রেমের সঙ্গে সত্রাজিতের স্যমন্তক মণিটির জন্যও অত্যন্ত লালায়িত।

সত্যভামা এঁদের কাউকেই পছন্দ করেন না। তাবৎ পুরুষসমাজের ওপর তাঁর এই নাসিকা-কুঞ্চিত ব্যবহার দেখে সত্রাজিৎ মনে মনে শঙ্কিত হন, কিন্তু তিনিও যে আপন কন্যাটিকে খুব ভাল করে বোঝেন, তা নয়। ভারী আশ্চর্য, পুরুষসমাজের কোনও যুবক তাঁকে কী বলল, তার উত্তরে তিনি কী বললেন, কীভাবে তিনি কার সপ্রেম আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন— এই সমস্ত কথা যাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন সত্যভামা, তিনি তাঁর সমবয়সি নন, কোনও সখীও নন। তাঁর বয়স সত্যভামার চেয়ে অন্তত পাঁচ-ছ বছর বেশি। তিনি কৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী।

সত্যভামার উচ্ছল উদ্দাম ব্যবহার পরম প্রশ্রয়ে রুক্মিণী মেনে নেন। আর যখন একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, তখন সমস্ত সমস্যার সমাধান হিসেবে একটিই কথা বলেন তিনি। বলেন— ওই আমারটির সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত তোর বিয়ে দিতে হবে। নইলে তোর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। সত্যভামা তখন রুক্মিণীকে ঠেস দিয়ে বলেন— তোমার স্বামীটি তো আবার বাগদত্তা কন্যাকে চুরি না করে বিয়েই করতে পারেন না। তা আমি ভাবছি— একজনকে আমিই কথা দেব এবং আমার ধারণা— অক্রূরমশাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

পৃথিবীর অক্রূরের ওপর রুক্মিণীর কিছু রাগ আছে। তিনি জানেন— অত্যাচারী কংসের দূত হয়ে তিনিই প্রথম কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে আনতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বামীটিকে ঠেলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর মুখে। এর মধ্যে যে অক্রূরের কিছু রাজনৈতিক চাল ছিল, সে সব কথা রুক্মিণী বুঝতে চান না, বুঝতে পারেনও না। কংসের দূত হয়ে তাঁর প্রিয় স্বামীটিকে অক্রূর কেন নিয়ে এসেছিলেন— একমাত্র এই অপরাধেই অক্রূর রুক্মিণীর কাছে এক পীড়াদায়ক মানুষ বলে পরিচিত।

রুক্মিণী যখন সত্যভামার মুখে অক্রূরের নাম শুনলেন, তখন তাঁর একটু রাগই হল। কপট রাগ দেখিয়ে বলেও ফেললেন সে কথা— আর লোক পেলি না যাদবকুলে, ওই অক্রূর? ওঁর বয়স কত জানিস?

সতভামা বললেন— বয়স তো কী হয়েছে? আরও বেশি ভালবাসবে। বৃদ্ধস্য তরুণীর প্রবাদটা জান না নাকি?

রুক্মিণী যেন বিশ্বাসই করে নিলেন সত্যভামার কথাটা। বললেন— যা, কথা দিয়ে দে? তবে কিনা, বুড়োমানুষ বর চাস তো, মহারাজ উগ্রসেনকেই বলে দেখতে পারিস। তিনি তো বৃদ্ধস্য বৃদ্ধ, তোকে আরও বেশি ভালবাসবেন।

সত্যভামা বললেন— তিনি তো আর আমার কাছে কোনও মধুর প্রস্তাব করেননি। যিনি প্রস্তাব করেছেন, তাঁকে নিয়েই তো কথা বলব।

—সে কীরে? অক্রূরমশাই তোর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন নাকি?

—দেননি আবার! সেদিন আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। একা-একাই রথে চড়ে। ইচ্ছে ছিল, রৈবতক পাহাড়ের পথটা ভাল করে চিনব। হঠাৎ দেখি, পাহাড়ি পথ বেয়ে এক অশ্বারোহী আমারই পশ্চাতে আসছে।

—তুই ভয় পেলি না?

—ভয়ের কী আছে? সে রকম বিপদ দেখলে প্রেম নিবেদন করতাম, ভক্ষক তখনই রক্ষকে পরিণত হতেন।

—নিজের ওপরে তোর তো খুব বিশ্বাস? তা, সেই অশ্বারোহী কে? অক্রূরমশাই?

—আবার কে? তিনি আমার কাছাকাছি এসে প্রথমেই আমাকে গুরুঠাকুরের মতো রথচালনার বিজ্ঞান শেখাতে আরম্ভ করলেন। বললেন— উচ্চাবচ উদ্‌ঘাতিনী ভূমিতে রথচালনা করার শিল্প এখনও তোমার রপ্ত হয়নি, সত্যভামা। দাঁড়াও, আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলেই সেই যে তিনি আমার রথে চড়ে, আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমার অশ্বরশ্মি সংযমনের মুষ্টিবদ্ধ হাতখানির ওপরে নিজের মুষ্টি স্থাপন করে রথ চালাতে লাগলেন, আর সে মুষ্টি শিথিল হল না। এই প্রশিক্ষণ যেন খুবই প্রয়োজন ছিল।

—তা হলে আবার বাগদত্তা হবার কথা কী বলছিলি, এ তো পাণিগ্রহণ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

—ব্যাকরণে ভুল করছ— একে পাণিগৃহীতা বলে, পাণিগৃহীতী নয়।

—ওই হল। তা তার পর কী হল? রথ কি রৈবতক পর্বতের চূড়ায় গিয়ে থামল?

—ঠিক তা নয়। তবে তাঁর রথচালনার শিল্পে এবং পাহাড়ি পথের গুণে তিনি এমনভাবেই আমার গায়ের ওপর এসে পড়ছিলেন যে, তাঁর রথচালনার শিল্প অতি সমৃদ্ধ বলে মনে হল। তবু জেনো এই শিল্পই তাঁর শেষ কথা নয়।

রুক্মিণী অবাক হয়ে বললেন— শেষ কথার আগেই তো কর্মযোগ শুরু হল। এর পরেও আবার শেষ কথা কীই রে!

সত্যভামা বললেন— অক্রূর মানুষটা যেন কেমন! কীই যে তিনি চান, তা ভাল বোঝা যায় না। যে ব্যক্তি নানা উপায়ে আমার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিল, সেই অক্রূর হঠাৎই আমাকে বললেন— হার্দিক্য কৃতবর্মার নাম তুমি শুনেছো, তাঁকে দেখেও থাকবে তুমি উৎসবে, যজ্ঞকার্যে, অথবা পথে কোথাও।

সত্যভামা অবাক হয়েছিলেন। মানুষটি ভাল না মন্দ, নাকি বিভ্রান্ত, অথবা বিকৃত— যে কিনা এক রমণীর অতিলঘু স্পর্শ লাভের জন্য হাতের ওপর হাত রাখছে অছিলায় সে আবার আরেক জনকে ডেকে আনছে। সত্যভামার

এই সংশয়িত ভাব অক্রূর বুঝে ফেলেছিলেন বোধহয়। তিনি কৃতবর্মার গৌরব প্রকাশ করে বললেন— দেশ-বিদেশ থেকে অথবা যাদবদের অঙ্গরাজ্য থেকে সামন্ত রাজারা যদি যুদ্ধের সময় যাদবদের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান, তবে সাধারণত হৃদিকপুত্র কৃতবর্মাকেই সেনাপতি হিসেবে পাঠানো হয়।

অক্রূরের মুখে কৃতবর্মার কথা শুনে রুক্মিণীর যেন সব কিছু গুলিয়ে গেল। ভাবলেন— কৃতবর্মাও তো আরেক প্রৌঢ়, তাঁর আবার কী কথা থাকতে পারে এই অষ্টাদশী বালিকার কাছে। প্রৌঢ়দের মনেও যে রমণীর মন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা থাকতে পারে, রুক্মিণী সে কথা যেন বিশ্বাসই করতে চান না। প্রদ্যুম্নের জননী হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর এমন একটা আলুথালু অবিন্যস্ত ভাব হয়েছে যে, তিনি ভাবেন— প্রৌঢ় পুরুষের মনে পুত্রের জন্য বাৎসল্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না বা থাকা উচিত নয়।

অক্রূর সত্যভামাকে বলেছিলেন— হার্দিক্য কৃতবর্মা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তোমাকে খুব আপন করে নিতে চান। সত্যভামা বলেছিলেন— তিনি তো যথেষ্ট আপনই আছেন। একজন বৃষ্ণিমুখ্য অন্ধক গোষ্ঠীর মুখ্য পুরুষকে যথেষ্ট আপনই ভাবেন। অক্রূর বললেন, তা ভাবেন। তবে তিনি সম্পর্কটা আরও গাঢ়তর করতে চান। অবশ্য রাজকন্যার সঙ্গে এখানে রাজ্যের অভিলাষটাও আছে।

এ কথার অর্থ?

অক্রূর বললেন, অর্থ খুব পরিষ্কার। সত্যভামার সঙ্গে স্যমন্তক মণি।

সত্যভামা রাগে জ্বলে উঠেছিলেন। স্যমন্তকের জন্য যাঁরা লালায়িত, সত্যভামা অন্তত তাঁদের আপন করে নিতে চান না, সম্পর্কও গাঢ়তর করতে চান না।

অক্রূর বললেন, তুমি ক্ষিপ্ত হচ্ছ কেন, সত্যভামা? এমন লোকও তো এই সপ্তদ্বীপা বসুমতীতে আছেন, যিনি স্যমন্তকের অধিকার ছেড়েও সত্যভামার জন্য লালায়িত হবেন। সত্যভামা বলেন, জানি। তার কথা জানি। অজাতগুম্ফ সেই বালক। শতধন্বা। হার্দিক্য কৃতবর্মার ছোটভাই শতধন্বা। কত পার্থক্য? তাই না?

অক্রূর নিজের কথা বলবেন বলে এতক্ষণ ভণিতা করে শেষ পর্যন্ত বিফল হলেন। শতধন্বার কথায় চলে আসায় তাঁর নিজের বড় অসুবিধে হল। এখন

কী বলবেন তিনি? শেষে এটা-সেটা সাত-পাঁচ ভেবে শতধন্বার প্রসঙ্গ টেনেই অক্রূর বললেন— কোনও সন্দেহ নেই। সে বালক আকাশকুসুম রচনা করছে মূর্খের মতো। তবে জেনো, তোমার প্রেমের জন্য গুম্ফের যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে উপরি হিসেবে শ্মশ্রুও দিতে পারি। ও দুটিই আমার আছে। স্যমন্তকের কোনও প্রয়োজন আমার নেই, আমি শুধু সত্যভামার অনুমোদন চাই। আর কিছু নয়।

সত্যভামা সব বুঝেছিলেন এবং অক্রূরকে তিনি বাড়তে দেননি। বলেছিলেন, আপনি যাদব-কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। মহারাজ কংসের আমলেও আপনি মন্ত্রী ছিলেন, আজ বৃদ্ধ উগ্রসেনেরও আপনি প্রবর মন্ত্রী। আমার মতো এক ক্ষুদ্র রমণীর ইচ্ছা এবং অভিলাষে আপনার কী আসে যায়? আমি পিতার অধীন। আমার অনুমোদনের চেয়েও তাঁর অনুমোদনের মূল্য অনেক বেশি।

এক দণ্ডও বিলম্ব না করে অক্রূর বলেছিলেন, আমি সত্রাজিতের সঙ্গে দেখা করতে যাব অচিরেই। কিন্তু ওই দেখা করাটা আর সেইভাবে হয়ে উঠল না। তিনি এসেছিলেন বটে, তবে অন্য কারণে। সত্রাজিতের বাড়িতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনের মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল। সংবাদ এল— স্যমন্তক মণি চুরি হয়ে গেছে। যে মহামূল্য মণিটি রক্ষা করার জন্য সত্রাজিৎ মণিটি দাদার কাছে ন্যাস হিসেবে রেখেছিলেন, সেই মণিটিও গেল, তার সঙ্গে গেল সুমিত্র সংঘের জ্যেষ্ঠ পুরুষ, প্রসেনের প্রাণ।

খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না এবং কৃষ্ণ যেহেতু সত্রাজিতের দাদা প্রসেনের কাছে স্যমন্তক মণি চেয়েছিলেন, অতএব সত্রাজিৎ তাঁকেই প্রথম সন্দেহ করলেন। কন্যা সত্যভামা কৃষ্ণের ভবনে যাতায়াত করেন বলে তাঁর সামনে এই সন্দেহ ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করলেন না সত্রাজিৎ। তার কারণ অক্রূর এসেছিলেন তাঁর কাছে।

সত্যভামা নানা দিক থেকে জর্জরিত বোধ করলেন। একে জ্যেষ্ঠ-তাত প্রসেনের মৃত্যু, তার মধ্যে কৃষ্ণের ওপর এই সন্দেহ— দুয়ের দ্বৈরথে সত্যভামা বড় বিচলিত বোধ করলেন। কৃষ্ণের চুরিবিদ্যার ফিরিস্তি দিয়ে দিন-রাত তিনি তাঁর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে এসেছেন। কিন্তু আজ যখন স্যমন্তক মণি চুরির দায় কৃষ্ণের ওপরেই এসে পড়ল তখন এ মানুষটার জন্য তাঁর মায়া হল।

যাদবদের সমস্ত গোষ্ঠীর ভালর জন্য যিনি সব সময় নিজেকেও বিপর্যস্ত করেন, সেই মানুষটিকে জড়িয়ে এই চুরির অপবাদ সত্যভামাকে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল করে তুলল।

ক্ষীণ কণ্ঠে একবার সত্যভামা পিতা সত্রাজিৎকে বলেওছিলেন— তুমি আর কাউকে সন্দেহ কর না কেন, পিতা?

সত্রাজিৎ বলেছিলেন— আমার আপন হাতের উপার্জিত মণির ওপর আর কারও দৃষ্টি ছিল না। আমার এই আকস্মিক লাভে আর কারও চক্ষুর পীড়াও উৎপন্ন হয়নি। এক ওই কৃষ্ণ ছাড়া। সে আমাকে বলেছিল— মণিটি দেশের রাজাকেই মানায় ভাল। দাদা প্রসেনের কাছে সে মণিটি চেয়েও বসেছিল। এর পরেও আমাকে বুঝতে হবে— এটা কৃষ্ণের কাজ নয়? তুমি জান না বৎসে, কৃষ্ণ পারে না হেন কাজ নেই।

সত্যভামা অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বয়ং অক্রূরমশায়ের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন— কৃতবর্মা এই স্যমন্তক মণি চান। অক্রূরমশাই যে সরস প্রস্তাব করেছেন তাঁর কাছে, তার পিছনেও স্যমন্তক মণির উদ্দেশ্য আছে বলে সত্যভামার ধারণা। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাবলি পিতার কাছে বলার সময় এটা নয়। কিন্তু পিতার মুখে কৃষ্ণের সম্বন্ধে এমন জঘন্য উক্তি তিনি শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণের নানান কীর্তিকাহিনি শুনে শুনে তাঁর অন্তরে কি কৃষ্ণ এক বীরের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন? সত্যভামা পিতার কথা সহ্য করতে পারলেন না। একটু রাগত স্বরে বলে উঠলেন—

—'কৃষ্ণ পারে না হেন কাজ নেই'— কথাটা বড় সহজ হয়ে গেল না পিতা?

—সহজই তো। দিন-রাত্রির মতো সহজ। জলধারার নিম্নগতির মতো সহজ।

—এতই সহজ যে, অত্যাচারী কংস যখন যদুকুলের সমস্ত সংঘমুখ্যদের পদানত করে রেখেছিলেন, তখন কার বুদ্ধিতে তোমরা কৃষ্ণের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছিলে! তিনি পারেন না হেন কাজ নেই, বলেই কংস নিহত হয়েছেন। তিনি পারেন না হেন কাজ নেই বলেই যাদবরা মথুরা ছেড়ে এসেছে এবং আজ তাঁরই নির্মিত দ্বারকার সুধর্মা সভায় বসে তাঁকেই চুরির অপবাদ

দিচ্ছে। তিনি পারেন না হেন কাজ নেই বলেই, আজও মগধরাজ জরাসন্ধ সসৈন্যে দ্বারকায় প্রবেশ করতে পারেননি। এহেন সব কাজ যিনি করেছেন, তাঁরই তো স্যমন্তক মণি চুরি করা সাজে, তাই না?

সত্রাজিৎ লজ্জিত হলেন, একই সঙ্গে চমকিতও হলেন একটু। তাঁর আদরিণী কন্যার মনে কৃষ্ণ যে এভাবে জায়গা করে নিয়েছেন, তা তিনি এমন করে বুঝতেও পারেননি।

আসলে কৃষ্ণের সম্বন্ধে সত্রাজিতের ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে— অক্রূর তাঁর বাড়িতে আসার পর থেকে। প্রসেনের মৃত্যুর পর অক্রূর তাঁকে সমবেদনা জানিয়ে বলেছিলেন— সুমিত্র-জ্যেষ্ঠ প্রসেনের মৃত্যুর সংবাদ আপনার কাছে সহনযোগ্য নয়, তা আমি বুঝি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ আমার কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটি বিশ্বস্ত লোককে হত্যার স্থানে পাঠিয়েছিলাম। পাঠিয়েছিলাম এই কারণে যে, প্রসেন তো মারা গেছেনই, তাঁকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে অন্তত মহামূল্য মণিটি যাতে আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তো আমি সেই চেষ্টাই করেছিলাম।

অক্রূর সত্রাজিৎকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন— আমরা বৃষ্ণি-অন্ধক গোষ্ঠীর সকলেই প্রসেনের এই মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু ভারী আশ্চর্য— প্রসেনের হাতে মৃগ-শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় তরবারি এবং ধনুক-বাণ ছিল। তৎসত্ত্বেও একটি সিংহ কী করে তাঁকে বধ করল, তা আমার বোধগম্য নয়। আর মণিটিও তো কোথাও নেই! নরমাংসে সিংহের লোভ থাকতে পারে বিলক্ষণ। কিন্তু একটি সিংহ তো আর স্যমন্তক মণি চর্বণ করবে না। আমাদের গভীর সন্দেহ— কোনও লুব্ধ ব্যক্তি, যিনি স্যমন্তক মণি অধিকার করতে চেয়েছিলেন, অথচ পাননি, তাঁরই এই কাজ।

অক্রূরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই সত্রাজিতের মনে কৃষ্ণের পূর্ব সংলাপ ক্রিয়া করতে থাকে— মণিটি দেশের রাজাকেই মানায়। এটি তাঁরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। অক্রূরের সন্দেহে সত্রাজিৎ প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান— প্রসেনের হত্যা এবং মণিহরণ দুই-ই কৃষ্ণের কাজ। কিন্তু কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা যাদবগোষ্ঠীর সর্বত্র কর্ণাকর্ণি হবার পরেও আজ তাঁর নিজের মেয়ে কেন এইভাবে বলছে সেই ভেবে তিনি আশ্চর্য হলেন।

ছয়

প্রসেনের মৃত্যু বা মণিহরণের পর যাদব গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যে সত্রাজিতের জন্য নতুন মায়া দেখা দিল। অক্রূর তো এসেই ছিলেন। এসেছিলেন কৃতবর্মাও। এমনকী সেই শতধন্বাও এসেছিলেন অক্রূর এবং কৃতবর্মার অগোচরে। শতধন্বা অবশ্য সত্রাজিতের চাইতে সাত্রাজিতী সত্যভামাকেই সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বেশি। কৃষ্ণ এতদিন আসেননি। তাঁর সম্বন্ধে সত্রাজিতের সন্দেহ, অন্যান্য যাদব সংঘমুখ্যদের সন্দেহ এবং সুধর্মা সভায় সকলের মন্তব্য শুনে তিনি সত্রাজিতের ভবনে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কৃষ্ণ যখন সত্রাজিতের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন প্রভাতকাল। সুধর্মা সভার সাময়িক আবাস থেকে আগের রাত্রে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় রুক্মিণীর সঙ্গে তাঁর বেশি কথা হয়নি। তাঁকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বৈদর্ভী রুক্মিণী সেটাকে পথশ্রমের ক্লান্তি মনে করে তাঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করেছেন শীঘ্র। চারদিকের সমস্ত কথাবার্তা যথাসম্ভব চেপে রেখে, যথাসম্ভব স্মিতহাস্যে রুক্মিণীকে সন্তুষ্ট করে কৃষ্ণ শয়ন করেছিলেন। পরের দিন প্রভাতের আলো ফুটতেই কৃষ্ণ প্রভাতকালীন স্নানাহ্নিক সেরে রুক্মিণীকে জানালেন— তিনি সত্রাজিতের বাড়ি যাচ্ছেন। রুক্মিণী কৃষ্ণকে বললেন— তাঁর যে বড় বিপদ। কৃষ্ণ বললেন— সেই কারণেই যাচ্ছি।

কৃষ্ণ যখন সত্রাজিতের ভবনে পৌঁছলেন, তখন বেলা দুই দণ্ড পার হয়ে গেছে। দ্বারী সযত্নে কৃষ্ণকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে সত্রাজিৎকে ডাকতে গেল। সত্যভামা পূর্বাহ্ণেই প্রাসাদের উপরিভাগ থেকে কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছেন। এবং কৃষ্ণও তাঁকে দেখেছেন। এখন এই মুহূর্তে একটি কথা-বলা শুকপাখিকে হাতের আঙুলে নিয়ে কৃষ্ণের সামনে দিয়ে ভবনলগ্ন উদ্যানের দিকে যাবার মতো ভাব করছেন সত্যভামা। কিন্তু তাঁর যাবার ইচ্ছা নেই একটুও।

কৃষ্ণ বললেন, তুমি এর মধ্যে রুক্মিণীর কাছে যাওনি, সত্যা? সত্যভামা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গত হয়েছেন, সেটা একটা কারণ। অন্য দিকে লোকে বলছে, একজন তথাকথিত তস্করের গৃহে গতায়াত করার থেকে এই শুকপাখির সঙ্গে কথোপকথন শ্রেয়।

সত্যভামার কথা শেষ হবার আগেই সত্রাজিৎ কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁর মনে যাই থাক, সামনাসামনি তাঁকে অবহেলা করা বা লঘু করা সত্রাজিতের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কৃষ্ণকে দেখামাত্রই সত্রাজিৎ মেয়েকে বললেন— তুমি কৃষ্ণের ভোজন-আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছ তো? সত্যভামা বললেন, 'সত্রাজিতের গৃহে আপ্যায়নের ত্রুটি হবে না। তবে এই গৃহের ভোজন তাঁর জীর্ণ হবে কি না, সেটাই দেখার।' সত্রাজিৎ লজ্জিত হয়ে বললেন— তুমি কাকে কী বলছ, মা? কৃষ্ণ ঝটিতি উত্তর দিলেন— ও ঠিকই বলছে। জ্যেষ্ঠতাত প্রসেনের মৃত্যুর পর যাদবকুলে যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে, সে ছায়া ভেদ করে সামন্তক মণির নির্বাপিত কিরণ তাঁদের চোখে এসে লাগছে। প্রসেনের মৃত্যুর চেয়েও এখন আমি অধিক আলোচনার বিষয়।

সত্রাজিৎ অপ্রতিভ বোধ করলেন। কোনও মতে নিজের দোষ কাটানোর জন্য তিনি অক্রূরের প্রসঙ্গ টেনে বললেন— আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলিনি, বৎস! তবে অক্রূর এসে. .

সত্রাজিৎকে স্তব্ধ করে দিয়ে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন— অক্রূর, কৃতবর্মা... এখন অনেকে অনেক কিছু বলবেন। তাঁদের গাঢ় সমবেদনার কারণও আমি সবিশেষ জানি। তবে সমস্ত ঘটনা সুধর্মা সভায় আলোচিত হবার পর আমার দিক থেকে দায় আসে কিছু করার। আমি তাই করতে এসেছি।

সত্রাজিৎ কী বলবেন— ভেবে পেলেন না। কিন্তু কৃষ্ণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সত্যভামা বললেন— জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর আজ তৃতীয় প্রভাত। এত দিনে তুমি কী করতে এসেছ?

—আমি অক্রূর কিংবা কৃতবর্মা নই, সত্যভামা। প্রসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে দূত এসে খবর দিয়েছিল, তাকেই আপ্তপুরুষ ধরে নিয়ে মণিহরণের সমস্ত দায় কৃষ্ণের ওপর চাপিয়ে দিলাম, আর জনান্তিকে সত্যভামাকে বলে গেলাম— মণিরত্নের সংবাদ নিয়ে কী হবে, সত্যা। তুমি যে তার চেয়েও অনেক বড় রমণী-মণি। আমি সেই মানুষ নই, সত্যভামা। সত্যভামার মুখে ক্ষণিকের জন্য কথা জোগাল না। পিতার সামনে কৃষ্ণ যে এইভাবে তাঁকে অপমান করবেন— এতটা তিনি ভাবেননি। কিন্তু তিনি যখন রূঢ় কথাই বলেছেন, তখন আরও রূঢ় হয়ে তিনি জবাব দিলেন— সত্যভামার কথা হচ্ছে না। মণিহরণের কথা হচ্ছে। সে দায় যখন তোমার ওপরেই চেপেছে, তবে সঠিকভাবে তোমারও ব্যাখ্যাত হওয়া

প্রয়োজন। নচেৎ আর্যা রুক্মিণীর গৃহে গতায়াত কি সম্ভব?

—মণিহরণের দায় যখন আমার ওপরেই বর্তেছে, তখন ঘটনাস্থল থেকেই সে মণি আমি নিয়ে আসব। সাক্ষী থাকবেন অন্য যাদবরা। কিন্তু তার জন্য আর্যা রুক্মিণীর গৃহকে এমন করে কলঙ্কিত কোরো না। সে গৃহ যতখানি আমার, তার চাইতে অনেক বেশি আর্যা রুক্মিণীর।

সত্যভামা পরিধানের অঞ্চলপ্রান্ত নিজের চক্ষুর ওপর স্থাপন করে উদ্গত অশ্রু নিবারণ করলেন। তারপর দ্রুতগতিতে প্রায় ছুটেই চলে গেলেন অন্তর্গৃহের দিকে। যাবার সময় তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটি শব্দ উচ্চারিত হল— আর্যা রুক্মিণী! সত্রাজিৎ কৃষ্ণের গম্ভীর ভাবভঙ্গি দেখে একটু ভয় পেলেন। বললেন— আমার এই কন্যাটি কিঞ্চিৎ প্রগলভা। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না, কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আসন থেকে উঠে পড়েছেন ততক্ষণে। সত্রাজিতের বিনয় ভাষণ শুনে একটু ব্যঙ্গ করেই প্রত্যুত্তর দিলেন— সত্যার কথায় আমি কিছুই মনে করিনি। ও আমার সঙ্গে এইভাবেই কথা বলে। কিন্তু প্রগলভা আপনার কন্যা নন। তার চেয়েও অনেক বেশি প্রগলভ এই যাদবকুল, যারা বিনা দোষে আমাকে এক অপরাধী তস্করে পরিণত করেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর্য! যথাসময়ে আপনি স্যমন্তক মণির পুনরধিকার লাভ করবেন।

কৃষ্ণ সত্রাজিতের ভবন ছেড়ে দ্রুতগতিতে অশ্বারোহণ করলেন। সত্রাজিৎ ভয় পেলেন।

সাত

কৃষ্ণ গৃহ ফিরেই স্নানাহার সেরে রুক্মিণীব কাছে বিদায় নিলেন। তাঁকে জানালেন— আমার ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে। তুমি একদিন সাত্রাজিতীকে নিজেই গিয়ে নিয়ে এসো। নানা কারণে তাঁর মন বড় দুঃখিত হয়ে আছে। রুক্মিণী স্বীকার করলেন কৃষ্ণের কথা।

রুক্মিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েই কৃষ্ণ প্রথম যাদবদের সেনানিবাসে এসে একটি ছোট সৈন্যবাহিনী চাইলেন। তিনি চান— এই সৈন্যরা জ্যেষ্ঠ বলরামের নেতৃত্বে তিন দিন পরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হোক রৈবতক পাহাড়ের কাছে,

একটি জায়গায়। সেনাধিকারিক স্বীকৃত হবার পর কৃষ্ণ বৃদ্ধ মহারাজ উগ্রসেনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানালেন এবং উগ্রসেনের সঙ্গে আলোচনা করে কতকগুলি আপ্তপুরুষকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা মনুষ্য এবং পশুদের ক্রিয়াকলাপ, পদচিহ্ন, অঙ্গুলির চিহ্ন— সবই আন্দাজ করতে পারেন।

কৃষ্ণ এই আপ্তপুরুষদের নিয়ে দ্রুত বনের পথ ধরলেন। তিনি শ্রুত আছেন— প্রসেন একটি পর্বতের কাছে নিহত হয়ে পড়ে আছেন। যে এই সংবাদ দিয়েছিল, সে এক আদিম জনজাতির মানুষ। তার বসতি নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে। সে প্রসেনেকে মৃত দেখে যাদব রাজ্যের আটবিক প্রান্তপালকে প্রথম জানিয়েছিল এবং সেই খবর আটবিকই পৌঁছে দেয় যাদবদের সংঘমুখ্যদের কাছে। আটবিক কৃষ্ণকে খুব ভাল করে চেনে এবং তাঁকে দেবতাদের মতো দেখে। প্রথমে আটবিক যখন সংবাদ দেওয়ার জন্য পৌঁছেছিল তখনই তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— ঘটনাস্থলের এক ক্রোশের মধ্যে যেন কেউ না প্রবেশ করে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, 'মহারাজ উগ্রসেনের আদেশ।' আর মৃতদেহটিকে সযত্নে রক্ষা করবে।

আটবিকের দৃঢ়তায় কেউই মৃতদেহের কাছাকাছি যেতে পারেনি; এমনকী অক্রূরমশায়ের যে লোকটি ঘটনাস্থলে এসেছিল, তাকেও দূর থেকেই মৃতদেহ দেখতে হয়েছিল। মহারাজা উগ্রসেন কৃষ্ণের সঙ্গে গোপন পরামর্শের পর আদেশ দিয়েছিলেন— মৃতদেহের পশ্চান্মরণ-পরীক্ষণ চলবে এবং মৃতদেহ এখনই সত্রাজিতের হাতে দেওয়া যাবে না। এই নির্দেশ অনুযায়ী কতকগুলি আপ্তপুরুষ পূর্বেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে এবং মৃতদেহের গায়ে লতাপত্রের সুরভি লেপন করে তারাই মৃতদেহটিকে রক্ষা করছে।

কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বস্ত আপ্তপুরুষদের নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখলেন— জায়গাটি পার্বত্য বনভূমির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আটবিক জানাল— এই পথ ধরে গোপনে মথুরা পৌঁছনো যায়। রৈবতক পাহাড় এখান থেকে খুব দূরে নয়, বরঞ্চ বলা যায় এখানকার ছোট ছোট পাহাড়গুলির সঙ্গে রৈবতক পাহাড়কে একত্র করলে যে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়, তারই একটি বনপথ ধরে গিরিখাদ বেয়ে মানুষজন মথুরায় পৌঁছয়। সাধারণ লোক এ পথে চলে না। ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠীরা দ্বারকার প্রশাসক পুরুষদের ফাঁকি দিয়ে নানা গুপ্তদ্রব্য অশ্বতরের পৃষ্ঠলগ্ন করে মথুরায় নিয়ে যায়। সেখানে দাম বেশি পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত আটবিক বনপাল এই শ্রেষ্ঠী

পুরুষদের ওপর নজর রাখে। তার নেতৃত্বে একটি ছোট্ট রক্ষিবাহিনীও এখানে রক্ষাকর্ম চালায়। এই জায়গার অধিবাসীরা সকলেই আদিম জনগোষ্ঠীর লোক।

প্রসেন গলায় স্যমন্তক মণি দুলিয়ে মৃগয়ায় এসেছিলেন— সাধারণ্যে এই কথা প্রচারিত হলেও কৃষ্ণ এই বনপথে প্রসেনকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে সিদ্ধান্ত নিলেন— তিনি মথুরায় যাচ্ছিলেন। তার কারণ হল— কৃষ্ণ এক সময় প্রসেনের কাছে মণি চেয়েছিলেন এবং মণিটি যদি কৃষ্ণ ছিনিয়ে নেন এই ভয়েই তিনি মথুরা নগরীর কোথাও কারও গৃহে মণিটি রেখে আসতে যাচ্ছিলেন। মথুরায় যাদব গোষ্ঠীর বিখ্যাত কোনও ব্যক্তি এখন থাকেন না। মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে সকলেই এখন দ্বারকায় প্রস্থিত। এই অবস্থায় কোনও এক অখ্যাত মানুষের ঘরে মণিটি রেখে আসলে সাময়িকভাবে কৃষ্ণকে এড়ানো যাবে— এই ছিল প্রসেনের ধারণা। কৃষ্ণ প্রসেনের মৃতদেহ নিরীক্ষণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বগতোক্তি করলেন— বেচারা প্রসেন! নিজেও বাঁচলেন না, মণিটিকেও বাঁচাতে পারলেন না। আমার কিছু ব্যক্তিত্ব আছে বলেই কি আমি আপনার বহুমূল্য স্যমন্তক মণিটি সবলে গ্রহণ করতাম?

কৃষ্ণের বিশ্বস্ত আপ্তপুরুষেরা মৃতদেহের পার্শ্ববর্তী সমস্ত ভূমি নানাভাবে পরীক্ষা করে কৃষ্ণকে বলল— এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনও মুখ্য পুরুষের কাজ। মহামূল্য মণিটি সে বিক্রয় করবে বলে গ্রহণ করেনি। মণিটি এতই দ্যুতিময় যে, সে তার চমৎকৃতিতে মুগ্ধ হয়েই সেটি আত্মসাৎ করতে চেয়েছে। নচেৎ এই পার্বত্য জনগোষ্ঠীর কাছে ওই মণির কোনও মূল্য নেই। কৃষ্ণ বললেন, তোমাদের মত মেনে নিতে পারি, যদি উপযুক্ত প্রমাণ পাই। আপ্তপুরুষেরা প্রসেনের মৃতদেহের নিকটবর্তী স্বল্পাচ্ছাদিত তৃণভূমিতে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখাল। পদচিহ্নগুলি সিংহজাতীয় কোনও পশুর। কৃষ্ণ বললেন— এ তো সিংহের পদচিহ্ন। তা হলে তো মহাশয় অক্রূর ঠিকই বলেছেন? আপ্তপুরুষদের প্রধান সঙ্গে সঙ্গে বললেন— কিছুটা ঠিক বলেছেন, কিছুটা নয়। আপনি আর্য প্রসেনের মৃতদেহ লক্ষ করে দেখুন— তাঁর কপালে, উদরে নিশ্চিত প্রস্তরাঘাতের চিহ্ন আছে, কিন্তু কোথাও পাশব দংশনের চিহ্ন নেই। কৃষ্ণ বললেন— তা হলে এই হত্যা কি কোনও নরসিংহের কাজ।

—আর্য! এরা নরসিংহই বটে। তবে আপনি যেমন ভাবছেন তেমন নয়। কৃষ্ণকে পদচিহ্নগুলি ভাল করে দেখিয়ে আপ্ত-প্রধান বললেন— আসলে

এই অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর মুখ্যপুরুষেরা হাতে এবং পায়ে সিংহের নখর ব্যবহার করে। লক্ষ করে দেখুন— পদচিহ্নর অগ্রভাগে এই নখরের চাপ পরিস্ফুট, কিন্তু পদচিহ্নের পশ্চাদভাগ মনুষ্য-চরণের পশ্চাদভাগের মতোই। এই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই অসীম শক্তিধর। সিংহের মতোই তারা বলবান। এদের যুদ্ধাস্ত্র নানাবিধ প্রস্তর। নিবাস পর্বতের গুহায়।

কৃষ্ণ স্বীকার করে নিলেন আপ্তপুরুষের কথা। বললেন— এই আদিম জনজাতির কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় আছে। আপ্তপুরুষেরা বললেন— আমরা সে কথা জানি। যাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, তাঁরা পক্ষী বা সর্পের অবয়ব ব্যবহার করেন। তবে আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, এখানে শুধু সিংহই নয়, এদের প্রতিপক্ষ জনগোষ্ঠীও কিছু কিছু আছে, যারা অন্য পশুর মুণ্ড-নখর প্রভৃতি নিজেদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। কৃষ্ণ আপ্তপুরুষদের সংকেত অনুযায়ী সিংহ-নখরের চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে আরম্ভ করলেন। চলতে চলতে বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর দেখা গেল পাহাড় শেষ হয়ে গেছে এবং বেশ খানিকটা জায়গা ঢালু খাদের মতো। বড় বড় গাছ আব পার্বত্য লতা-গুল্মে স্থানটি সম্পূর্ণ হরিৎবর্ণ ধারণ করেছে।

কৃষ্ণ এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন এবং হঠাৎই সেই আপ্তপ্রধান একটি বৃক্ষের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন— আর্য এদিকে আসুন। আমার বিশ্বাস প্রমাণীকৃত প্রায়। এই দেখুন— আপনার সেই নরসিংহ এখানে চিরকালের জন্য শায়িত। কৃষ্ণ এসে দেখলেন— একটি মানুষের মৃতদেহ। এখানে-ওখানে চাপ-চাপ রক্ত। সিংহের নখর তাব পদযুগলের সঙ্গে অবিন্যস্তভাবে লগ্ন। আপ্তপুরুষদের সহায়তা নিয়ে জায়গাটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। স্যমন্তক মণির চিহ্ন কোথাও নেই। তবে কৃষ্ণের ভরসা— যে স্বর্ণসূত্রের দ্বারা মণিটি প্রসেনের গলায় ঝোলানো ছিল, তার একটি ছিন্নাংশ পাওয়া গেল। স্বর্ণসূত্রের ছিন্নাংশ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখালগ্ন হয়ে ঝুলছিল। আপ্তপুরুষেরা ভগ্ন-বৃক্ষের সদ্যচ্ছিন্ন শাখা-পত্রাদি লক্ষ করে কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে লাগল।

কৃষ্ণ এর মধ্যে একটি বিশ্বস্ত পুরুষকে দিয়ে রৈবতক পর্বতের নিকটস্থিত যাদব সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা বলরামের নেতৃত্বে ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

আপ্তপুরুষেরা কৃষ্ণকে জানিয়েছে— দুটি আদিম গোষ্ঠীর প্রধানের মধ্যে স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। আপনার নরসিংহটি যাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে অন্য একটি পশুচিহ্ন ব্যবহার করেন এবং সম্ভবত সেটি ভল্লুকের। কারণ ভল্লুকের নখরচিহ্ন এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রুক্ষ-লোম আমাদের ধারণা বদ্ধমূল করেছে। তবে এই মানুষটির শারীরিক শক্তি আরও বেশি। পথ চলতে চলতে আবারও পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে।

বলরামের নেতৃত্বে ছোট্ট একটি সৈন্যবাহিনী, যার মধ্যে বিভিন্ন যাদবমুখ্যদের মনোনীত সৈন্যেরা আছেন, তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সৈন্যরা এখানে ওখানে অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। বনের পশু মৃগয়া করে আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া হচ্ছে। বারাহ এবং মাহিষ মাংসের রন্ধন চলছে আগুন জ্বালিয়ে। পুটপাকে সিদ্ধমাংসের আস্বাদ কৃষ্ণের কাছে ভালই লাগছে। বলরামের কথঞ্চিৎ মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এই বনাভূমিতে আসার পর থেকে প্রসিদ্ধ কৈরাতক মধুর সঙ্গে পুটপাকসিদ্ধ বারাহ মাংস তাঁর অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রকমই একদিন দ্বিপ্রহরের রন্ধন-ভোজন বন-মহোৎসব চলছে। কৃষ্ণের পূর্ব নিযুক্ত চিহ্ন-বিশেষজ্ঞদের একজন এসে তাঁকে জানাল— আর্য! এই স্থান থেকে কিঞ্চিৎ দূরে একটি পার্বত্যগুহার মধ্যে আমরা মনুষ্য কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি এবং গুহার বাইরে পর্বতগাত্রে দু-তিনটি ভল্লুক-চর্ম শুষ্ক করার জন্য আতত অবস্থায় রাখা হয়েছে। আপনি চলুন। গুহার বাইরে ভল্লুকের নখরচিহ্ন সর্বত্র বর্তমান। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে রওনা হলেন এবং আপ্তপুরুষের নির্ণীত স্থানে এসে পৌঁছলেন। দেখলেন, একটি বৃহদাকার প্রস্তরে গুহামুখ ঢাকা থাকলেও তাতে সামান্য ফাঁকও আছে। কৃষ্ণ নিঃশব্দে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গুহার মধ্যে অপূর্ব সোপানশ্রেণি। একটি মানুষের আরোহণ-অবতরণের পক্ষে যথেষ্ট। সোপানের আবর্ত একটু অবতরণের পরেই বাম দিকে ঢালু হয়ে গেছে। কৃষ্ণ অত দূর গেলেন না। ঢালু জায়গায় না গিয়ে একটি সোপানের ওপরেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, অসিমাত্রসহায়।

কৃষ্ণের কানে একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছিল। কৃষ্ণ বুঝতে পারছিলেন— শিশুটি একটি খেলনার জন্য বায়না করছে, কিন্তু সে যা চাইছে, তা দেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যে একটি নারীকণ্ঠের সান্ত্বনাবাণী তাঁর কানে ভেসে এল। নারীকণ্ঠ বলছে— না না, আর কাঁদে না বাছা, সেই যে সেই সিংহটা, সে

তো মেরে নিয়েছিল প্রসেনকে, আর সেই মস্ত সিংহটাকে কে মেরেছে জান? মেরেছে জাম্ববান— তোমার পিতা। আর এখন, এখন এই সামন্তক মণি শুধু তোমারই, আর কাঁদে না বাছা— সুকুমাবক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।

সোপানশ্রেণির বামাবর্ত থেকে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন— ছোট্ট শিশুর গলায় স্যমন্তক মণি। পূর্বে তিনি সামন্তক মণির কথা শুধু শুনেছেন, কিন্তু দর্শন করেননি। শিশুর গলায় স্যমন্তক মণির জাজ্বল্যমান প্রভা দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। বালসূর্য যেন জমাট বেঁধে আছে একটি স্বচ্ছ হীরকখণ্ডের মধ্যে।

আড়াল থেকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কৃষ্ণের মনে হল— এবার শেষ অভিযানের সময় হয়েছে। তাঁর আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। তিনি গুহার বাইরে এসে বিশ্বস্ত পুরুষটিকে বললেন— তুমি বলরামকে সৈন্যসহ এই মুহূর্তে এখানে আসতে বল। গুপ্তচর তীব্রবেগে বলরামকে সংবাদ দিল এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন জাম্ববানের গুহামুখে।

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলরামকে জানিয়ে কৃষ্ণ তাঁকে গুহামুখে সসৈন্যে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ গুহায় প্রবেশ করলেন একা। সোপানশ্রেণির ঢালু জায়গায় উপস্থিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী তাঁকে দেখতে পেল। স্যমন্তক মণির উপহার সাজিয়ে যে রমণী এতক্ষণ শিশুটিকে ভোলাচ্ছিল, সে এবার কৃষ্ণকে দেখামাত্র ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠল। সোপানের ওপর থেকে একটি সবল লম্ফ দিয়ে কৃষ্ণ ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পিঠের ওপর পড়লেন। কারণ তিনি জানতেন— ধাত্রেয়িকা রমণীটির চিৎকারের পর ওই আদিম জননেতার অবধারিত প্রতিক্রিয়া কী হবে। দুজনের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। ধস্তাধস্তি, মুষ্ট্যামুষ্টি, কেশাকেশি চলতে থাকল।

ঋক্ষরাজ জাম্ববানের নিবাসস্থলের বাইরে গুহামুখে যে সব যাদবসৈন্য দাঁড়িয়েছিল, তারা সাত-আট দিন দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। কৃষ্ণ ফিরে এলেন না; তারা বিশ্বাস করে নিল— কৃষ্ণ মারা গেছেন। খানিকটা ভীতিও কাজ করল। কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি যোদ্ধা যদি মারা গিয়ে থাকেন, তবে এই গুহাবিলের ভিতরে প্রবেশ করলে বিপদও হতে পারে। তারা কৃষ্ণকে গুহার মধ্যে রেখে দ্বারকায় ফিরে এল। খবর রটল— স্যমন্তক মণি উদ্ধার করতে গিয়ে কৃষ্ণ মারা গেছেন। কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই তাঁর শ্রাদ্ধশান্তিও করে ফেলল। কিন্তু কৃষ্ণ-পিতা বসুদেব বা কৃষ্ণের বড় ভাই কোনও শ্রাদ্ধক্রিয়ার

মধ্যে গেলেন না। কারণ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর খবর শুনেও অন্তত এক মাস অপেক্ষা করতে হয় বলে তাঁরা মনে করেন।

আট

প্রসেনের মৃত্যুর খবর যেমন সত্রাজিতের কাছে প্রথম এসেছিল তেমনই কৃষ্ণের মৃত্যুর খবরও তাঁরই কাছে প্রথম এসে পৌঁছল। কারণ, এই দুটি মৃত্যুই সত্রাজিতের স্যমন্তক-মণির সঙ্গে যুক্ত। খবর শুনে সত্যভামা ত্বরিতগতিতে রুক্মিণী ভবনে এলেন। তিনি কৃষ্ণের এই মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করেন না। রুক্মিণীর সঙ্গে দিন-রাত নানা বিশ্রম্ভালাপে দিন কাটাতে লাগলেন সত্যভামা। রুক্মিণী ভবনের সমস্ত কর্মকারিণীদের তিনি বারণ করে দিয়েছেন, যাতে সরাসরি কোনও খবর রুক্মিণীর কাছে না পৌঁছয়।

রুক্মিণী সত্যভামাকে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি আচার-ব্যবহারও একটু অন্য রকম লাগছে। সবচেয়ে বড় কথা— কৃষ্ণের অবর্তমানে সত্যভামা এর আগে রুক্মিণী গৃহে মাঝে মাঝে বাস করেছেন বটে, তবে এত দিন একটানা কখনওই তিনি থাকেননি। রুক্মিণী অবাক হয়ে একবার জিজ্ঞাসাও করেছিলেন সত্যভামাকে— কী রে! কোনও দিন তো তুই এতটা কাল আমার সঙ্গে থাকিসনি, বোন! তোর হলটা কী? ঘরে মন টিকছে না? সত্যভামা হেসে বলেছিলেন— আমি এবার পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক বিবাদ বাকি আছে। সব মীমাংসা না করে যাব না।

—তা হলে তো আবার সেই তস্কর মানুষটিকেই খবর দিতে হবে। পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্য পাকা চোরকেই তো দরকার।

—সেই চোরের অপেক্ষাতেই আছি। তিনি আসুন, আমিও চলে যাব।

রুক্মিণী অবাক হলেন, সত্যভামা তো এতটুকুতে থামে না। দিনে দিনে সকলেরই ধৈর্যচ্যুতি আরম্ভ হল। রুক্মিণী যদিও এখনও ভাল করে কিছুই জানেন না, তবু মাঝে মাঝে তাঁর চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হচ্ছে। সেই উদ্গত অশ্রুবারি আপন অঞ্চল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে সত্যভামারও চক্ষু সজল হয়ে আসছে। কিন্তু তিনি কিচ্ছুটি প্রকাশ করছেন না রুক্মিণীর কাছে। আর কত দিন? কৃষ্ণ যাবার পর থেকে আজ একুশ দিন চলে গেছে। এরই মধ্যে এক অদ্ভুত খবর

এসে পৌঁছল দ্বারকায় এবং অবশ্যই রুক্মিণী ভবনে। বলা যায়— রুক্মিণীর কাছেই এ খবর প্রথম পৌঁছল। প্রতিহারিণী খবর দিল— কৃষ্ণ রথে চড়ে আসছেন এবং তাঁর সঙ্গে নববধূ। বধূর গায়ের রং কালো। ঘনকুঞ্চিত কেশদাম। সে এক অনার্যা রমণী।

সত্যভামা ভাল করে খবর নিয়ে জানলেন— স্যমন্তক মণি পাওয়া গেছে। ঋক্ষরাজ জাম্ববান কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণের হাতেই তুলে দিয়েছেন। সবধূ কৃষ্ণ গৃহে ফিরছেন একই রথে। সত্যভামা রুক্মিণীকে বললেন— শুনেছ বউরানি! এক অনার্যা রমণীর পাণিগ্রহণ করে তোমার হৃদয়েশ্বর তোমারই ঘরে ফিরছেন। রুক্মিণী বললেন— অমন করে বলছিস কেন, বোন! তিনি তো আর নিজে এই বিবাহ করেননি। কেউ যদি এখন যুদ্ধজয়েব উপহার হিসেবে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন, তবে তিনি কী করবেন?

—তাই বলে এই অনার্যা রমণী?

—কেন, অনার্যা বলে কি সে মানুষ নয়? সে রমণীর সাধ-আহ্লাদ নেই?

—আমি তার সাধ-আহ্লাদের কথা বলছি না, শুধু তোমার স্বামীর আহ্লাদের কথা বলছি। আসলে তোমার মিষ্টি মুখের মধু খেয়ে খেয়ে তাঁর অরুচি ধরে গেছে। এ অনার্যা রমণীকে নিয়ে এসে তিনি কিঞ্চিৎ তিন্তিড়ির ব্যবস্থা করেছেন।

—জানিস তো? তিন্তিড়ির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট খণ্ডের মিশ্রণ বস্তুটাকে আরও উপাদেয় করে। কাজেই আমার কোনও সমস্যা নেই। তবে মিষ্ট, অম্ল— এ সমস্ত রসের ওপরেও যদি তিক্ত-কষায়ের প্রয়োজন হয়, তবেই জানবি তোরও একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে এখানে।

সত্যভামা সামান্য লজ্জা পেলেন এবং কৃষ্ণ আসছেন জেনে বিদায় নিলেন রুক্মিণীর কাছে। এক মুহূর্তের জন্য বোঝা গেল— রুক্মিণী বৈদর্ভী। কথার এই বক্রতা একমাত্র বৈদর্ভী রমণীর মুখেই প্রসিদ্ধ।

নয়

কৃষ্ণ প্রথম রুক্মিণীর ভবনে প্রবেশ করলেন ঋক্ষরাজকন্যা জাম্ববতীকে নিয়ে। রুক্মিণী সানন্দে বধূবরণ করে নিজের ঘরে নিয়ে তুললেন নববধূকে। ঠাট্টা করে বললেন— এতদিনে উপযুক্ত বধূ পেয়েছেন আর্যপুত্র।

কালোর সঙ্গে কালো, বড় ভাল মানাবে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর কাছে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক জানিয়ে স্যমন্তক মণি নিয়ে সত্রাজিতের গৃহে পৌঁছলেন। মণিরত্ন তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিতে সত্রাজিৎ যতখানি অভিভূত হলেন, তার চেয়েও ভীত হলেন বেশি। যাদবকুলের অগ্রগণ্য পুরুষকে তিনি এক সামান্য তস্কর বলে ভেবেছিলেন। সমস্ত দ্বারকায় তাঁর নামে অপবাদ রটেছিল। সত্রাজিৎ ভয় পেলেন।

বললেন— এ মণি তোমার কাছেই থাকুক, কৃষ্ণ! তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। কৃষ্ণ বললেন, এখন আর তা হয় না। এ মণিরত্ন আপনার। আপনার কাছেই এটি থাকুক। আপনি শুধু সত্যভামাকে জানাবেন, মণিহরণের দায় আমার ওপর বর্তেছিল। অধুনা আমি সুব্যাখ্যাত হয়েছি, আশা করি। সত্রাজিৎ দ্বিগুণ ভয় পেয়ে বললেন— তুমি ওই বালিকার কথায় কর্ণপাত কোরো না। তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে সে যে সমস্ত কথা বলেছে, তাতে আমার ধারণা, সে চেয়েছিল তোমারই মাধ্যমে স্যমন্তক মণির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হোক এবং কোনওভাবেই যেন এই মণিহরণের দায় তোমার ওপর এসে না পড়ে। কৃষ্ণ অবাক হলেন, তাহলে সত্যভামা ইচ্ছে করে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল!

সত্রাজিৎকে কৃষ্ণ সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারে? সত্রাজিৎ কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, আপাতত নয়। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে, কৃষ্ণ! সত্রাজিৎ কৃষ্ণের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন— তুমি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করো, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বুঝলেন— সত্রাজিৎ তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন। খানিকটা অস্বীকারের ভঙ্গিতেই কৃষ্ণ বললেন— সে কী কথা? যাদবকুলে আমার চেয়ে সুযোগ্য পাত্র অনেকে আছেন এবং অনেকেই আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

—তা হোক। আমি জানি, তোমার চেয়ে যোগ্য পাত্র আর কেউ নেই। যাঁরা আমার কন্যাকে চান, তাঁরা সত্যি আমার কন্যাকেই চান, নাকি স্যমন্তক মণিটি চান— সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট চিন্তা আছে। তুমি অস্বীকার কোরো না কৃষ্ণ। আমার কন্যাকে তোমার অপছন্দ নয়তো?

কৃষ্ণ মাথা নিচু করলেন। সত্যভামা যে এইভাবে কোনওদিন তাঁর কাছে আসবেন, এ তাঁর স্বপ্নেও ছিল না। শৈশব থেকে এই বালিকাটিকে তিনি চেনেন। কারণে, অকারণে নানা প্রগল্‌ভ ব্যবহারে সে তাঁকে আকুল করে

তুলেছে কতবার। রুক্মিণীকে কৃষ্ণ ভালবাসেন ঠিকই, কিন্তু সত্যভামা যেন অন্য কিছু। তাঁর কথাবার্তা, হাবভাব, লাস্য এত বেশি, বামতাযুক্ত যে, তাঁকে ভাল না লেগে যায় না। যাদবকুলের অগ্রগণ্য পুরুষরা সব সময় যে রমণীকে কামনা করেন, তাকে কৃষ্ণ এত সহজে লাভ করবেন ভাবেননি। সত্যভামার এই দুর্লভতা এবং অপ্রাপ্যতার জন্যই এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি কৃষ্ণের কাছে গ্রহণীয়তমা বলে পরিগণিত হলেন। সত্রাজিতের সানুনয় বাক্যের পর আর তিনি দ্বিরুক্তি করলেন না। বললেন, আর্যের যেমন অভিলাষ। আপনি বিবাহের আয়োজন করুন।

দশ

স্যমন্তক মণি হৃত হয়েছিল— সেও একরকম মেনে নিয়েছিলেন সকলে। সত্রাজিৎ ছাড়া মণিহরণের দুঃখ আর কাউকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু আজ যখন স্যমন্তক মণি পুনর্লব্ধ হল এবং কৃষ্ণ অপবাদ-মুক্ত হলেন, তখন যাদবকুলে নতুন এক রাজনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি হল।

অক্রূরের গৃহে নির্জন একটি প্রকোষ্ঠে আলোচনা আরম্ভ হল দুজনের মধ্যে। হার্দিক্য কৃতবর্মা শুষ্ক রুক্ষ মানুষ। তাঁর ভাষায় কোনও মিষ্টতা নেই।

তিনি বললেন— ব্যাটা গর্ভদাস এই সত্রাজিৎ। সত্যভামাকে বিয়ে দেওয়ার মতো আর পাত্র পেলি না যাদবকুলে?

অক্রূর বললেন— স্যমন্তক মণি ফিরে পেয়েছিস, ঠিক আছে। তাই বলে এত শীঘ্রই সত্যভামার বিবাহ দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

—ব্যাটা ভয় পেয়েছে। কৃষ্ণ চুরি করেনি, অথচ তার নামে অপবাদ রটেছিল, এখন কৃষ্ণ যদি কোনও প্রতিশোধ নেয়? সেই ভয়েই মেয়ে দিয়ে তাকে তুষ্ট করার ব্যবস্থা করল।

—প্রতিশোধ? প্রতিশোধের কী আছে? আমরা কি ছিলাম না?

—দেখো, এই কথাটা বড় শক্ত কথা। কৃষ্ণ প্রতিশোধ নেবে ভাবলে তাকে রক্ষা করা কঠিন?

কৃতবর্মা কৃষ্ণের কূটবুদ্ধির কথা জানেন। সত্যভামার ওপরেও তাঁর লোভ তত ছিল না, যতটা স্যমন্তক মণির ওপর। কিন্তু অক্রূর মণিটিও চেয়েছিলেন,

সত্যভামাকেও মনে মনে মন দিয়েছিলেন। আজ যখন সত্যভামার বিবাহ হয়ে গেল কৃষ্ণের সঙ্গে, তখন অক্রুর ভাবলেন— সত্যভামা গেছে যাক, অন্তত মণিটা তো পাওয়া যেতে পারে। অক্রুর সুকৌশলে কৃতবর্মাকে বললেন, সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়ে গভীর অপরাধ করেছে সত্রাজিৎ। ওর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

—সত্রাজিৎকে হত্যা করাটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। তবে তাকে এমন ভাবেই মারতে হবে, যাতে আমরা কেউ দোষভাগী না হই।

—সে চিন্তা আমার। তুমি শুধু আমাকে সাহায্য করো।

অক্রুর এবং কৃতবর্মা দুজনে গোপন আলোচনা সেরে নিয়ে শতধন্বাকে ডেকে পাঠালেন। শতধন্বা কৃতবর্মার ছোটভাই হলেও কৃতবর্মা অক্রুরের কথায় আপত্তি করলেন না। অক্রুর ভেবেছিলেন— সত্রাজিৎকে হত্যা করতে হলে এমন একজনকে কাজে লাগাতে হবে যে, সত্যভামার প্রণয়ের জন্য ব্যগ্র ছিল। অক্রুর এবং কৃতবর্মা দুজনেই জানতেন— শতধন্বা সত্যভামার প্রেমে উন্মত্ত। আকস্মিকভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহ হয়ে যাওয়ায় শতধন্বা যে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলেপুড়ে মরছেন— এ কথা অক্রুর এবং কৃতবর্মা দুজনেই জানতেন। কিশোর মনের এই উদগ্র প্রতিশোধ-স্পৃহাকে স্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য অক্রুর এবং কৃতবর্মা শতধন্বাকে ডেকে এনে সত্যভামার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলেন। কৈশোরগন্ধী যুবকের মন ধিকিধিকি জ্বলে উঠল। অক্রুর বললেন— শতধন্বা। সত্রাজিতের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। তুমি সাবহেলে সত্রাজিৎকে হত্যা কর। ওর স্যমন্তক মণিটি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নাও, আমরা তিনজনে মিলে স্যমন্তক-মণির অধিকার ভোগ করব।

শতধন্বা বললেন, সত্যভামাকে যে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সেই সত্রাজিৎকে হত্যা করতে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু স্যমন্তক মণি সংগ্রহ করার পর কৃষ্ণ যদি প্রতিপক্ষতা করেন। অক্রুর এবং কৃতবর্মা দুজনে একযোগে বললেন, তুমি মণিরত্ন নিয়ে এসো। তোমাকে রক্ষা করার ভার আমাদের। শতধন্বা রাজি হলেন সাগ্রহে। সুযোগও এসে গেল। হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় খবর এল— পাঁচ পাণ্ডব ভাই, তাঁদের মা কুন্তীর সঙ্গে জতুগৃহে দগ্ধ হয়েছেন বারণাবতে। কুন্তী কৃষ্ণের নিজের পিসি। কৃষ্ণপিতা বসুদেব সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকে বারণাবতে পাঠালেন ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্য।

কৃষ্ণ দ্বারকায় নেই— এমনই একদিন রাত্রির অন্ধকারে হার্দিক্য শতধন্বা সত্রাজিতের গৃহে এসে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করলেন সত্রাজিৎকে। স্যমন্তক মণি হরণ করে নিয়ে তিনি অক্রূর এবং কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হলেন।

তাঁরা বললেন— মণি তোমার কাছেই থাক, শতধন্বা! শতধন্বা মণি গ্রহণ করে সত্যভামার শোক বিস্মৃত হতে চাইলেন বৃথাই। যথাসময়ে সত্রাজিতের মৃত্যুসংবাদ সত্যভামার কানে পৌঁছল। তিনি অধীর হয়ে পিতৃগৃহে এলেন। কৃষ্ণের বিশ্বস্ত আপ্তপুরুষেরা তাঁকে জানাল— এই গুপ্ত হত্যা শতধন্বার কাজ, মণিও তিনিই হরণ করেছেন।

শতধন্বার সম্বন্ধে সত্যভামার কিছু মায়া ছিল। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক তাঁকে মনে-প্রাণে ভালবাসে এই সরসতাটুকু সত্যভামা অন্তরের গভীরে উপভোগ করতেন। কিন্তু আজ যখন তাঁর পিতাকে হত্যা করে শতধন্বা স্যমন্তক অপহরণ করলেন, তখন তাঁর দৃঢ় ধারণা হল— তিনি নন, ওই মণিই ছিল শতধন্বার প্রকৃত লক্ষ্য। সত্যভামার কৈশোর কল্পনাগুলি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। শতধন্বার মণিহরণের পিছনে অক্রূর-কৃতবর্মার কূট-কৌশল একটুও বুঝতে পারলেন না সত্যভামা। মনে মনে তিনি তখনই শতধন্বাকে হত্যা করে ফেললেন। সত্যভামা স্বামীগৃহে ফিরেই একটি একাশ্ববাহিত রথের ব্যবস্থা করলেন নিজের জন্য। তারপর সেই রথে চড়ে রওনা দিলেন বারণাবতে। একাকিনী, রথের সারথিমাত্র সহায়ে। বৃষ্ণিকুলের বধূ হওয়ার পর রুক্মিণী-জাম্ববতী যা ভাবতেও পারেন না, সত্যভামা সেই সাহস করলেন। সমস্ত মহিষীদের মধ্যে সত্যভামা যে কৃষ্ণের কাছে বেশি প্রশ্রয় পেয়েছিলেন, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

সত্যভামা বারণাবতে পৌঁছে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানালেন কৃষ্ণকে। জানালেন শতধন্বার লোভ এবং হিংসার কথা। কৃষ্ণ সত্যভামার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেও একবার তাঁকে বোঝাতে চাইলেন। বললেন, তুমি হয়তো জান না, সত্যা। এই কিশোরকে আমি দেখেছি, তোমার প্রেমে সে উন্মত্ত, অধীর। সে কী করে...। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন সত্যভামা— উন্মত্তই বটে, তবে সেটা আমার জন্য নয়, স্যমন্তক মণির জন্য। নইলে সে পিতাকে এমন নৃশংস এবং কাপুরুষের মতো হত্যা করত না, অন্তত হত্যা করলেও মণিটি নিয়ে যেত না। তাতেই বুঝি— শতধন্বার উদ্দেশ্য আমি নয়, স্যমন্তক মণি।

সত্যভামার মানসিক অবস্থা বুঝে কৃষ্ণ বারণাবতে সাত্যকিকে রেখে এলেন পাণ্ডবদের অস্থি-পরীক্ষার জন্য। অর্থাৎ পাণ্ডবদের মৃত্যু হয়েছে— এ কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। যাই হোক, সত্যভামার জোরাজুরিতে তিনি দেরি না করে দ্বারকায় ফিরে এলেন। সত্রাজিতের মৃত্যুতে কৃষ্ণের মনে একটা অন্য প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল, যদিও সেটা সত্যভামার কাছে প্রকাশযোগ্য ছিল না। কৃষ্ণ ভেবেছিলেন— সত্রাজিৎ স্বর্গত হয়েছেন, অতএব উত্তরাধিকারের নিয়ম-মতে স্যমন্তক মণি এখন সত্যভামার অর্থাৎ কৃষ্ণের।

দ্বারকায় ফিরে কৃষ্ণ দাদা বলরামকে সব ঘটনা জানালেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়েই শতধন্বাকে আক্রমণ করবেন ঠিক করলেন। এ খবর আগেই পৌঁছে গেল শতধন্বার কাছে। শতধন্বা প্রমাদ গণলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিলেন অক্রূর এবং কৃতবর্মাকে। তাঁর আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃতবর্মা কৃষ্ণের প্রতিপক্ষতা করতে রাজি হলেন না। পূর্বে যে সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন, এখন কৃষ্ণের ক্রোধোন্মত্ত মূর্তির নিরিখে সে সাহস এক মুহূর্তে উবে গেল। আর অক্রূর? ইচ্ছে করলে তিনিই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে হয়তো বা কিছু করতে পারতেন, কিন্তু শঠতা করে তিনি আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলেন। শতধন্বার সঙ্গে তঞ্চকতা করলেন অক্রূর। তিনিও শতধন্বাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন না।

শতধন্বা সব বুঝলেন। স্যমন্তক মণি কোনওদিনই তাঁর ইপ্সিত ছিল না। সত্যভামাকে তিনি চেয়েছিলেন, পাননি, মণি গ্রহণ করে তিনি কী করবেন? শতধন্বা অক্রূরকে বললেন— মণিটি আপনি রাখুন। বাঁচতে হলে আমাকে পালাতে হবে। অক্রূর প্রথমেই মণি নিতে চাইলেন না। ভাবলেন, যদি বিপদ ঘটে কোনও। শতধন্বা বললেন, মণি নিয়ে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? স্যমন্তক আপনার কাছেই থাক, আমার প্রয়োজন নেই মণিতে।

অক্রূর রাজি হননি। তারপর যখন শতধন্বা কথা দিলেন যে, প্রাণ গেলেও মণি কার কাছে আছে তিনি বলবেন না, তখন অক্রূর স্যমন্তক মণিটি নিজের কাছে রেখে দিলেন। সাগ্রহেই।

কৃষ্ণ-বলরাম দুজনেই পলায়মান শতধন্বার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। একটি বেগবান অশ্বে আরোহণ করে, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে শতধন্বা পালাতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্য এমনই যে, শতধন্বার অশ্বটি মাঝপথে মুখ থুবড়ে পড়ল এবং মারা গেল। অশ্ব থেকে নেমে শতধন্বা পদব্রজে পালিয়ে চললেন আঁকাবাঁকা

পথ ধরে। পাদচারে গমনশীল সেই যুবকটিকে ধরে ফেলতে কৃষ্ণের অসুবিধে হল না। তিনিও অশ্ব রেখে পদব্রজেই এসেছিলেন। বেশি কথা শতধন্বার সঙ্গে হয়নি। কৃষ্ণ বললেন, শতধন্বা! আমি জীবনদান করব তোমায়। তুমি শুধু বলো— মণিটি কোথায়?

—মণিতে আমার প্রয়োজন নেই কোনও, মণি আমার কাছে নেইও।

কৃষ্ণ আর একটি কথাও বললেন না। মুক্তকোষ তরবারির একটি আঘাতে শতধন্বার মুণ্ডচ্ছেদন করলেন। শতধন্বার শির-বিযুক্ত শরীরের উদ্গত শোণিতে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রযুগল মাখামাখি হয়ে গেল। কৃষ্ণ সেই পরিধানের আনাচে-কানাচে স্যমন্তক মণির সন্ধান করলেন। কিন্তু কোথাও মণি পেলেন না। কাছাকাছি মণিটি কোথাও পড়ে নেই, পড়ার সম্ভাবনাও নেই। কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোনও যুদ্ধই হয়নি. কৃষ্ণের কমলদল সন্নিভ নয়ন দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি দ্রুতগতিতে ফিরে এলেন বলরামের কাছে। বলরাম অশ্ব দুটি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কৃষ্ণের জন্য।

—দাদা! স্যমন্তক মণি নেই শতধন্বার কাছে— কৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন।

বলরাম ঠিক বিশ্বাস করলেন না। নিজের প্রিয় ভ্রাতাটিকেও বলরাম বিশ্বাস করলেন না। বললেন— তুমি এত অর্থপিশাচ! আমার কাছেও তুমি লুকোচ্ছ।

—বিশ্বাস করুন। আমি শতধন্বাকে হত্যা করেছি। কিন্তু তার কাছে নেই মণিরত্ন স্যমন্তক।

—আমি বিশ্বাস করছি না এবং এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গ করাও পাপ।

বলরাম স্বকপোলকল্পিত ধারণায় কৃষ্ণকে ছেড়ে চলে গেলেন। তখনই। অপার দুঃখ হৃদয়ে বহন করে কৃষ্ণ অশ্বারোহণে সত্যভামার গৃহে ফিরে এলেন। সত্যভামার প্রকোষ্ঠে মণিময় আসনের ওপর নিষণ্ণ হয়ে নিজের উত্তরীয় বসনখানি চেপে ধরলেন নিজের মুখের ওপর। সত্যভামা বললেন, আর্যপুত্র আমার পিতৃহন্তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ তো? তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে আমার কাছে। কৃষ্ণ বললেন, খুব ভুল হয়ে গেছে, সত্যভামা! এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র, শতধন্বা এই ষড়যন্ত্রের বলি হল মাত্র।

—তোমার কথা ভাল করে বুঝতে পারছি না, আর্যপুত্র!

—বুঝবে কী করে? আমি শতধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ করেছি। অথচ মণিরত্ন স্যমন্তক তার কাছে নেই। আমি শুধু শুধুই এই বালককে হত্যা করেছি।

—শুধু শুধু কেন? সে আমার পিতাকে হত্যা করেছে।

—'হত্যা করেছে' নয়, তাকে দিয়ে করানো হয়েছে। অন্যকৃত ষড়যন্ত্রে এই বালক ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র।

—কারা এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছে!

—তারাও তোমার প্রতি আসক্ত ছিল সত্যভামা; কিন্তু সেই আসক্তির মূলে ছিল স্যমন্তক মণি। আর এই কিশোর বালক, যে শুধু তোমাকেই ভালবাসত, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ সে প্রাণ দিল। সে কোনও অন্যায় করেনি। সত্যভামা মনে মনে তাড়িত বোধ করলেন। ওই কিশোর বালক মাঝে মাঝে নানা প্রণয় বচনে তাঁকে উত্যক্ত করত বটে, কিন্তু তার প্রণয় যে এত গভীর তা তিনি ভাবতেও পারেননি। কৃষ্ণ বললেন— আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে বলেই সে তোমার পিতাকে হত্যা করেছে, মণির জন্য নয়। মণির প্রয়োজন অন্যের, তারা তোমার প্রণয়ন্ধ শতধন্বাকে ব্যবহার করেছে।

—আমি কেন এমন করে অপরাধী হলাম!

—অপরাধী তুমি নও। সত্যভামা! অপরাধী আমি। এই কিশোর বালক এক সময় আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, যাতে সে তোমাকে বিবাহ করতে পারে। সামান্য কথাপ্রসঙ্গে তুমি যদি একবারও এই কিশোরের নাম উচ্চারণ করে থাক, তবে সেই কথাটুকু শোনার জন্য এই বালক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। আর সেই বালককে আমি নৃশংসভাবে হত্যা করলাম!

—আমাকে শাস্তি দাও, আর্যপুত্র। আমিই এই বালককে হত্যা করেছি।

—ভুল, সত্যভামা! ভুল! আজ আমি তার মুণ্ডচ্ছেদ করেছি বটে, কিন্তু তার প্রকৃত হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ হয়েছে সেই দিনই, যেদিন আমি তোমাকে বিবাহ করেছি।

—তুমি এসব কী বলছ, আমার ভাল লাগছে না, একটুও ভাল লাগছে না।

—সত্যভামা! যাদবকুলের অগ্রগণ্য পুরুষেরা তোমাকে কামনা করতেন, আমি সেই প্রৌঢ় পুরুষদের গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার জন্য শতধন্বার ব্যক্তিগত প্রার্থনা আমি জানতাম। রমণী-সমাজের ললামভূতা, এতগুলি পুরুষের প্রার্থনীয়া

তোমাকে যেদিন আমার হাতে তুলে দিলেন তোমার পিতা, সেদিন,... সেদিন কই... আমি তো শতধন্বার নামও উচ্চারণ করিনি; তাকে তো গিয়ে বলিনি— বৎস! আমি দুঃখিত! তোমাকে আমি বঞ্চনা করেছি। বরঞ্চ আমি গর্বিত বোধ করেছি। এতগুলি পুরুষের প্রার্থনীয়া রমণী কোনও ভাগ্যবলে এখন আমার, শুধু আমারই।

কৃষ্ণ সত্যভামাকে আলিঙ্গন করলেন। দুজনের মুখে অস্ফুটে একই শব্দ উচ্চারিত হল— শতধন্বা! আলিঙ্গন প্রগাঢ় হল।